কৈলাস-যাত্রা

[বহু চিত্র-সমন্বিত]

বেদাহরণকার্য্যেণ তীর্থস্নানায় চ প্রভো।
অটন্তি বসুধাং বিপ্রাঃ পৃথিবীদর্শনায় চ ॥
ব্যাস।

ছত্রপতি শিবাজী, জালিয়াৎ ক্লাইব, মহারাজ প্রতাপাদিত্য, মহারাজ
নন্দকুমার চরিত, ভারতে অলিকসন্দর প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা,

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী মেসিনে'
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

মূল্য ১৷৹ টাকা ।

মুখবন্ধ।

বাঙ্গালার দেবকল্প পিতামহ মহাশয়েরা সন্তানগণকে অতি শৈশবকালে প্রশ্নোত্তর করিয়া নিজেদের পরিচয় বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করিতেন। স্বরূপের পরিচয় অবগত করাইতেন, কোন্ কোন্ গুণগ্রামে বিভূষিত হইলে ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ কেন—মনুষ্যমাত্রে কুলীন হন, সেই সকল গুণের কথা বালককে অবগত করাইতেন।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানকালে সেই প্রাচীন পবিত্রধারা লুপ্ত হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে "পাস দাও," "টাকা আন" এই শিক্ষায় আমরা বালককে দীক্ষিত করিতেছি। পূর্ব্বের শিক্ষায় বালক বিদ্বান্ বা ধনবান্ না হইতে পারিলেও আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের সুখপ্রদ হইত, সমাজের উদ্বেগকর হইত না।

সেকালে বালককে বলা হইত—"আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপঃ ও দান" এই নয়টি বিষয় যাঁহাতে অবস্থান করে, তিনিই কুলীন। এই নবগুণযুক্ত হইবার জন্য বালককে অতি শৈশবকাল হইতে ভাবনা দেওয়া হইত।

সৌভাগ্যক্রমে দেশে নূতন যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। এই নবগুণের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া হিন্দুমাত্রকেই কুলীন করিতে হইবে। সেকালে ব্রাহ্মণেরা সকল প্রকার শুভ ও বিপজ্জনক কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী হইতেন। আবার যাহাতে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হন, হিন্দু হিন্দু হন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

আমার ধারণা, শৈশবকালে আমার পরমপূজনীয় প্রপিতামহ মহাশয় যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, "কৈলাস-যাত্রা" সেই বীজের

ফল। ইহার আস্বাদন গ্রহণ করিয়া আমার দেশের যুবকদের হৃদয়ে ভ্রমণ-বাসনা উদ্‌বুদ্ধ হউক, তাহার ফলে আমাদের জাতি ও সাহিত্য গৌরবান্বিত হউক।

"মাসিক বসুমতীতে" প্রকাশের সময় হইতে ইহাকে পুস্তকাকারে বাহির করিবার জন্য অনেকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য ইহা শীঘ্র প্রকাশিত হইল।

রিষড়া,
ই, আই, আর।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

কৈলাস-যাত্রা

প্রথম অধ্যায়

সঙ্কল্প

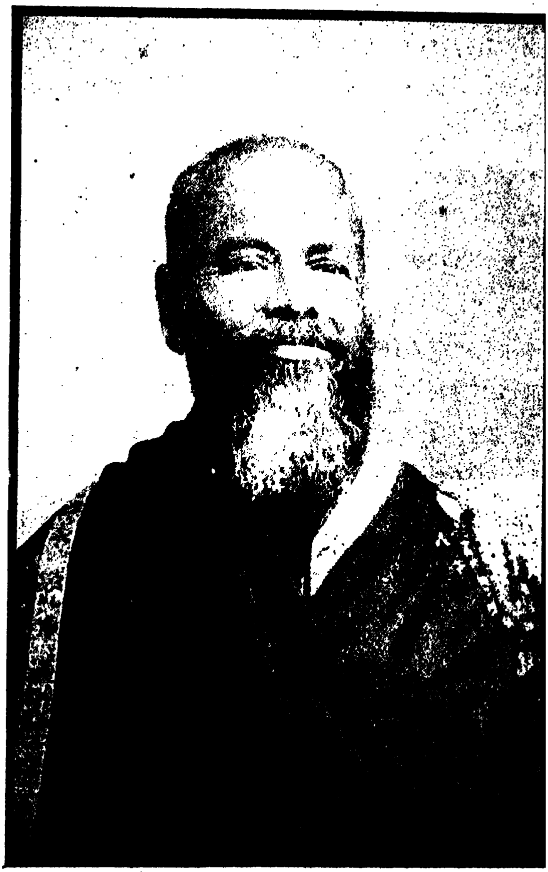
ভ্রমণস্পৃহা আমার স্বভাবগত বলবতী। এই স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া ভারতে ও ভারতের বাহিরে কোন কোন স্থানে আমি ভ্রমণ করিয়াছি। ভ্রমণ-কাহিনী, বিশেষতঃ বিপদ্‌পূর্ণ ভ্রমণ-কাহিনী আমার বড় হৃদয়-গ্রাহিণী, আর এরূপ ভাবে যাঁহারা ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাল্যকাল হইতে আছে। আমার জন্মভূমি দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির বাগানে যে সকল সাধু-সন্ন্যাসী আগমন করিতেন, তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনিবার জন্য অতি বাল্যকাল হইতে আমি তাঁহাদের কাছে যাইতাম। ফলে আমার স্বভাবগত স্পৃহাটা বেশ বাড়িয়া গিয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত নানা দেশের ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইতাম। ন্যানসেনের মেরু-ভ্রমণ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলাম। আমি সুইডিস পরিব্রাজক স্বেন হিডেনের সহিত সেই সময় পরিচিত হইয়াছিলাম। ইনি তিব্বত-ভ্রমণ করিয়া একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পরলোকগত অধ্যক্ষ মিঃ ম্যাকফারলেন, ডাঃ স্বেন হিডেনকে সমাদরের সহিত আহ্বান করিয়া চা-পানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক ডাক্তার কথায় কথায়

মানস-সরোবরের অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য, অতুলনীয় তীর্থ-(জল) মহিমা কীর্ত্তন করেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী য়ুরোপীয়ের মুখে তীর্থ-মহিমার কথা শুনিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইতে পারেন। স্বেন হিডেন মানসের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে কহেন, "আমি নানা দেশে নানা প্রকারের পেয় পান করিয়াছি; বৃটিশ সম্রাট্, জার, কৈশর প্রভৃতির সহিত "শ্যাম্পেন" প্রভৃতি মদ্য পান করিয়াছি। সে সকল পেয় শারীরিক অবসাদ আনয়ন করিয়া থাকে, সে সকল পেয় আত্মিক মলিনতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, কিন্তু মানসের জল শারীরিক অবসাদ দূর করিয়া চিত্তে প্রসন্নতার সঞ্চার করিয়া থাকে। মানস-সরোবর হিন্দু বৌদ্ধের তীর্থ। যিনি ইহার জল পান বা ইহার দৃশ্য দর্শন না করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি হিন্দু বা বৌদ্ধ বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকি।" কথাগুলি আমার হৃদয়ের ভিতর গিয়া আঘাত করে।

উদ্যোগ।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে হিমালয় সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ আছে, তাহার প্রায় অধিকাংশ পাঠ করিলাম। সে সকল প্রদেশে ভ্রমণজন্য যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহা ধীরে ধীরে সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। কিন্তু নানাপ্রকার প্রতিকূল ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে গমনে বিলম্ব হইতে লাগিল।

তিব্বতের যে প্রদেশে আমি যাইব, তাহার অনেক স্থল চিরতুষারাবৃত। সুতরাং সে প্রদেশে অবস্থান জন্য কলিকাতায় গরম কাপড় প্রস্তুত করাইতে লাগিলাম। মোটা ফ্ল্যানেলের পা-জামা, জঙ্ঘাস্পর্শী মোটা গরম ষ্টকিং, পট্টি, পাদুকা, জানু পর্য্যন্ত পৌঁছান কম্বলের জুতা সংগ্রহ করিলাম। দেহের উপর সূতা ও পশম-মিশ্রিত গেঞ্জী, তাহার উপর



গ্রন্থকার।

হাতকাটা তুলা-ভরা গরম কাপড়ের আস্তরণযুক্ত রামজাম', তাহার উপর সোয়েটার, তাহার উপর তুলার ওভারকোট, পট্টুর ওভার-কোট, মস্তকের জন্য গরম কাপড়ের চক্ষু-খোলা টুপি (ব্যালাক্লাভা), তাহার উপর পাগড়ী (অবশ্য সূতার নহে), এইরূপ আবরণ-সমূহ সংগ্রহ করিয়া তিব্বতভ্রমণে বহির্গত হই।

তিব্বতে দিবাভাগে অত্যন্ত প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হয় ; অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরকণিকাও ইহার সহিত বাহিত হইয়া থাকে, ইহা হইতে চক্ষু রক্ষা করিবার জন্য চোখ-ঢাকা চশমা সংগ্রহ করিতে হয়। ভবিষ্যতে এই চশমা হইতে আমার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়াছিল, আর ইহার কোষ আমার জীবনরক্ষার পক্ষে সাহায্য করিয়াছিল।

উপরি-উক্ত দ্রব্য ছাড়া সাধারণ কতকগুলি ঔষধ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এই সকল ঔষধে আমার নিজের ও অন্য লোকের উপকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যাঁহারা হিমালয়ে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন পেটের অসুখের কিছু ঔষধ সঙ্গে রাখেন।

আমার উদ্যোগপর্ব্ব প্রায় শেষ হইল। আমার গমনের দিনও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল।

তিব্বতে আমাদের দেশের রৌপ্যমুদ্রা ব্যতীত আর কিছু চলে না। নোট বা গিনীর তাহারা কদর জানে না ; সুতরাং ইহার আদান-প্রদান নাই। সমস্ত টাকা নোটের আকারে ছিল, আলমোড়ায় তাহা বদলাইয়া লইব মনে করিয়া এখানে আর বেশী রৌপ্যমুদ্রা লইলাম না! লইবার মধ্যে ৮টি গিনী সংগ্রহ করিয়া লইলাম। যদি রাস্তায় সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হয় বা চুরী যায়, এই ভয়ে গিনী কয়টি আমার তুলা-ভরা হাতকাটা ছেঁড়া রামজামার ভিতর শিলাই করাইয়া লইলাম। যদি সর্ব্বস্ব হারায় অন্ততঃ এই ছেঁড়া জামাটা রক্ষা করিতে সমর্থ হইব।



ভুটিয়া পুরুষ ও রমণীগণ।

ইহার উপর কাহারও লোভদৃষ্টি পড়িবে না, বিবেচনা করিয়া বুকের উপর সোনা গাঁথিয়া রাখিয়াছিলাম।

খাদ্যসামগ্রী বড় কিছু লইলাম না, লইবার মধ্যে কিছু পেস্তা, কিস্‌মিস্‌ লইয়াছিলাম মাত্র। আর যাহা কিছু, আলমোড়া হইতে সংগ্রহ করিব মনে করিলাম। এ সকল দ্রব্য ছাড়া ছুরী, কাঁচি, সূচ, সূতা, তিব্বতী ভাষার গ্রন্থ, কিছু কাগজ প্রভৃতি লইলাম।

বিছানা সংগ্রহে—বিছানা যত হাল্কা আর শীত দূর করিবার উপযোগী হয়, তাহা করিয়াছিলাম—ফেল্টের দোভাঁজ একখানি কম্বল, একখানি ছোট সতরঞ্চি, পাতিবার একখানি কম্বল—বিছানার চাদর, ক্ষুদ্র একটি বালিস। ঘনলোমপূর্ণ মৃগচর্ম্ম রাস্তায় এক ভক্ত প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা খুব লঘু অথচ বরফের উপর পাতিলেও উষ্ণতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইত। তিব্বতে যত দিন ছিলাম, সমস্ত তৈজসপত্র জামা-জোড়া পরিয়া শয়ন করিতাম, তাহাতেও সকল সময় শীত-নিবারণ হইত না। সময় সময় ভুটিয়াদের মোটা কম্বলও ব্যবহার করিতে হইত। যেন জগদ্দল পাতর বুকে রাখিয়া শয়ন করিতাম। এইরূপে বুকের উপর প্রস্তর-রক্ষার অভিনয় অনেক সময় করিতে হইত। এইরূপ ভাবে থাকিয়াও গরলা মান্ধাতায় যে শীত ভোগ করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিলে এখনও যেন কম্পানুভব হয়। যে প্রদেশে ভ্রমণ করিতে হইবে, সে প্রদেশের উত্তম ভূচিত্র, বিশেষ হাঁটাপথের চিত্র সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আমার ভ্রমণ হাঁটাপথে হইবে। ম্যাপ পথিপ্রদর্শকরূপে সমস্ত রাস্তা, নগর, গ্রাম, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি এবং দূরত্বের কথাও জ্ঞাপন করিয়া থাকে। তিব্বতের এবং হিমালয় প্রদেশের ম্যাপের সংগ্রহের জন্য আমি Surveyor General এর আফিসে গমন করিয়া সংগ্রহ করি।

যাত্রা।

২৩শে মে (১৯১৮) আমার জীবনের একটি প্রধান দিন। এই দিনে আমি আমার বহুদিনের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হই। সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে যে উদ্বেগ, যে বিপদ, যে ক্লেশভোগ করিতে না হয়, আমার এ তিব্বত-ভ্রমণে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী বিপদ, কষ্ট ও উদ্বেগ সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই দিন হইতে তাহার সূত্রপাত হয় বলিয়া ইহাকে আমি জীবনের প্রধান দিন বলিয়া পরিগণিত করিয়াছি।

গৃহ হইতে বিদায় লইয়া আমি প্রায় ১১টার সময় হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম, এবং এক্সপ্রেসে যাত্রা করিলাম। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ মিশ্র, পণ্ডিত ঝবরমল্ল শর্ম্মা, আরও কতিপয় বন্ধু এবং আমার পুত্র শ্রীমান্ জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ষ্টেশনে আমাকে বিদায় দিতে আসেন।

এই যাত্রাতে আমার এক জন সঙ্গী জুটিয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ যুবকটি আমার এক গোত্রের, ধর্ম্মপরায়ণ, চিত্রাঙ্কনপটু। ইহার আবির্ভাব ও তিরোভাব ধূমকেতুর মত বিস্ময়াবহ। কৈলাস মানস-সরোবরে আমার গমন-কথা শুনিয়া, যুবক যাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। মনে করিলাম, যদি সঙ্গী পাওয়া যায় মন্দ কি? এই যাত্রাটুকুমাত্র আমরা একত্র ছিলাম, তাহার পর তাহার আর কোন খোঁজ-খবর পাই নাই। প্লাটফরমে আসিয়া যুবকের দেখা পাইলাম না। মনে করিলাম, আবেগে বলিয়াছে, আবেগের অভাবের সহিত আসিবার কথাও বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে। আমিও তাহার কথা ভুলিয়া গেলাম। গাড়ীতে বসিয়া আছি, এরূপ সময় দেখি, যুবক আমাকে খুঁজিতেছে, আমিও সমাদরের সহিত তাহাকে গ্রহণ করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে গাড়ী মোগলসরাই উপস্থিত হইল। যুবকবন্ধু

এলাহাবাদে কিছুকাল থাকিয়া আমার সহিত সাজাহানপুরে মিলিত হইবে, এইরূপ স্থির হইল। আমি স্নানাহার করিয়া ১০টার মেলে আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। অপরাহ্ণে গাড়ী সাজাহানপুরে উপস্থিত হইল। এখানে শ্রীমান্ ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় নামক আমার এক জ্যেঠতুতো ভাই কার্য্যোপলক্ষে অবস্থান করেন, তাঁহার বাসায় অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া রাত্রিযাপন করি।

যে গাড়ীতে আমি আসিয়াছিলাম, পরদিবস সেই গাড়ীতে কাঠগুদাম যাইবার জন্য আবার প্রস্তুত হইলাম। যুবক বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া পরদিবস সকালে কাঠগুদাম ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

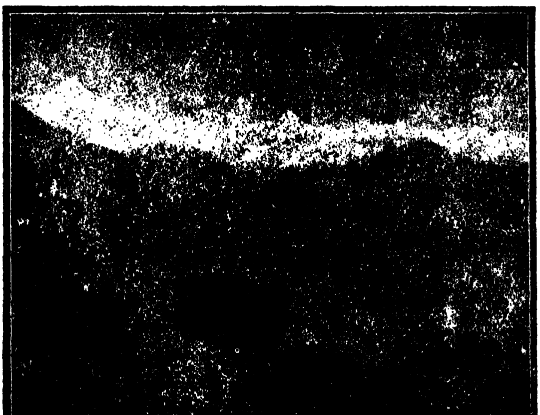
আলমোড়া, নাইনিতাল প্রভৃতি স্থানে যাইবার শেষ রেল-ষ্টেশন কাঠগুদাম। গ্রীষ্মের জন্য ষ্টেশন শ্বেতাঙ্গ রেলযাত্রীতে পরিপূর্ণ, টাঙ্গা, মোটর প্রভৃতির সংখ্যাও কম নহে।

ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটি ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হওয়া গেল। স্থানটি আমাদের ন্যায় যাত্রীর পক্ষে মন্দ নহে। দেখিলাম, কয়েকজন পাহাড়ী পান্থ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আমরাও একটি ঘর দখল করিলাম। স্থানটি মন্দ নহে বটে, কিন্তু এক দোষে ইহার সকল গুণ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এখানে উনকি পোকার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এত অধিক পোকা যে, নিশ্বাস গ্রহণ করিতে গেলে নাসিকায়, কথা কহিতে গেলে মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। এ উৎপাতে কোনরূপে নাসিকায় ও মুখে কাপড় বাঁধিয়া নিষ্কৃতিলাভ করা গেল।

ভোজনাদি সাঙ্গ হইলে পাহাড়ীদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া গন্তব্যপথের বিষয় অবগত হইতে লাগিলাম। এ আলাপে সুফল ফলিল, আলমোড়াতে থাকিবার স্থানের সন্ধান পাইলাম।



ডাক-বাংলা।



পঞ্চচুলীর তুষারদৃশ্য।

ভোজনের অসুবিধা হইল না। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করা গেল। পথে এক জন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হয়। ভীমতালের দোকানে একত্র অবস্থান ও ভোজন করা হয়, এজন্য পরিচয়টা একটু ঘনীভূত হইয়াছিল। তিনি বিদায়-কালে মঙ্গলকামনা করিয়া, যে দেশে গমন করিতেছি, সে দেশের বাণিজ্য ও রাস্তাঘাটের বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখিয়া জানাইলে বড়ই উপকৃত হইবেন বলিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। কিছুক্ষণ ভীমতালের তীর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই নির্জ্জন প্রদেশেও পৃথিবীব্যাপী ঘোর-যুদ্ধের সাড়া বেশ অনুভব করা গেল। ভীমতালের কাছে বহুসংখ্যক তাম্বু—সৈন্যদের কৃত্রিম যুদ্ধ-স্থল—স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ পরিখা (Trench) প্রভৃতি পথিকের নয়নগোচর হইতে লাগিল। ক্রমে নাইনিতালের রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন রাস্তা দিয়া গমন করিতে লাগিলাম। কুলী সংগ্রহ করিবার জন্য যেরূপ আড়কাটি প্রেরিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সিপাহী-সংগ্রহের জন্য হিমালয়ের অভ্যন্তর-প্রদেশে লোক সকল প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা যুদ্ধ যজ্ঞে বলি আহরণ করিয়া আগমন করিতেছিল। কোন কোন দলে ৪।৫, ৭।৮, এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু দলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। অনেকে মনে করিল, আমরাও বুঝি সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য গমন করিতেছি। উভয় পক্ষের মিলন ও সম্ভাষণ পথের নির্জ্জনতা ও নিঃশব্দতা দূর করিয়াছিল। স্থানে স্থানে নিবিড় অরণ্য থাকায় মধ্যাহ্নেও সূর্য্য-কিরণ তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপ এক বনভূমির মধ্যে পাহাড়ের বাঁক ঘুরিয়া অকস্মাৎ এক জন য়ুরোপীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। পরিচয়ে অবগত হইলাম, তিনি যুক্তপ্রদেশের সুপরিচিত মিষ্টার নেসফিল্ডের পুত্র ডাঃ নেসফিল্ড। ইনি মেসোপোটেমিয়ায়

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ছুটীতে আসিয়াছেন। ঘরে অলসভাবে ছুটী কাটাইতে পারেন না, তাই তিনি সস্ত্রীক হিমালয়-পরিভ্রমণ করিতেছেন। তিনি বদরীনারায়ণ অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তিনি নিরামিষভোজী। তিনি কুকুরের গলায় কাঠের মালা পরাইয়া নিজের বৈষ্ণবতা প্রকটিত করিয়াছেন। ডাক্তারের সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছিল, এমন সময় তাঁহার স্ত্রী দীর্ঘ যষ্টি-হস্তে আগমন করেন। প্রাথমিক আলাপে ডাক্তার আমার যাত্রার বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। কৈলাস তীর্থ-যাত্রার কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, "ভগবান্ সর্ব্বত্র আছেন। সেখানে এত কষ্ট করিয়া যাইবার দরকার কি?" উত্তরে আমি বলিলাম, "আপনার কথা যে খুব সত্য, এ কথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু আপনি বলুন, আপনার শরীরের সর্ব্বত্র কি চৈতন্ত নাই? সর্ব্বত্র আছে;—পায়ে আছে, হাতে আছে, শরীরের সর্ব্বত্র আছে। পায়ের উপর যদি লাঠির আঘাত পড়ে, পা তাহা সহ্য করিয়া থাকে; কিন্তু চক্ষুতে যদি পদ্মের রেণু পতিত হয়, সেই রেণুও চক্ষু সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। ইহার কারণ কি? পায়ে কি চৈতন্ত নাই? আছে। কিন্তু চক্ষুতে চৈতন্ত বিশিষ্টরূপে অভিব্যক্ত। ভগবান্ আমার সর্ব্বত্র আছেন, লীলাময় কৈলাসে ব্যক্ত হইয়া লীলা করিয়া থাকেন। সে স্থানের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আপনারা পুলকিত হইয়া বিমোহিত হন; আমরা শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া কোটি কোটি প্রণাম করিতে থাকি।"

ডাক্তার আমার কথা কিরূপভাবে গ্রহণ করিলেন, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু তাঁহার পত্নী আমার করমর্দ্দন পূর্ব্বক আমার শুভকামনা করিয়া বিদায় প্রদান করেন।

নানা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অপরাহ্নকালে আমরা রামগড়ে

উপস্থিত হইলাম। এ সকল প্রদেশ কুলীদের সুপরিচিত; তাহারা একটি দ্বিতল গৃহে বোঝা লইয়া উপস্থিত হইল।

রামগড় এক সময় বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন জনপদ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে হীন অবস্থায় পতিত হইলেও তাহার প্রাচীন সৌভাগ্যের চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এ প্রদেশে পুরাকালে প্রচুর পরিমাণে লৌহ উৎপন্ন হইত। বহুস্থানে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। লৌহের সহিত জাতির উন্নতির ও অবনতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যে জাতি যে পরিমাণে উন্নত, তাহার লৌহ-বাণিজ্যও সেই পরিমাণে বিস্তৃত। ভারতে যখন লৌহের জোর ছিল, তখন ভারত উন্নত স্থানে সমাসীন ছিল। যে সময় ভারত জগতে অতুলনীয় বলিয়া ঘোষিত হইত। সেকালে দক্ষিণ ও উত্তর উভয় ভারতে উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুত হইত। ইহার সহিত লৌহকারের সম্মানও সমাজে প্রচুর পরিমাণে ছিল। যে সকল হিন্দু যবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও লৌহকারকে সম্মান দিতে ভুলিয়া যায়েন নাই। রাজ-দরবারে তাঁহারা বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত পরিগৃহীত হইতেন। ভারতের দুর্দ্দশার সহিত কর্ম্মকারদের অধঃপতনও শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে যে সকল স্থানে লৌহ প্রস্তুত হইত, তাহার কতিপয় স্থান পরিদর্শন করিলাম। এক সময় এ প্রদেশ নানাপ্রকার সুস্বাদু ফলের বাগানে পরিপূর্ণ ছিল। উদ্যম ও অধ্যবসায়ের অভাবে ইহাও দুরবস্থায় পরিণত হইয়াছে। এ সকল প্রদেশের জল-বায়ু ভাল; দুর্ব্বল বাঙ্গালী যদি কিছু মূলধন সংগ্রহ করিয়া এই প্রদেশে জীবিকা উপার্জ্জনের পন্থা আবিষ্কার করে, তাহা হইলে স্বাস্থ্য ও অর্থ উভয়ই লাভে সমর্থ হইবে।

প্রাতঃকালে আবার গমনে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। ছোট ছোট

অনেক পার্ব্বত্য নদী অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। নানা বনস্পতি-পরিপূর্ণ হওয়াতে এ প্রদেশ অত্যন্ত রমণীয় হইয়াছে। চীড়ের বায়ুতে এ প্রদেশ বড়ই স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইয়াছে, ইহা ফুস্‌ফুসের পক্ষে বলকর। পর্ব্বতে উঠিতে ফুস্‌ফুসের বলের অত্যন্ত প্রয়োজন। এ প্রদেশ নানা প্রকার বন্য পশু-পক্ষীতে পরিপূর্ণ, শীকারীর পক্ষে এ প্রদেশ বড়ই অনুকূল। পর্ব্বতের পাদদেশে তরাইএর জঙ্গলে হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশু প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

আলমোড়ার গমনপথে সর্ব্বোচ্চ স্থান গাগরের শিখরদেশ প্রায় ৮ হাজার ফুট উচ্চ হইবে। আকাশমণ্ডল পরিষ্কার থাকিলে এই স্থান হইতে হিমালয়ের তুষারদৃশ্য বেশ ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। আরোহণ যেরূপ কষ্টকর, অবরোহণ সেইরূপ সহজসাধ্য। বৃক্ষলতার ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া গন্তব্য পথ অতিক্রম করিয়াছে, পথের ধারে ঝরণা কুল কুল করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। নানা প্রকার পক্ষী মধুর শব্দ করিয়া দিক সকল ধ্বনিত করিতেছে। এই সকল নয়নরঞ্জন দৃশ্য ও শ্রুতিসুখকর শব্দ উপভোগ করিতে করিতে আলমোড়ার নিকটবর্ত্তী হইলাম। আলমোড়ার ১০ মাইল দূরে পিউড়িতে মধ্যাহ্নক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলাম, সুতরাং ভোজনের অভাবে ক্লেশভোগ করিতে হয় নাই। আলমোড়ার এক মাইল দূরে খৃষ্টান মিশনারীদের আশ্রম দেখিলাম। তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারের সহিত শারীরিক রোগ দূর করিবার জন্য এ স্থানে আরোগ্য-নিকেতন স্থাপন করিয়াছেন; কুষ্ঠাদি ঘৃণিত রোগের চিকিৎসা করিয়া সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই সকল দেখিতে দেখিতে আলমোড়ায় উপস্থিত হওয়া গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অপরাহ্নকালে আলমোড়ায় উপস্থিত হইলাম। কোথায় অবস্থান করিব, ইহাই হইল প্রথম চিন্তা। কাঠগুদামে অবস্থানকালে এক জন আলমোড়াবাসী বলিয়াছিলেন, নৃসিংহদেবের মন্দিরে থাকিবার কোন অসুবিধা হইবে না। এই সূত্রমাত্র অবলম্বন করিয়া নৃসিংহ-দেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, কয়েক জন সাধু ধুনী জ্বালাইয়া অবস্থান করিতেছেন। কুলীর পৃষ্ঠে বোঝা, অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে আমাকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া এক জন আমাকে "এ স্থানে থাকিবেন কি?"—প্রশ্ন করেন। আমার সম্মতি অবগত হইয়া তিনি একটা ঘর পরিষ্কার করিতে আদেশ করেন। সাধু, যে গৃহ আমার জন্য কল্পনা করেন, তাহা আবর্জ্জনাপূর্ণ থাকায় "পিশু"-পরিপূর্ণ হইয়াছে। সংস্কৃত "পিশুন" শব্দ হইতে এই পাহাড়ী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবের নামকরণ হইয়াছে কি না; জানি না, কিন্তু পিশুন হইতেও এই ক্ষুদ্র "পিশু" ভীষণতর, পিশুন পশ্চাদ্‌ভাগে দুই চারিটা নিন্দা করিয়া নিবৃত্ত হয়, কিন্তু পিশু পশ্চাৎ, সম্মুখ, উভয় ভাগে দংশন করিয়া বিব্রত করিয়া থাকে। কবি সুবন্ধু "কুলদ্বেষী পিশুন" ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন, আমাকে কিন্তু "পিশু"-ভয়ে গৃহত্যাগ করিতে হইল। আমাকে গৃহত্যাগ করিতে দেখিয়া পাশের এক জন বলিলেন, "আপনি কোথায় যাইবেন? উপরে ঐ ধর্ম্মসভার গৃহে সুখে অবস্থান করুন।" উত্তরে আমি কহিলাম, "সুখ ত গৃহে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, কোনরূপে থাকিতে পারিলেই যথেষ্ট বিবেচনা করিব।" ভদ্রলোকটি ঘরের চাবি আনিবার জন্য সম্পাদকের কাছে লোক

প্রেরণ করিলেন; আমিও আশ্বস্ত হইলাম। এই অবসরে কুলীদের ৩৲ টাকা হিসাবে আর ঘোড়াওয়ালাকে ৭॥০ টাকা হিসাবে ভাড়া দিয়া বিদায় প্রদান করিলাম। ইহার উপর কিছু বকসিশও তাহারা আদায় করিয়াছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে স্থানীয় ধর্ম্মমণ্ডলের সম্পাদক পণ্ডিত নন্দকিশোরজী উপস্থিত হইলেন। কাশীতে ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের যে উৎসব হইয়াছিল, সেই উৎসবে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে আর নূতন করিয়া পরিচয় প্রদান করিতে হইল না। দূর হইতে দেখিয়াই তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন; অবস্থানের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। স্থানটি মন্দ নহে। পাশেই গুর্খা সেনানিবাস। ইহার বাদ্যধ্বনি,সেনাদের উচ্চস্বর, বন্দুকের শব্দ প্রভৃতি যেন প্রসুপ্ত সামরিক ভাবকে জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। সম্মুখের পাহাড়টি বৃক্ষাচ্ছাদিত হওয়ায় বেশ নয়নসুখকর হইয়াছিল। উত্তরদিকে চিরতুষারাবৃত নন্দাদেবী যেন শ্বেতকেশ-মণ্ডিত মস্তক উত্তোলন করিয়া স্বীয় আভিজাত্য আর ভারতসাম্রাজ্যের ভিতর আপনার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন। উত্তরে ত্রিশূল, পঞ্চচূলী আর পশ্চিমদিকে বদরীনাথের শিখর। এই সকল দেব-নিবাস পর্ব্বতমালা যেন ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার জন্য মস্তক উন্নত করিয়া বরাভয় প্রদান করিতেছেন, আর যেন মৌন ভাষায় বলিতেছেন—"আমাদের উপর কত শত বজ্রাঘাত, কত শত ঝটিকা আর কত যে তুষারপাত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই; কিন্তু অটল অচল হইয়া আমরা সে সব সহ্য করিতেছি। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা পরাভূত হইয়া প্রস্থান করিয়াছে; সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয়ের সহিত বিপদন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে, আর আমরাও অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া আছি।" এইরূপ কথা যেন আমার কর্ণ-কুহরে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

হিমালয়ের প্রত্যেক পর্ব্বত, প্রত্যেক স্থান পবিত্র এবং কোন না কোন প্রাচীন স্মৃতির সহিত বিজড়িত। সে হিসাবে আলমোড়াও অতি পুণ্যভূমি। যে পর্ব্বতের উপর আলমোড়া সহর অবস্থিত, সে পর্ব্বত পুরাণে 'কাষায় পর্ব্বত' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার বর্ণনা স্কন্দ-পুরাণের অন্তর্গত মানস খণ্ডের ৫২ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে :—

"কৌশিকিশাল্মলীমধ্যে পুণ্যঃ কাষায়পর্ব্বতঃ।"

কৌশিকী ও শাল্মলী নদীর মধ্যে পুণ্যজনক কাষায় পর্ব্বত অবস্থিত। কৌশিকী বর্ত্তমান কোশি আর শাল্মলী শোল নামে কথিত হইয়া থাকে। আলমোড়া হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে কাষায়েশ্বর ও কাষায়েশ্বরীর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

আলমোড়ার নামকরণ সম্বন্ধে কথিত হয় যে, "অম্ল" শব্দ হইতে আলমোড়া শব্দের পরিণতি হইয়াছে। এক মন্দিরের ধাতুপাত্র অম্ল দিয়া পরিষ্কারের জন্য এক ব্যক্তিকে কিছু ভূমি প্রদান করা হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন, এই অম্ল শব্দ হইতে আলমোড়া শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

এই হিমালয়প্রদেশ বহুকাল হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকল ভোগ করিয়াছিলেন। রামগড় হইতে আসিবার সময় যে গাগর পর্ব্বতের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাহার নাম গর্গাচল। এইরূপ প্রত্যেক পর্ব্বতের সহিত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় স্মৃতি বিজড়িত আছে। এই পর্ব্বত মালার কিয়দংশ মহাভারত পর্ব্বত নামে পরিচিত হইয়া থাকে। তাহার পর ক্ষত্রিয়রা এই সকল পর্ব্বতপুঞ্জ অধিকার করিয়া আপনাদের অধিকারের সীমাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে শ্বেতকায়রা বৎসরের কিয়দংশ সময় যেরূপ পর্ব্বতবাস করিয়া থাকেন, সেইরূপ সে কালের ব্রাহ্মণরাও জীবনের কিছু সময় পর্ব্বতে বাস করিয়া তপশ্চর্য্যা করিতেন।

লোকালয়ের বৃদ্ধির সহিত ক্ষত্রিয়রা এই বিশাল হিমালয়প্রদেশে আপনাদের ভুজবলের প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপ কথিত আছে যে, কতিপয় সূর্য্যবংশীয় রাজপুত হিমালয়প্রদেশে আগমন করিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। কালক্রমে এই ক্ষুদ্র জনপদবাসী গাড়বাল, আলমোড়া, কামায়ুন প্রভৃতি প্রদেশে শক্তি-বিস্তার করিয়াছিলেন। বদরীনারায়ণের পথে যে স্থানে যোশী মঠ অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানে তাঁহারা প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। এই রাজবংশে শৈব ও বৈষ্ণব এই মতগত ভেদের ফলে আত্মবিরোধ উপস্থিত হয়। এই বংশের এক ধারা গোমতী ও সরযূর মধ্যবর্ত্তী উপত্যকা-ভূমিতে একটি নগর স্থাপন করেন। পুরাকালে এই নগর কার্ত্তিকেয়পুর নামে খ্যাতি লাভ করে। এই রাজবংশ কাতুর রাজবংশ নামে প্রসিদ্ধ। অনেকে অনুমান করেন যে, কার্ত্তিকেয় শব্দ হইতে "কাতুর" শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। আবার আর এক মতে এরূপ কথিত হয় যে, বর্ত্তমান বৈজনাথ নামক স্থানের নিকটে এই বংশীয়রা করবীরপুর নামক একটি নগর স্থাপন করেন। ইহার ভগ্নস্তূপ হইতে প্রস্তরাদি লইয়া নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকেরা গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এক সময় ইহা যে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তাহা এই স্থানের ভগ্নস্তূপ দেখিলে বেশ বুঝা যায়। কালক্রমে এ স্থান অস্বাস্থ্যকর হওয়াতে লোকসকল ইহা পরিত্যাগ করে। এই বংশের শিলালেখ ও তাম্রলিপি বাগেশ্বরের পাণ্ডুকেশ্বরের মন্দিরে এবং কতিপয় ভূস্বামীর নিকট দেখিতে পাওয়া যায়। যত দিন এই রাজপরিবার প্রজাবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পবিত্র জীবনযাপন করিয়াছেন, তত দিন তাঁহারা বিজয়শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর ব্যভিচারী ও প্রজাপীড়ক হওয়ায় তাঁহাদের রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়। এই রাজবংশের বংশধররা আসকোট

প্রভৃতি স্থানে এখনও পূর্ব্ব-গৌরবের নামমাত্র অবশেষ রক্ষা করিয়া পূর্ব্বের কথা স্মরণ করাইয়া থাকেন।

কাতুর রাজবংশের হীন অবস্থার সহিত এ প্রদেশে চন্দ রাজবংশের আবির্ভাব হয়। এই বংশের আদিপুরুষ সোমচন্দ নামক চন্দ্রবংশীয় জনৈক ব্যক্তি প্রয়াগের নিকট হইতে আগমন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার আভিজাত্যের জন্য কামায়ুনাধিপতি তাঁহাকে জামাতৃত্বে বরণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে উত্তরাধিকারি-সূত্রে তিনি এ প্রদেশের সিংহাসন অধিকার করেন।

চন্দবংশে অনেক গো-ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক, শক্তিশালী, প্রজারঞ্জক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ অঞ্চলে রেশমের ব্যবসায় ইঁহারাই প্রথম প্রচলন করেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে বৃহৎ বৃহৎ দেবায়তন নির্ম্মাণ করিয়া এ দেশের শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ও বিদ্বানদের সম্মান করিতেন। ভারতের সমতলভূমি হইতে ব্রাহ্মণাদি আনয়ন করিয়া তাঁহারা এ প্রদেশে বিদ্যাপ্রচারপক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণ রাজসভা হইতে ভূমি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন।

আলমোড়া সম্বন্ধে এরূপ কথিত হয় যে, এক সময় কল্যাণচন্দ নামক চন্দবংশীয় এক জন রাজা এই পর্ব্বতের অরণ্যে মৃগয়া করিতে আগমন করেন। মৃগয়াকালে এক শশকের অনুসরণকালে কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি শশককে ব্যাঘ্রাকারে পরিণত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হয়েন। এই ঘটনা ব্রাহ্মণদের কাছে বিবৃত করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্মণরা এ স্থানের দুর্গমতার কথা বিবৃত করিয়া এ স্থানে নগর-স্থাপনের জন্য উপদেশ প্রদান করেন। ব্রাহ্মণদের কথা অনুসারে নগর-স্থাপনের জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। যজ্ঞীয় কীলক ব্রাহ্মণরা

শেষ নাগের মস্তকে প্রোথিত করেন। রাজা এ কথায় বিশ্বাসস্থাপন না করিয়া স্তম্ভ তুলিয়া ফেলেন ও দেখেন, স্তম্ভের শেষভাগে শোণিত-চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্রাহ্মণরা রাজার এই কার্য্যে ব্যথিত হইয়া কহেন, আপনার বংশ স্থায়ী করিবার জন্য আমরা যাহা করিলাম, আপনি তাহা স্বয়ংই নষ্ট করিয়া ফেলিলেন!

এই বংশে রুদ্রচন্দ নামে এক জন প্রতাপশালী রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আলমোড়াতে দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া ইহাকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষিত করেন। রুদ্রচন্দ শারীরিক ও মানসিক উভয় বলেই অসাধারণ ছিলেন। এক সময় মোগল সৈন্য ইঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন, উভয় পক্ষের সৈন্য বৃথা ক্ষয় না করিয়া, উভয় পক্ষের দুই জন প্রধান পুরুষ দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রস্তাব করিয়া পাঠান। এই উভয়ের জয়-পরাজয়ের সহিত প্রকৃত জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হইবে। মোগল পক্ষ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে, রুদ্রচন্দ স্বয়ং দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া উভয়ে তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বিজয়শ্রী কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইল। রুদ্রচন্দ অপূর্ব্ব শারীরিক শক্তির প্রভাবে বিজয়লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইলেন। মোগল সেনাপতি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। সম্রাট্ আকবর লোকক্ষয়কর যুদ্ধের পরিবর্ত্তে এইরূপে জয়-পরাজয় নির্ণীত হওয়াতে রুদ্রচন্দের উপর প্রসন্ন হয়েন, আর দরবারে আগমন করিবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। আলমোড়াবাসীরা বলেন, সম্রাট্ সম্ভ্রমের সহিত রুদ্রচন্দকে গ্রহণ করিয়া পাহাড়ী সৈন্য সহ তাঁহাকে কোন এক স্থানে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। রুদ্রচন্দ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের গুণগৌরব করিতেন। তাঁহার সময় আল্‌মোড়ায় এত অধিকসংখ্যক গুণবান্ ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন যে, ইহা কাশীর সহিত এ

বিষয়ে স্পর্দ্ধা করিত। এ কথা এখনও আল্‌মোড়াবাসীরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। কবিবর ভূষণ যে সময় হিন্দুস্থানে মনোমত আশ্রয়লাভে বঞ্চিত হয়েন, সে সময় তিনি এই হিমালয়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশে আগমন করিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। এই বংশে রাজ বাহাদুর বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার বাল্যজীবন দুঃখপরম্পরা-বিজড়িত। ইঁহার পিতৃদেব পাছে রাজ্যে উত্তরাধিকারী হয়েন, এই আশঙ্কায় রাজা বিজয়চন্দের পক্ষাবলম্বী কর্ত্তৃক উৎপাটিতনেত্র হইয়াছিলেন। আর এই বালকও উপর হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। অনুকূল বিধাতা বালককে রক্ষা করিলেন—সে কোনরূপে আহত হইল না। তেওয়ারী ব্রাহ্মণমহিলা কর্ত্তৃক তিনি পালিত হইলেন। অপত্যবিহীন ত্রিমলচন্দ দত্তক লইবার জন্য একটি পুত্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তিনি রাজাবাহাদুরের সন্ধান পাইয়া তাঁহাকেই দত্তক গ্রহণ করেন। রাজবাহাদুরের উপর ভাগ্যদেবী প্রসন্না হইলেন। তিনি বিশৃঙ্খল রাজ্যকে সুশৃঙ্খল করিলেন এবং সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে ফারমান আনাইয়া সিংহাসনে সুদৃঢ় হইলেন। তিব্বতীরা ভুটিয়া ব্যবসায়ী ও কৈলাসমানসরোবর-যাত্রীদের উপর অত্যাচার করিত ; ইহার প্রতীকার করিবার জন্য তিনি হিমালয় অতিক্রম করিয়া তাকলাখর বা তাকলাকোট আক্রমণ করিয়া হুনিয়াদের বশীভূত করিয়াছিলেন। এইরূপে তিব্বতের পথ নিষ্কণ্টক হইয়াছিল। ভীমতালের নিকট রাজবাহাদুরের নাম স্মরণ করাইয়া একটি মন্দির এখনও মস্তক উত্তোলন করিয়া অবস্থান করিতেছে।

তিব্বত অভিযানে যে সময় রাজবাহাদুর নিযুক্ত ছিলেন, সে সময় শ্রীনগরাধিপতি গাড়ওয়ালী সৈন্য লইয়া রাজবাহাদুরের রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজবাহাদুর তিব্বত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া

গাড়ওয়ালীদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়নপর হয়। তিনি তাহাদের রাজধানী শ্রীনগরে বিজয়ী সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। পরাজিত শ্রীনগরাধিপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই বিজয়-সংবাদ আল্‌মোড়ায় প্রেরণ করিবার জন্য শ্রীনগর হইতে আল্‌মোড়ার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতের শিখরভাগে তৃণপুঞ্জ প্রজ্বালিত করিয়া সঙ্কেতে বিজয়সংবাদ আল্‌মোড়ায় প্রেরণ করা হয়। বর্ত্তমান কালেও আল্‌মোড়াবাসীরা আশ্বিন মাসে পর্ব্বতশিখরে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া সেই ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া উৎসবকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

চন্দ রাজবংশীয়দিগের মধ্যে অধার্ম্মিকতার সহিত নানাপ্রকার পাপাচরণ ক্রমে ক্রমে প্রবেশ লাভ করে। প্রজাপীড়ন তাঁহাদিগের দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইল। রাজদ্বেষীর সংস্রবে যে কেহ আসিল, বিনা বিচারে তাহারা নিহত হইতে লাগিল। তাহাদের ভূসম্পত্তি রাজসম্পত্তির অন্তর্গত হইল। এইরূপে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ-পরিবার ইঁহাদের অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই বংশে কল্যাণচন্দ নামে এক জন ক্রূরপ্রকৃতি রাজা ছিলেন। ইঁহার গুপ্তচর রাজ্যের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া সমস্ত গুপ্ত সংবাদ প্রেরণ করিত। এক সময় ব্রাহ্মণরা ইহার অত্যাচার প্রভৃতির আলোচনা করিয়া তাহার বিদূরণের মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, এই অপরাধে তিনি ব্রাহ্মণদের চক্ষু উৎপাটনের আদেশ করেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, ব্রাহ্মণদের উৎপাটিত চক্ষুপূর্ণ সাতটি পাত্র বিনসর প্রাসাদে রাজার নিকট নীত হইয়াছিল।

ইঁহার রাজত্বকালে রোহিলারা কামায়ুন প্রদেশ আক্রমণ করিয়া হিন্দু দেবালয় লুণ্ঠন ও অপবিত্র করিয়া বহুসংখ্যক প্রতিমা ভগ্ন

করিয়াছিল। তাহারা কামায়ুনের অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ মন্দির জাগেশ্বর লুণ্ঠন করিতে গমন করিলে বহুসংখ্যক মধু-মক্ষিকা মধুচক্র হইতে নির্গত হইয়া মুসলমান সৈন্য আক্রমণ করে। মনুষ্য যাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই, মৌমাছি তাহা সম্পন্ন করিয়া দেশের সম্মান রক্ষা করিয়াছিল। অবশেষে বৃদ্ধাবস্থায় অন্ধ হইয়া কল্যাণচন্দ ইহলীলা শেষ করেন।

চন্দ-রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত ক্রূরপ্রকৃতির হইলেও ইঁহাদের মধ্যে ভদ্রপ্রকৃতির সংখ্যাও বড় কম ছিল না। এখনও আল্‌মোড়াবাসীরা দেবীচন্দনামক এক জন রাজার কথা আনন্দের সহিত কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইনি রাজ্যের সমস্ত প্রজাকে ঋণমুক্ত করিবার জন্য অতীত রাজাদের সঞ্চিত ধনাগারের দ্বার অনর্গল করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার বহু কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। এরূপ উদারতার উদাহরণ ভারত ব্যতীত অন্যত্র আছে কি না, তাহা আমি অবগত নহি।

চন্দরাজবংশের দুর্ব্বলতার সহিত নেপালীরা কামায়ুন ও গাড়বাল প্রদেশ আক্রমণ করেন। নেপালের ইহা অভ্যুদয়ের সময়। নেপালরাজ-দরবার সমদর্শী হইলেও ইহার কর্ম্মচারীরা অনেক সময় অমানুষিক অত্যাচার করিয়া জনসাধারণের অপ্রিয় হইয়াছিল। এক সময় নেপালীরা, তাহাদের উপর যাহারা অসন্তুষ্ট, তাহাদিগকে এক রাত্রিতে নিহত করিয়াছিল। যে রাত্রিতে এই ঘটনা সাধিত হয়, সে রাত্রির কথা কামায়ুনবাসীদের মধ্যে প্রবাদ-বাক্যরূপে পরিণত হইয়াছে। "মজল কি রাত" এ অঞ্চলের লোকেরা এখনও বিভীষিকার সহিত উচ্চারণ করিয়া থাকে। এক সময় নেপালীরা কামায়ুনবাসীর উপর নূতন কর স্থাপন করেন। কামায়ুনরা ইহা প্রদান করিতে

ইতস্ততঃ করাতে নেপালী শাসনকর্ত্তা ১৫ শত গ্রামের মণ্ডলদিগকে আল্‌মোড়ায় আসিবার জন্য আহ্বান করেন। গ্রামাধিপরা করবিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবার জন্য আগমন করিলে তাহারা সকলে নিহত হইয়াছিল। ইহারা হরিদ্বারে প্রায় ২ লক্ষ পাহাড়ীকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়াছিল। এইরূপ নানা কারণে পর্ব্বতের অধিবাসীরা নিম্নভূমিতে গমন করিয়া জীবন রক্ষা করে। নেপাল যদি সে সময় নিপুণতার সহিত প্রজাপালন করিতেন, তাহা হইলে সমস্ত হিমালয় যে আজ তাঁহাদের শাসনাধীন থাকিত, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এ সময়কার ইংরাজ-চরিত্রের কথার একটু উল্লেখ না করিলে এ সময়ের চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ইংরাজ কয়েক ভাগে বিভক্ত হইয়া নেপাল রাজ্য আক্রমণ করেন। ইহাদিগের মধ্যে এক দলের অধিনায়ক General Gillespie; ইনি নেপালীদের কলিঙ্গ-দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন। দুর্গ আক্রমণকালে ইংরাজ সেনানী গোলকাঘাতে নিহত হয়েন। দুর্গবাসীরা দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইলে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। এই অবরোধকালে এক জন নেপালী সৈন্য দুর্গের ভগ্ন স্থান দিয়া অবতরণ করিয়া ইংরাজদিগের নিকট হাত নাড়িতে নাড়িতে গমন করে। কিয়ৎক্ষণের জন্য সে দিকে গোলাবর্ষণ বন্ধ হয়। দেখা যায়, এক জন গুর্খার দাঁতের নীচের পাটিতে গুলী লাগায় সে আহত হইয়াছে। ইংরাজ চিকিৎসক যত্নের সহিত চিকিৎসা করিয়া তাহাকে স্বাস্থ্যসম্পন্ন করেন। আরোগ্য হইলে সে তাহার সেনাদলের মধ্যে গমন করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ব্যক্তিগতভাবে সে ইংরাজকে বিশ্বাস করিয়াছে, কিন্তু জাতিগতভাবে সে দেশের জন্য যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। এরূপ অনেক গুর্খা সৈন্য ইংরাজ হাঁসপাতালে গমন করিয়া ইংরাজের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস

দেখাইয়াছে। অপর পক্ষে ইংরাজও নিজেদের সদাশয়তা দেখাইয়া ভারতবাসী শত্রু-মিত্র উভয়ের হৃদয়ে চরিত্রবলে অসামান্য শ্রদ্ধা লাভ করিয়া এই অপূর্ব্ব সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

আল্‌মোড়া স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান, বিশেষতঃ যক্ষ্মারোগীর পক্ষে। এ স্থানের ভাড়াটে বাড়ীতে অনেক সময় অবস্থান করা নিরাপদ নহে। নানাস্থানের যক্ষ্মারোগী এ স্থানে আরোগ্যলাভাশায় আগমন করেন। এ জন্য ভাড়াটে বাড়ী প্রায়ই দূষিত। চীরের বায়ু ও বায়ুতে আর্দ্রতা না থাকা দুই কারণে এ স্থান ফুসফুস-রোগীর পক্ষে স্বাস্থ্যকর। এ স্থানে প্রায় ৪০ ইঞ্চ বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, এজন্য এ স্থানের শুষ্কতা রোগীর পক্ষে অনুকূল। এ স্থানে একটি কুষ্ঠালয়ও আছে। আল্‌মোড়ার চতুর্দ্দিকে উচ্চ পর্ব্বত থাকায় জলীয় মেঘ আগমনে বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সমুদ্র হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ৫ হাজার ৫ শত ফিট। শীতকালে জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে সময় সময় তুষারপাত হইয়া থাকে। সে তুষার সূর্য্যোদয়ের সহিত অল্পসময়ের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়।

এইরূপ জল-বায়ু ও প্রাচীন স্মৃতিবিজড়িত আল্‌মোড়াতে আমাকে প্রায় এক সপ্তাহ অবস্থান করিতে হইয়াছিল। অবস্থানকালে এক দিন চন্দরাজবংশের এক বংশধরের সহিত পরিচয় হয়। তাঁহার আকৃতি, ভদ্রতা এবং চরিত্রের মাধুর্য্য তাঁহার উচ্চবংশের অনুরূপ। তিনি আমাদের দেশের অবস্থা অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। এক জন বাঙ্গালী সাধুর উপর তিনি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করেন। এইরূপ নানা প্রশ্নে বুঝিলাম, বাঙ্গালীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অল্প নহে।* তিনি আমাকে তাঁহার সহিত পুনরায় সাক্ষাতের জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করেন।

তাঁহার সে অনুরোধ নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় আমার দ্বারা পূরিত হয় নাই।

শ্রীযুত অস্তিরাম সা মহাশয় জাতিতে বৈশ্য; এ স্থানের এক জন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী। চন্দরাজাদের সময় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষরা উচ্চপদ অধিকার করিতেন। তাঁহার পুত্ররা শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ। এক দিন তাঁহার দোকানে কিছু দ্রব্য ক্রয় করিতে উপস্থিত হই। তিনি আমার কৈলাস যাইবার সঙ্কল্প শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হয়েন ও তাঁহার বাড়ীতে পরদিবস ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। পরদিবস এক জন লোক আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। সা মহাশয় আল্‌মোড়ার নানা প্রাচীন কাহিনী কহিয়া স্বামী বিবেকানন্দজীর কথা অতি সম্ভ্রমের সহিত কহিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাঁহার বাড়ীতে অনেকবার আতিথ্য-গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের উপর স্বামীজীর যথেষ্ট কৃপা ছিল— ইত্যাদি কহিতে লাগিলেন। সা মহাশয় আমাকে কয়েকখানি পরিচয়-পত্র প্রদান করেন। সেই পত্র রাস্তায় আমার যথেষ্ট উপকারে আসিয়াছিল। আর দিয়াছিলেন, একগাছি দীর্ঘযষ্টি। এই যষ্টি হিমালয়ের দুর্গম দুরারোহ প্রদেশে বহুবার আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। এই যষ্টি প্রাণরক্ষকরূপে ৩।৪ মাস আমার সহচরের মত আমার পার্শ্বে অবস্থান করিয়াছিল।

আল্‌মোড়ায় অবস্থানকালে স্থানীয় কলেক্টারের হেড ক্লার্ক পালিত মহাশয়ের সহিত পরিচিত হই। আমার পিতৃদেব ডাঃ ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তিনি বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের এ পরিচয় বাঁকিপুরে। সে সময় আমি অল্পবয়স্ক ছিলাম। পালিত মহাশয় সে সময়কার বাঁকিপুরের অনেক সামাজিক প্রথার গল্প করেন। বলদেব বাবু, নবীন বাবু (সরকারী উকীল), গুরুপ্রসন্ন

বাবু, রামগতি বাবু প্রভৃতির সহিত আমার পিতাঠাকুরের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক পুরাতন কথা কহিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। জনক-জননী ও জন্মভূমির কথা এ সময় বড়ই মধুর বোধ হইয়াছিল। দূরদেশে আসিয়া যে এ সব কথা শুনিব, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। পালিত মহাশয়ও কয়েকখানি পরিচয়পত্র দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছিলেন।

আল্‌মোড়া পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে উদ্‌ভাসিত হইলেও এ প্রদেশের হিন্দুরা সরলতা, অতিথি-প্রিয়তা, স্বধর্ম্মে আস্থা প্রভৃতি সদ্‌গুণে জলাঞ্জলি প্রদান করে নাই। তাঁহাদের ভদ্রতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

ধর্ম্ম-সভার গৃহে অবস্থানকালে সভার কতিপয় উদ্যোগী সভ্যের সহিত আমি পরিচিত হই। তাঁহাদের আগ্রহে ভগবতী নন্দাদেবীর আঙ্গিনায় "তীর্থ-যাত্রা" সম্বন্ধে আমাকে একটি বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। সভ্যদের অনুরোধে পরদিবস "বর্ত্তমানকালে আমাদের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম। এই বক্তৃতাকালে আমি আল্‌মোড়াবাসী নেতাদের উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলাম, "এ দেশের গো-মহিষ বহুকাল ধরিয়া হিমালয়ের তৃণপত্র উপভোগ করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে বনের ভিতর গমন করিলে নিপীড়িত হইতেছে। তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য কি কাহারও হৃদয় ব্যাকুলিত হয় না? বনপ্রদেশ দিয়া আগমনকালে অনেকের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ শুনিয়াছি; অনেককে উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে দেখিয়াছি। গভর্ণমেণ্টের নিয়ম অপেক্ষা আমাদের স্বদেশবাসীর কঠোর ব্যবহারে দরিদ্ররা অধিক পীড়িত হইতেছে। এজন্য দোষটা কিন্তু সরকারের উপর পতিত হইতেছে। আমাদের অনুরোধ, সরকার বাহাদুর এই

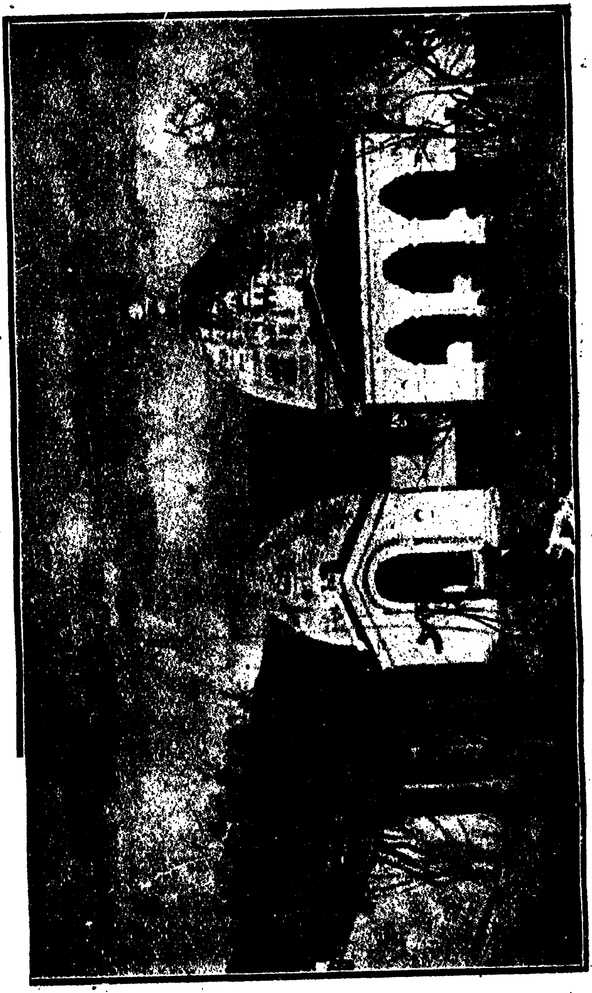


স্বামী বিবেকানন্দ।

ঘোরযুদ্ধে বিশেষরূপে বিব্রত হইলেও অনতিবিলম্বে এই অত্যাচারের প্রতীকার করুন। তাহা হইলে সহস্র সহস্র প্রজার আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন। যাঁহারা এরূপ অপ্রিয় সত্য সরকারের কর্ণগোচর করেন, তাঁহারাই যথার্থ বন্ধু। একশ্রেণীর রাজপুরুষ আছেন, যাঁহারা ইঁহা-দিগকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন; ইঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য সর্ব্বদা বদ্ধমুষ্টি। কতিপয় আল্‌মোড়াবাসী, স্বদেশবাসীর দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই 'অপরাধে' তাঁহারা 'পাহাড়ের বাঙ্গালী' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এরূপ কর্ম্মচারীর সংখ্যা বেশী হইলে বোধ হয়, নানা দেশীয় ভারতবাসী একদেশবাসিরূপে পরিণত হইবে।" এ স্থানে এক জন রাজপুরুষ ছিলেন। তিনি বলিতেন, "মানুষে আমার দরকার নাই; তারপিনপ্রসূ চীর গাছ থাকিলে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিবে!" এইরূপ অদূরদর্শী ইংরাজ রাজপুরুষদের জন্য ইংরাজ জাতির উপর কলঙ্ক আরোপিত হইয়া থাকে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

দুই দিনের বক্তৃতায় জনসাধারণ আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছিলেন। ইহার নিদর্শনস্বরূপ অনেকে বাদাম, কিস্‌মিস্‌, সোহারা, গেঞ্জী, ক্যাম্বিসের বস্ত্রাধার প্রভৃতি নানা প্রকার আমার প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপহার দিয়া আমাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম সভার যে গৃহে আমি ছিলাম, সেই গৃহের পাশের ঘরে এক জন সন্ন্যাসী অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি আমার মানস-সরোবর, কৈলাস প্রভৃতি স্থানে গমনের সঙ্কল্প শুনিয়া আমাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই সকল উপদেশের ভিতর একটি কথা তিনি বলিয়াছিলেন, তিব্বতে ভোজনের বড়ই অসুবিধা, খাদ্যদ্রব্যের বড়ই অভাব। যাঁহারা মাংস ভোজন করেন, তাঁহাদের পক্ষে তিব্বত অসুবিধার নহে। তথায় অতি উৎকৃষ্ট ভেড়ার মাংস পাওয়া যায়।



নন্দা দেবীর মন্দির।

য়ুরোপীয়রা অতি সমাদরে ইহা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে মাংস-ভোজনের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সে প্রদেশে অবস্থানকালে ইহা গ্রহণ করিতেন; তাহাতে দোষ নাই, ইত্যাদি কহিয়া আমাকে প্রলুব্ধ করেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার কথামত আমি কার্য্য করিতে সমর্থ হই নাই।

বুধবার ৫ই জুন প্রাতঃকাল ৭টার সময় আল্‌মোড়া পরিত্যাগ করি। কুলীদের আসিতে কিছু বিলম্ব হওয়াতে যাত্রা করিতে দেরী হইয়াছিল। সমাগত নূতন বন্ধুগণকে বিদায় দিয়া উৎসাহ ও আনন্দের সহিত অজ্ঞাত প্রদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

তৃতীয় অধ্যায়

কাঠগুদাম হইতে আল্‌মোড়া ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছিলাম। আল্‌মোড়ায় সুবিধামত ঘোড়া পাওয়া গেল না; সুতরাং পদব্রজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কুলীদের পৃষ্ঠে বোঝা দিয়া আসকোট অভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। কুলীরা আসকোট পর্য্যন্ত যাইবে, এরূপ স্থির হইল। সমস্ত পথ আমাদের সহিত এ স্থানের কুলী বাহাতে থাকে, এরূপ চেষ্টা করা গেল; কিন্তু কেহ রাজি হইল না, সুতরাং আসকোট পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করা গেল। আসকোট আল্‌মোড়া হইতে প্রায় ৭০ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। সে স্থানে এক জন রাজা অবস্থান করেন। তাঁহার নামে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করা গিয়াছিল। সুতরাং তথায় কুলী সংগ্রহে অসুবিধা হইবে না বিবেচনা করিয়াছিলাম।



আলমোড়া ও আস্কোটের মধ্যবর্ত্তী দোদুল্যমান সেতু।

আল্‌মোড়াকে আমি কৈলাসের দ্বার বলিয়া বিবেচনা করি। ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতার শেষ তারের সহিত বিজড়িত। টেলিগ্রাফের তারেরও ইহা শেষ সীমা। এই স্থান হইতে যত দূরতর প্রদেশে গমন করিব, ততই আমরা প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার মধ্যবর্ত্তী হইব; ততই আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে দূরতর হইব। পাশ্চাত্য সভ্যতায় জর্জ্জরিত আমরা কিছুদিনের জন্য এই বিদেশী সভ্যতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া, হিমালয়ের উপত্যকায়, সানুদেশে লুক্কায়িত আমাদের সুপ্রাচীন—প্রাণারাম—চিরমধুর প্রাচীন প্রথা দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ধর্ম্মের তিন পদ বহুদিন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে, আমাদের বিবেচনায় হিমালয়ের কন্দরে তাহা লুক্কায়িতভাবে আছে।

আল্‌মোড়া হইতে আসকোট যাইতে হইলে কখন হিমালয়ের উচ্চপ্রদেশে আরোহণ, কখন বা নিম্নে অবরোহণ করিয়া যাইতে হয়। এই রাস্তায় মনোমুগ্ধকর নানাপ্রকার প্রাকৃতিক দৃশ্য, নানাপ্রকার বনস্পতি, নানাপ্রকার পক্ষীর সুললিত সঙ্গীত, বহুপ্রকার খনিজ দ্রব্য, হিন্দু রাজন্যবর্গের নানাপ্রকার প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ দেখিতে দেখিতে আসকোটে উপস্থিত হই।

প্রথম দিন আল্‌মোড়া হইতে প্রায় আট মাইল দূরে বারছিনা নামক স্থানে মধ্যাহ্নক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। প্রায় ১০টার সময় বারছিনা গ্রামের একটি দোকানে উপস্থিত হইলাম। একজন দৃঢ়কায় রজপুত যুবক আসিয়া অভ্যর্থনা করিল। কথা-প্রসঙ্গে যখন সে শুনিল, আমি ব্রাহ্মণ, আর কৈলাস-যাত্রী, তখন তাহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা বহুগুণে বর্দ্ধিত হইল। কেহ তুষারশীতল জল আনিয়া দিয়া আমার তৃষ্ণা দূর করিল; কেহ বা তৈল মাখাইয়া সেবা করিতে লাগিল।

এক জন ব্রাহ্মণ-যুবক খাদ্য-দ্রব্য পাক করিয়া আমার রন্ধনক্লেশ দূর করিয়া দিল। ভোজনান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ৩টার সময় আবার চলিবার উদ্যোগ করা গেল। গমনের পূর্ব্বে দোকানীর দাম চুকাইয়া দিয়া ব্রাহ্মণ-যুবককে কিছু পারিশ্রমিকস্বরূপ দিতে গেলে সে বিনয়ের সহিত গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইল। ইহাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ধরছিনা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

আজ বিশেষ করিয়া চীর-বনের ভিতর দিয়া গমন করিতে হইয়াছিল। সরকার বাহাদুর চীর বৃক্ষ হইতে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরিপুষ্ট বৃক্ষের মূলদেশে ছিদ্র করিয়া দেওয়া হয়, ইহা হইতে নির্যাস বহির্গত হইয়া নিম্নস্থ পাত্রে পতিত হইয়া থাকে। অনন্তর ইহা সংগৃহীত হইয়া ভাওয়ালীতে নীত হয়। তথায় আধুনিক প্রথায় পরিস্রুত হইয়া তারপিন তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। এরূপ কথিত আছে যে, পরিপুষ্ট বৃক্ষ হইতে নির্যাস বাহির করিলে তাহার কাষ্ঠের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অপর পক্ষে অপুষ্ট বৃক্ষ হইতে বাহির করিলে তাহার বৃদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত হয়। পর্ব্বতবাসীদের গৃহ-নির্ম্মাণের ইহাই প্রধান উপাদান—সমতল প্রদেশেও ইহার টুকরা টুকরা কাষ্ঠ নদীর স্রোতে নীত হইয়া থাকে। চীর গাছ ৬।৭ হাজার ফিট উচ্চস্থানেও দেখিতে পাওয়া যায়। চীরের একটি বিশেষ শক্তি আছে। ইহা যে স্থানে বেশী পরিমাণে থাকে, সে স্থানে প্রায় অন্য গাছ জন্মে না। অনেক সময় পথিকরা ইহার কাঁচা ডাল জ্বালাইয়া মশালের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।. ইহাতে প্রচুর পরিমাণে তৈল থাকায় জ্বালিবার পক্ষে কোন বাধা হয় না। কুলীর মুখে অবগত হইলাম, চীরের বীজ অনেকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই চীর-বনের ভিতর দিয়া কখন পর্ব্বতের উপরিভাগে আরোহণ, কখন নিম্নে

অবরোহণ করিয়া নানাপ্রকার পক্ষীর কলরব শুনিতে শুনিতে সায়ং কালে প্রায় ৬টার সময় ধলছিনা নামক স্থানে উপস্থিত হওয়া গেল।

ধল্‌ছিনা আল্‌মোড়া হইতে সাড়ে ১৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। সমস্ত দিনে সাড়ে ১৩ মাইল আসা গিয়াছে। সমতল ভূমিতে ২৫ মাইল গমন করিতে যে ক্লেশ হয়,—যে সময় অতীত হয়, এই সাড়ে ১৩ মাইলে তাহা অপেক্ষা বেশী ক্লেশ হইয়াছে, অধিক সময় গিয়াছে। পর্ব্বতে উঠিবার ক্লেশ, পার্ব্বত্য বায়ু যদি দূর না করিত, তাহা হইলে ক্লেশের অবধি থাকিত না। অত্যন্ত ক্লেশের পর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে বোধ হয় যেন নূতন শরীর ফিরিয়া আসিয়াছে।

স্থানটি বেশ রমণীয়, সমুদ্র হইতে প্রায় ৬ হাজার ৫ শত ফিট উচ্চ, সুতরাং বেশ মৃদু মৃদু শীত অনুভব হইতে লাগিল। গ্রামের প্রবেশপথে অতি সুন্দর ঝরণার জল প্রবাহিত হইতেছে, শীতল জলে পিপাসা দূর ও হাত-মুখ প্রক্ষালন করিয়া রাত্রিবাসের জন্য আশ্রয়স্থান উদ্দেশে গ্রামমধ্যে প্রবেশ করা গেল।

একখানি দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া গেল। ইহার সম্মুখভাগ গোলাবগাছে মণ্ডিত ও পুষ্পে সুশোভিত। এক জন সাধু ধুনি জ্বালাইয়া অগ্নির সেবা করিতেছেন। কুলীরা আসিয়া বোঝা নামাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল, আর পাহাড়ী ভাষায় আমাদের বিষয় তাহারা যাহা অবগত হইয়াছে, তাহা কহিতে লাগিল। দোকানী মহাশয় পরিচিতের ন্যায় সম্ভ্রমের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি, বনবিভাগের ও এক জন পুলিস-বিভাগের কর্ম্মচারীর সহিত আলাপ করিতেছিলেন। আমাদের যাত্রার কথা শুনিয়া তাঁহারা আরও উৎসাহের সহিত আমাদের অসুবিধা দূর করিবার জন্য যত্ন

করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সে সময় কাফল ভোজনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, তাহা গ্রহণের জন্য আমরাও আমন্ত্রিত হইলাম। পর্ব্বত আরোহণে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলাম। তাঁহাদের এ আমন্ত্রণ সাদরে গৃহীত হইল। যখন আমরা অম্লমধুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল ফল গ্রহণ করিয়া রসনার তৃপ্তিসাধন করিতেছিলাম, তখন বাঙ্গালার সুপরিচিত বৌ কথা কও পাখী দূরে "বৌ কথা কও" "বৌ কথা কও" কহিয়া বাঙ্গালা ভাষার আবৃত্তি করিতেছিল। উপস্থিত জনগণের মধ্যে এক জন বলিলেন, "পণ্ডিতজী, শুনুন, ঐ পাখী বলিতেছে, 'কাফল পাকো', শীতের অবসান হইয়াছে, অতিথি অভ্যাগত আসিতেছেন। তাঁহাদিগকে সংবর্দ্ধনা করিতে হইবে; অতএব 'কাফল পাকো' 'কাফল পাকো' বলিয়া পক্ষী ঘোষণা করিতেছে।" অতিথিপ্রিয় হিমালয়বাসীর সুন্দর কল্পনা বটে! জয়দেব, চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিগণের মধুর রসে প্লাবিত বঙ্গদেশ—"দেহি পদপল্লবমুদারং", "সখি, তুমি যে আমার সরবস ধন, তুমি যে আমার প্রাণ" ইত্যাদি কবিতারসে ডুবু ডুবু বাঙ্গালী পাখীর কাছে শুনিল—"বৌ কথা কও" "বৌ কথা কও"। ইহা সে কালের বাঙ্গালীর কল্পনার অনুরূপ হইতে পারে। বীররসে অভিষিক্ত বর্ত্তমান বঙ্গালী "জড়তা ছাড়ো" "প্রস্তুত হও" এইরূপ কিছু কল্পনা করিবে। কল্পনা-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এখন বাস্তব রাজ্যে আসা যাউক। আমাদের বাঙ্গালায় সূর্য্যাস্তের পরই অন্ধকার আসিয়া থাকে, এ স্থলে সন্ধ্যা সাড়ে ৮ টার সময়ও আলোক বর্ত্তমান ছিল। নানাপ্রকার চিন্তায় ও কথায় সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল। সকল ভাবনার বড় ভাবনা ভোজনভাবনা উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, সম্মুখে প্রজ্বলিত অগ্নিতে কিছু আলু দগ্ধ করিয়া আর সঙ্গের কিছু মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া রাত্রিযাপন করিব। এই অভিপ্রায়ে

আলুর কথা দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। দোকানী ব্রাহ্মণ মহাশয় কহিলেন—'অনুগ্রহ করিয়া আমার কুটীরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে।' এরূপ বিনয় ও ভদ্রতার সহিত তিনি কথাগুলি বলিলেন যে, তাহার মধুরতা হৃদয় মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। এরূপ সুজনতা সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর একাধিক তরকারী, হালুয়াসহ সুন্দর সুস্বাদু রুটি ভোজন করা গেল। সুনিদ্রায় রজনী অতীত হইল। পুষ্পের সুমধুর গন্ধে এ স্থানের দেবভাব বৃদ্ধি করিয়াছিল।

অতি প্রত্যূষে, হৃদয়ে এ স্থানের দেবভাব গ্রহণ ও গৃহস্থের মঙ্গল-কামনা করিয়া আবার গন্তব্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যাইবার পূর্ব্বে গৃহ-স্বামীর একটু পরিচয় না দিয়া গমন করিলে আমার ত্রুটি থাকিয়া যায়, সে জন্য একটু পরিচয় দিয়া অগ্রসর হইব। দোকানী মহাশয় জাতিতে ব্রাহ্মণ ত বটেই, ইহার উপর পোষ্ট মাষ্টার, পুলিশ কর্ম্মচারী, আর গভর্ণমেণ্টের মুদী অর্থাৎ সরকার বাহাদুরের কর্ম্মচারীদের খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহ করিবার জন্য চাউল, ডাউল, আটা প্রভৃতি দোকানে রাখিতে হয়। এই সকল কার্য্যের জন্য ইনি মাসিক বেতনও কিছু কিছু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এতগুলি গোলামের পদে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইলেও, সরকার বাহাদুরের সহিত এতগুলি কর্ম্মসূত্রে বিজড়িত হইলেও তিনি প্রাচীন আদর্শ পরিত্যাগ করেন নাই—যেন বিনয়ের খনি।

গতকল্য সমস্ত দিন চীর-বনের ভিতর দিয়া আগমন করিতে হইয়াছিল। দুরারোহ চড়াইও অনেক চড়িতে হইয়াছিল। আজ চড়াই বড় বেশী ছিল না। উতরাই বেশী ছিল। এই উতরাইএর সঙ্গে বৃক্ষাদিরও বেশ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইল। আজ বেল, আমলকী, হরীতকী, চিরতা প্রভৃতি বনস্পতির মধ্যবর্ত্তী রাস্তা দিয়া

নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর প্রজাপতি দেখিতে দেখিতে ও নানাপ্রকার পক্ষীর কলরব শুনিতে শুনিতে নানাপ্রকার মধুর গন্ধে বিমুগ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। নগরের মধ্যে নানাপ্রকার জন-প্রবাহ ও দোকানপাট দেখিয়া পথিক যেরূপ পথের ক্লেশ অনুভব করে না, সেইরূপ আমরা বৃক্ষের স্নিগ্ধচ্ছায়া, ঝরণার মধুর কলকল শব্দ, বহুবিধ প্রস্তর ও খনিজ দ্রব্য দেখিতে দেখিতে সরযূর পবিত্র তটে উপস্থিত হইলাম।

সরযূ দেখিয়া কবি-হৃদয় নানাপ্রকার কল্পনায় উচ্ছলিত হইতে পারে; আমরা কিন্তু কল্পনা-রাজ্যে গমন না করিয়া বাস্তব রাজ্যের কথাই কহিব। বেলা প্রায় ১০টার সময় সরযূর তটে উপস্থিত হইলাম। নিম্নভূমিতে বেশ গরম বোধ হইতে লাগিল। অবস্থানের জন্য সরযূর তটে একটি শিবালয়ে আশ্রয় লওয়া গেল। আমাদের আগমনের সমসময়েই স্থানীয় মুদী ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি আগমন করিলেন। সহরবাসী আমরা মনে করি, অর্থের বিনিময়ে সর্ব্বত্র সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। সেই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মুদীকে বলিলাম, এক জন লোক দাও, কিছু পয়সা দিব, আমাদের সেবা-শুশ্রূষা করিবে। মুদী যে জবাব দিলেন, তাহাতে আনন্দিত ও লজ্জিত হইলাম। তিনি বলিলেন, "অর্থের বিনিময়ে এ স্থানে ভক্ত পাইবেন না। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনাদের সেবা করিব।" রন্ধনের আয়োজন করিতে কহিয়া সরযূতে অবগাহন-স্নান করিতে গমন করিলাম। জল অতি বেগে প্রবাহিত হইতেছে, জলের উপরিভাগে ও মধ্যে নানাপ্রকারের প্রস্তর, সাবধানে স্নান সমাপন করিলাম। আসিয়া দেখি, মুদী নরসিংহ দেবের লোক দুইটা চুলা প্রজ্বালিত করিয়া রাখিয়াছে। অনতিবিলম্বে রন্ধন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

নরসিংহ উত্তম দধি ও আম্রের চাটনি প্রস্তুত করিয়া উপস্থিত হইল। পরিতোষের সহিত ভোজন করাতে নরসিংহের আহ্লাদের সীমা রহিল না বোধ হইল।

ভোজনান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া প্রায় ৩টার সময় আবার গমন করিবার উদ্যোগ করা গেল। যাইবার পূর্ব্বে নরসিংহকে তাহার পয়সা চুকাইয়া লইবার জন্য আহ্বান করিলাম। সে আসিয়া প্রণামান্তে কোনরূপে পয়সা লইতে স্বীকৃত হইল না; অধিকন্তু অনুরোধ করিল, "আগের চটিতে আমার পুরোহিতের দোকান আছে। তাঁহার কাছে আমার নাম করিলে থাকিবার কোনরূপ অসুবিধা হইবে না।" নরসিংহের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। আরও একটু আগে গিয়া অল্প অল্প বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে গেনাই নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। গেনাই আল্‌মোড়া হইতে ৩০ মাইল। সুতরাং আজ প্রায় ১৬ মাইল হাঁটা হইয়াছে। এ স্থানে একখানিমাত্র দোকান, দোকানীর কাছে উপস্থিত হইয়া রাত্রিবাসের জন্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। মুদী মহাশয় কয়েকখানি ঘর দেখাইয়া দিয়া যে কোন গৃহ নির্ব্বাচন করিবার অধিকার প্রদান করিলেন। ঘরগুলি দুই তালার উপর, দেখিতে মন্দ নহে, কিন্তু উপরে ভাল হইলে হইবে কি? সকলগুলিই আবর্জ্জনাপূর্ণ হওয়াতে পিশু জন্মাইবার পক্ষে বড় উপযোগী হইয়াছে। আমার সঙ্গীটিকে পিশু ও ছারপোকাতে ক্ষত-বিক্ষত করায় সে অনিদ্রায় কয়েক রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছে। দৈব-ক্রমে আমি উভয়ের আক্রমণ হইতে এ পর্য্যন্ত রক্ষা পাইয়াছি। কৈলাস-যাত্রী আমাদের আগমনের সংবাদে গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত হইল। ইহাদিগের মধ্যে গ্রামের পাটওয়ারী মহাশয়ও আগমন করিলেন। থাকিবার অসুবিধা দেখিয়া তিনি একখানি নূতন

গৃহে থাকিবার বন্দোবস্ত করেন। এই গৃহে প্রথম প্রবেশ আমরাই করিলাম। এ জন্য গৃহস্বামী বিশেষরূপে আনন্দ-প্রকাশ করেন। পাটওয়ারী জাতিতে রজপুত। তাঁহার আতিথ্য-গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হইলাম। বলা বাহুল্য, তাঁহার প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল।

সন্ধ্যার পর গ্রামের কতকগুলি যুবক ও বৃদ্ধ আসিয়া ধর্ম্ম-কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। তাহাদিগকে আমি স্বাস্থ্য, কৃষি ও ধর্ম্ম-বিষয়ক কিছু কিছু উপদেশ প্রদান করি। শ্রোতাদের মধ্যে স্থানীয় ডাকবাংলার জমাদার প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি মুসলমান, কখন রোজা বা নেমাজ করি নাই। ইহার কি দরকার আছে?" তাহাকে সরল কথায় বুঝাইয়া বলিলাম, 'তুমি যদি ভোজন না কর, তাহা হইলে শরীর দুর্ব্বল, কৃশ বা নষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপ আমাদের এই শরীর ছাড়া আর একটা জিনিষ ইহার ভিতর আছে। তাহার খোরাক উপাসনা, উপাসনার দ্বারা তাহা পরিপুষ্ট হয়, তাহার গ্লানি দূর হয়, এবং মানসিক বল বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক মানুষের উপাসনা করা উচিত।" সে বড়ই প্রসন্ন হইল, আর ডাকবাংলায় থাকিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। ডাকবাংলা সুন্দর স্থানে অবস্থিত হইলেও কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলাম না। স্বাস্থ্য ও আত্ম নির্ভরতার উপর একটু বেশী করিয়া কহাতে এক জন বৃদ্ধ ধর্ম্ম-বিষয়ক কিছু কহিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। অন্য এক জন যুবক তাহার কথায় বাধা দিয়া কহে, "ইহাই ত ধর্ম্ম, ইহা প্রতিপালিত হইলে সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালিত হইবে।" কতকগুলি যুবক, বাঙ্গালার নব যুবকগণ কর্ত্তৃক নবযুগ আনয়নের উদ্যমের কথা আগ্রহের সহিত অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহাদের কথায় আমার বঙ্গমাতার অঞ্চলের নিধি যুবকগণের উপর তাহাদের যে পূজ্যবুদ্ধি আছে,

তাহা বেশ প্রকাশ পাইতে লাগিল। আর আমিও যুবকগণের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া নিজেকে ধন্য বোধ করিতে লাগিলাম।

গ্রামবাসীরা এ স্থানে ২।১ দিন থাকিতে অনুরোধ করে। দেড় ক্রোশ দূরে একটি সুন্দর হ্রদ আছে, তাহার চতুর্দ্দিকে বৃক্ষমণ্ডিত পর্ব্বত থাকায় ইহা বড়ই রমণীয় হইয়াছে। এই স্থানের প্রায় এক ক্রোশ দূরে কাতুর রাজাদের রাজধানী ছিল ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন জন্য আকাঙ্ক্ষা হইলেও কৈলাসের দিকে মনটা আকৃষ্ট হইল।

প্রত্যুষে ৫টার সময় গেনাই পরিত্যাগ করিয়া প্রায় ১২টার সময় ১২ মাইল হাঁটিয়া বেরীনাগে বা বেনাগে উপস্থিত হওয়া গেল। কাশ্মীরে বেরীনাগ নামে একটি সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্থান আছে, সৌন্দর্য্যে তাহার সহিত ইহার তুলনা না হইলেও স্থানটি মন্দ নহে। ইহা এ অঞ্চলের সহর। এ স্থানে স্কুল, ডাক-ঘর, চা-বাগান আছে। কয়েক জন ইংরাজও অবস্থান করিয়া থাকেন। এ স্থানে দোকানের সংখ্যাও অনেক। স্কুলের বারান্দায় থাকিবার স্থান নির্ব্বাচন করা গেল। ভোজনের পর বিশ্রামকালে দেখিলাম, দলে দলে যুবক কেহ মণিঅর্ডার, কেহ বা বাজারে ক্রয়বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। এ অঞ্চলের বহুলোক ইংরাজের সম্মান, সাম্রাজ্য সুরক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছে। তাহাদের প্রেরিত ৫।৭ শত টাকা প্রতিদিন পোষ্ট আফিসে আসিয়া থাকে। সকল সময় পোষ্ট আফিসে টাকা না থাকায় গ্রহীতাদিগকে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সময় সময় ২০।২৫ দিনও অপেক্ষা করিতে হয়। সরকার বাহাদুর টাকার পরিবর্ত্তে প্রচুর পরিমাণে নোট চালাইবার পক্ষপাতী, পাহাড়িরা টাকার পক্ষপাতী, এ জন্যও টাকা দিতে অনেক সময় বিলম্ব হইয়া থাকে।

বৃষ্টির জন্য যাত্রা করা হইল না। মনে করিলাম, ১ মাইল নীচে পুঙ্গেশ্বর নামক মহাদেবের এক প্রাচীন মন্দির আছে, একটু জল থামিলে দেখিতে যাইব। তাহাও হইল না। বারান্দায় বসিয়া যখন নানা বিষয় পর্য্যালোচনা করিতেছিলাম, তখন কতকগুলি যুবক আমার কাছে উপস্থিত হয়। এক জনের নাম জিজ্ঞাসা করিলে, সে কোনরূপ উত্তর প্রদান করিল না। তাহার এ ব্যবহারে বিস্মিত হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সে যখন অবগত হইল যে, আমি কৈলাস-যাত্রী, তখন সে লজ্জিত হইয়া প্রণাম করিয়া পরিচয় প্রদান করিল। মনে করিয়াছিল, আমি সৈন্য-সংগ্রহ করিতে আসিয়াছি! তাহারা গৃহে গমন করিবার উপক্রম করিতেছিল, এজন্য মিঠাই প্রভৃতি ক্রয় করিয়াছিল। তাহা হইতে কিছু কিছু আমাকে প্রদান করিতে লাগিল, আমি তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও তাহাদের আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। ঘটনা সামান্য হইতে পারে, কিন্তু প্রাচীন শিষ্টাচার ভুলিয়া যায় নাই দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। যে সমাজে মানুষের পরিবর্ত্তে দ্রব্যের দ্বারা সমৃদ্ধি পরিমিত হয়, সে সমাজ যে ধ্বংসোন্মুখ, তাহা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে কাঞ্চনকৌলীন্য প্রাধান্য লাভ করিলেও প্রাচীন আদর্শ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই; আশা হয়, আবার স্রোতের পরিবর্ত্তন হইবে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বৃষ্টি থামিয়া গেলে চা-বাগান দেখিতে গেলাম। চা-বাগানের মালিকরা (অবশ্য ভারতবাসী নহেন) তিব্বতে চা'র ব্যবসা যাহাতে হস্তগত করিতে পারেন, সে জন্য এক সময় বড় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তিব্বতীরা চীনের Brick teaর পক্ষপাতী। এ চা চীন হইতে লাসা হইয়া পশ্চিম-তিব্বতে প্রেরিত হইয়া থাকে। বেরীনাগের চা-ব্যবসায়ীরা চীনের ব্রিক টি প্রস্তুত করিবার প্রথা

আবিষ্কার করেন। শুনিতে পাই, রূপে আর গুণে ইহারা চীনের চা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। দামেও খুব সস্তা, প্রায় অর্দ্ধেক ছিল। তাহা হইলে হইবে কি? তিব্বতীরা ইংরাজী মাল পসন্দ করিল না, বেশী দামের চীনের চা তিব্বতীদের রসনা পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

চা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমি যে দেশে যাইতেছি, সে দেশবাসীর আনন্দের উৎস,—জীবনের সহচর চা। সেই জন্য মনে করি, ইহার সম্বন্ধে দুই এক কথা কহিলে নিতান্ত অন্যায় হইবে না। চা আমাদের খাস ভারতীয় সম্পত্তি। চীনবাসী ইহা ভারতবাসীর নিকট প্রাপ্ত হইয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। ডাঃ রয়েল নামক এক জন উদ্যোগী ব্যক্তি কামায়ুন পাহাড়ে ইহার আবাদ হইতে পারে, এই মর্ম্মে সেই সময়ের কর্ত্তৃপক্ষকে অবগত করান। ব্যবসায়ী ইংরাজ এ প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে চীন হইতে বীজ আনাইয়া আমাদের শিবপুরে বোটানিকাল গার্ডেনে বপন করা হয়। সেই গাছ আসাম ও কামায়ুনে পাঠান হয়। আসাম চা'র জন্মভূমি—এখনও আসামের বনে জঙ্গলে বন্য চা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। আসামী চা পৃথিবীর চা-ব্যবসায়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। কামায়ুনে চা-বাগিচা বড় সুবিধা করিতে পারে নাই। আলমোড়া জিলাতে প্রায় ২০টা চা'র বাগিচা আছে; ২ হাজার একরের উপর জমীতে ইহার চাষ হইয়া থাকে। এই সকল কথা শুনিয়া ও চা-বাগান দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

অতি প্রত্যূষে বেরীনাগ পরিত্যাগ করিয়া থলে উপস্থিত হইলাম। ইহা আল্‌মোড়া হইতে প্রায় ৫২ মাইল দূরে। আগমনকালে রাম-গঙ্গা

পার হওয়া গেল। ইহার তটে প্রাচীন বালেশ্বরের মন্দির। দূর হইতে ইহার আমলক দেখিয়া বোধ হইল, যেন দক্ষিণ দেশের মন্দির এ স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। মেরামত না হওয়াতে মন্দিরটি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এ প্রদেশে পুঙ্গেশ্বর, কোটেশ্বর, বাগেশ্বর, ভুবনেশ্বর নামে যে পাঁচটি প্রাচীন শিব-লিঙ্গ আছে, বালেশ্বর তাহার অন্যতম। মন্দিরটি চন্দরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এ স্থানে চৈত্র সংক্রান্তিতে ৮ দিন ধরিয়া একটি মেলা হইয়া থাকে, তাহাতে প্রায় ১৫।২০ হাজার লোক সমবেত হইয়া থাকে। থলের স্কুলে ভোজনাদি করিয়া বিশ্রাম করা গেল। স্কুল হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্যটি বেশ নয়নরঞ্জন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর আবার চলিতে আরম্ভ করা গেল। রাস্তায় এক হাথিয়া দেউল দেখিলাম। রাস্তার স্থানে স্থানে লোকালয়, স্থানে স্থানে নিবিড় অরণ্যও দেখা গেল। বনের ভিতর বৃক্ষসকল যে বিনা বাধায় নিরুদ্বেগে বর্দ্ধিত হইবে, তাহার যো নাই। সর্ব্বত্রই সকলে শত্রু পরিবেষ্টিত। মানুষ যেমন অন্য মানুষের অধীন হয়, ভারবাহী হয়, বৃক্ষের অবস্থা তাহা হইতে অন্যরূপ নহে। এক প্রকার লতা আছে, ইংরাজীতে ইহাকে হস্তিলতা কহে, ইহার স্বভাব—২।৩ বিঘা স্থান অধিকার করিয়া উন্নত পাদপকে কবন্ধের ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া পেষণ করিয়া থাকে। এ রোগের একমাত্র ঔষধ মূলোচ্ছেদন। মূলোচ্ছিন্ন হইলে উভয়েই রক্ষা পাইয়া থাকে, অন্যথা উভয়ে পিষ্ট হইয়া বিধ্বস্ত হয়।

আজ সমস্ত দিনে প্রায় ১৯ মাইল পথ অতিক্রম করা হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় ভিজিতে ভিজিতে দিদি-হাটের ডাক-বাংলার বারান্দায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ডাক-বাংলা উচ্চ-প্রদেশে নির্ম্মিত হওয়াতে বনভূমির এবং হিমালয়ের তুষার-দৃশ্য অতি সুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া

যায়। ডাক-বাংলার রজপুত জমাদার কিছু মিছরি দিয়া প্রথম সৎকার করিয়া নূতন আলু ক্ষেত হইতে আনিয়া আর আটা দিয়া অতিথিসৎকার করেন। তিনি দূর-গ্রামে অবস্থান করেন। সুতরাং আবাহনের সহিত বিসর্জ্জনের মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। সকালবেলায় দেখা হইবে না বলিয়া কতই কাতরতা প্রকাশ করিলেন।

এ স্থানে এক অদ্ভুত বিষয় প্রত্যক্ষ করি। তাহার কারণ এখনও নির্ণয় করিতে সমর্থ হই নাই। ভোজনাদি করিয়া শয়নের পর, অকস্মাৎ আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। চোখ খুলিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা কখনও ভুলিবার নহে। দেখিলাম, অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ পার্ব্বত্য প্রদেশকে আলোকিত করিয়া জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছে। বহুসংখ্যক মশাল জ্বালাইয়া আসিলে, কিঞ্চিন্মাত্র আলোকিত হইতে পারে। তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? শরীর ক্লান্ত হইয়াছিল, আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি তখন প্রায় ১২টা, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। সলোম্যান সেপ্টার বা সলোম্যানের দণ্ড, সে জ্যোতিঃ হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহার কারণ কি?

প্রাতঃকালে দিদি-হাটের ডাক-বাংলা পরিত্যাগ করিলাম। মনে করিয়াছিলাম, এক দিন এ স্থানে অবস্থান করিয়া এ স্থানের সৌন্দর্য্য উপভোগ করি। বৃষ্টির সমাগমে ক্ষেত্রের কার্য্য করিবার জন্য কুলীরা উদ্বিগ্ন হওয়াতে থাকিতে কোনরূপে রাজী হইল না। সুতরাং আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। বেলা প্রায় ১০টার সময় বহুদিনের ঈপ্সিত আসকোটে উপস্থিত হইলাম।

চতুর্থ অধ্যায়

আসকোট।

আলমোড়া হইতে আসকোটের এক জন ভদ্রলোক, আমি এ প্রদেশ দিয়া কৈলাস যাইতেছি, তাহার সূচনা-পত্র অগ্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে আমি সাদরে অভ্যর্থিত হই। ডাকঘরে আমি প্রথম আশ্রয় গ্রহণ করি। পোষ্ট আফিসের যুবক কর্ম্মচারীটি যেন বহুদিনের পরিচিতের ন্যায় যত্ন করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। বস্ত্রপরিবর্ত্তনের পর আমি স্নানাদির উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণ পোষ্ট মাষ্টার, পথশ্রান্ত আমার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য রন্ধনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। প্রথম সুযোগে রাজ-ওয়াড়া সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের কাছে আমার পরিচয়পত্র প্রেরণ করিলাম। অনতিবিলম্বে তাঁহার লোক আসিয়া সাদরে আমন্ত্রণ করিলেন।

কুলীরা দেশে প্রতিগমনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ, বৃষ্টি সুরু হইয়াছে, কৃষি-কার্য্যের "জো" চলিয়া যাইবে। আমি আর বাধা দিলাম না। তাহাদিগকে ৪৵০ হিসাবে তাহাদের প্রাপ্য টাকা চুকাইয়া দিলাম। ইহা ব্যতীত তাহাদিগকে কিছু খোরাকী ও বক্‌সীস্‌ও দিয়াছিলাম।

কুলীরা জাতিতে রাজপুত। রাস্তায় নানা প্রকারে আমার সেবা করিয়াছিল, আর বিশ্বস্ততার সহিত সমস্ত দ্রব্য আনিয়াছিল। তাহারা কোনরূপ অভদ্রতাও দেখায় নাই। আমাকে প্রণাম করিয়া

হাসিমুখে পথের সহচর কুলীরা গৃহের দিকে রওনা হইয়া গেল। একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। রাস্তায় শুনিয়াছিলাম, আসকোটে খুব কলেরা হইতেছে। যখন গ্রামে প্রবেশ করি, শরীরটা যেন শিহরিয়া উঠিয়াছিল। ত্রাসপূর্ণ লোকদের মুখভাব দেখিয়া ভীত হইয়াছিলাম। দুর্লক্ষণ সকল যেন চক্ষুর উপর ভাসিতে লাগিল।

টনকপুর হইতে একটি রাস্তা হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতাভিমুখে গমন করিয়াছে। যে রাস্তা দিয়া আমি আলমোড়া হইতে আগমন করিয়াছি, তাহা আসকোটের নিকট এই রাস্তায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে। টনকপুর হিমালয়ের পাদদেশে। ভুটিয়ারা এই স্থানে আসিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া থাকে। দিন দিন এ স্থানের বেশ উন্নতি হইতেছে, শীতকালে ইহা বেশ গুলজার থাকে। গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে ভুটিয়ারা এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে থাকে। সে সময় টনকপুর পরিত্যক্ত জনপদ—বিগতশ্রী। জুন মাসের আগেই ভুটিয়া আর হুনিয়া (তিব্বতীরা হুনিয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে) এ স্থান পরিত্যাগ করে। এই সকল ব্যবসায়ীর পণ্য-বোঝাই ছাগ ও মেষে সে সময় এ রাস্তা পূর্ণ থাকে, আর ইহাদের গলার ঘণ্টারবে দিক্ সকল মুখর হইয়া উঠে। দূর হইতে এই ঘণ্টারব বেশ মধুর শুনায়।

ভোজনান্তে একটু বিশ্রামের পর কুমার সাহেবের লোক আমাকে লইয়া তাঁহার কাছারীর ঘরের একটি কক্ষ আমার অবস্থানের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এ স্থানের সম্মুখের দৃশ্য হৃদয়গ্রাহী; স্থানে স্থানে কিছু কিছু সমতলভূমি থাকায় এই শস্যশ্যামলা ভূমি দর্শকদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। সম্মুখে নিম্নভাগ, পার্ব্বত্য-প্রদেশ ভেদ



ভুটিয়া রমণী।

করিয়া কালী বা সারদা নদী গর্জ্জন করিতে করিতে নিম্নাভিমুখে গমন করিতেছে। নদীর অপর পারে হিন্দুর স্বাধীনরাজ্য নেপাল। দূর-পর্ব্বতের মস্তকে উন্নতকাণ্ড দেবদারু বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যেন শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য অটল অচলের ন্যায় দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছে। নেপালরাজ্যে ভাল রাস্তা-ঘাট না থাকায়, দুর্গম পর্ব্বতমালা যেন অধিকতর ভীষণ রূপ ধারণ করিয়া, পথিক-হৃদয়ে অবসাদ আনয়ন করিতেছে।

কুমার নগেন্দ্রনাথ পাল, কুমার জগৎসিংহ পাল প্রভৃতি রাজকুমার-গণ আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থানে আসিয়া নানাপ্রকার আলাপ করিয়া এ দেশের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক গল্প করেন। কুমার জগৎসিংজী এক সময় ইংরাজ সরকারের পোলিটিকেল পেস্কার ছিলেন। তিনি রাজকার্য্য উপলক্ষে অনেকবার তিব্বতে গমন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার কাছে তিব্বত সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হইলাম।

এক দিন রাজওয়াড়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করি। তিনি রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। একে ব্রাহ্মণ, তাহার উপর কৈলাস-যাত্রী, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে যথেষ্ট সম্মান পাইলাম। তাঁহার আন্তরিক ভক্তি দেখিয়া আমি মনে মনে লজ্জিত ও প্রীত হইলাম। তিনি একবার কৈলাস-মানস-সরোবর গমন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সেই যাত্রা সম্বন্ধে নানা কথা কহিয়া মানসের অপূর্ব্ব দৃশ্যের কথা ঔৎসুক্য সহকারে কহিতে লাগিলেন। তিব্বতের দস্যুর কথা কহিয়া তিনি তথায় শরীররক্ষা-বিষয়ক সাবধানতা অবলম্বন জন্য দৃষ্টি রাখিতে কহিলেন।

রাজওয়াড়া সাহেবের কাছে যাইবার সময়, দরজার কাছে বাঘ মারিবার একটি যন্ত্র দেখিলাম। ইহা ইন্দুর মারিবার জাঁতি-কলের



কালী নদী।

বিরাট সংস্করণ। ফাঁতি বিস্তার করিয়া তাহার মধ্যে ছাগাদি পশু বাঁধিয়া রাখা হয়। লুব্ধ ব্যাঘ্র খাদ্যের উপর পতিত হইলে, যন্ত্রগত হইয়া আবদ্ধ হইয়া পড়ে। সময় সময় এ প্রদেশে খুব বাঘের উৎপাত হইয়া থাকে। কখন কখন কালী-তট দিয়া তরাই হইতে ব্যাঘ্র আসিয়াও উৎপাত করিয়া থাকে।

রাজওয়াড়া সাহেবের পূর্ব্বপুরুষরা এক সময়ে এ দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। সে সময় তাঁহারা অনেক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও অনেক ভূমি দেবতা ও ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহার নিদর্শন নূতন নূতন আবিষ্কৃত তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায়। ইঁহারা পাল উপাধিতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। এই পালবংশের সহিত আমাদের বাঙ্গালার পালরাজগণের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানি না। হিমালয়-প্রদেশে মণ্ডি, সুকেতের বর্ত্তমান সেনরাজবংশ, আমাদের বাঙ্গালার সেনরাজবংশের সন্ততি, এ কথা তাঁহারা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যদি তাহা হইতে পারে, তাহা হইলে কামায়ুনের পালরাজবংশের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, অনেক ঐতিহাসিক রহস্য প্রকাশ পাইতে পারে। আপনাদের ভাগ্যপরীক্ষার জন্য কোথায় কিরূপভাবে সিংহপ্রকৃতির পুরুষগণ উদ্যম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যখন আলোচিত হইবে, তখন অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা অবগত হইয়া আমরা বিস্ময়ান্বিত হইব।

আসকোটে অবস্থানকালে প্রাচীন পুঁথির বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, বিশেষ কিছু পাই নাই। কুমার সাহেব মানস-খণ্ডের পুঁথি আমাকে পড়িতে দিয়াছিলেন। ইহা পাঠ করিয়া তিব্বতে আমাদের হিন্দুর প্রভাব কিরূপ ছিল, তাহা বেশ অবগত হইলাম। তিব্বতে বর্ত্তমান যে সকল তীর্থস্থল, মঠ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়,

এক সময় সে সকল আমাদের হিন্দুদের ছিল। আমাদের গমনাগমনের বিরলতার সহিত সে সকল স্থান বৌদ্ধরা অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ইহা স্বাভাবিক। এ সকল কথা উপযুক্ত স্থানে আলোচিত হইবে। মানস-খণ্ডে হিমালয়ের উত্তর ও দক্ষিণের অনেক স্থানের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

আসকোটের জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ। সমতলভূমিতে লেবু, আম্র প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে; আপেল, ন্যাসপাতিও চেষ্টা করিলে যথেষ্ট পরিমাণে হইতে পারে। রাজওয়াড়া সাহেবের বাগানে কতকগুলি গাছও দেখিলাম। সাধারণে এ বিষয়ে সাহায্য পাইলে প্রচুর ফললাভ করিতে পারেন। দেশের সর্ব্বত্র জড়তায় আচ্ছন্ন, এ প্রদেশও তাহা হইতে মুক্ত নহে।

নগাধিরাজ হিমালয় নানা প্রকার খনিজপদার্থে পরিপূর্ণ আছেন। এ অঞ্চলে স্থানে স্থানে সুবর্ণের খনি আছে। খনি থাকিলে হইবে কি? চক্ষু থাকিতেও আমরা অন্ধ, হাত-পা থাকিতেও আমরা হস্ত-পদহীন। আবার সরকারের আইন-কানুনরূপ নাগপাশ হাত-পা আরও দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আমার ভূমির খনিজদ্রব্যে আমার অধিকার নাই। আসকোট দুই ভাগে বিভক্ত। গৌরী ও কালী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ মাল্ল আসকোট। মাল্ল আসকোট গৌরীর দক্ষিণ কালীর মধ্যবর্ত্তী উর্ব্বরভূমি। এ স্থানে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়; বাহিরেও কিছু কিছু রপ্তানী হইয়া থাকে।

এ অঞ্চলে কলেরা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলাম। যে পাচক আমার রন্ধনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল, প্রাতঃকালে উঠিয়া শুনিলাম, সে কয়েকবার ভেদবমির ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আমার অভিপ্রায় কুমার

সাহেবকে জ্ঞাপন করিলাম, তাঁহার ইচ্ছা ছিল, দিনকয়েক এ স্থানে অবস্থান করিয়া গমন করি। কিন্তু যেমন সময় পড়িয়াছে, তাহাতে তিনি অগত্যা আমার মতে মত দিলেন। কোনরূপে আর এক রাত্রি এ স্থানে অবস্থান করিতে হইবে। অতি প্রত্যূষে এ স্থান পরিত্যাগ করিব, এইরূপ স্থির হইল। কুলীরাও ঠিক সময় আসিয়া বোঝা লইয়া যাইবে, বন্দোবস্ত হইল। রাজওয়াড়া সাহেব তাঁহার প্রজাদের উপর আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহাতে তাহারা সচেষ্ট হয়, এরূপ অনুজ্ঞা-পত্র দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। এক নবীন বন্ধু তিব্বতে দস্যুভয়ের কথার উল্লেখ করিয়া আমাকে কোন অস্ত্র দিবার প্রস্তাব করেন। আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দিয়া বলি, আমি তীর্থযাত্রী, সশস্ত্র হইয়া যাইতে ইচ্ছা করি না। তদ্ভিন্ন আমি প্রত্যাগমনকালে এ রাস্তা দিয়া আসিব না; নেতিপাস দিয়া বদরীনাথ অঞ্চল দিয়া গমন করিব। সুতরাং অস্ত্র ফিরাইয়া দিবার পক্ষে অসুবিধা হইবে। তিনি ডাকে পাঠাইবার কথা কহিলেও আমি তাহাতে রাজি হইলাম না। কুমার সাহেব তাঁহার এক ভুটিয়া প্রজার উপর একখানি পত্র দিয়াছিলেন, কালে তাহা বড় উপযোগী হইয়াছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

১৩ই জুন বৃহস্পতিবারের রাত্রি প্রভাত হইল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। মোট বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছি। কুলীর দেখা নাই, উদ্বেগে সময় কাটাইতে লাগিলাম। বহু বিলম্বে রাজবাড়ীর পাইক কুলী ধরিয়া আনিল। আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া ভগবানের নাম লইয়া অগ্রসর হইলাম।

আসকোট পরিত্যাগের পর অল্প চড়াই চড়িতে হইয়াছিল। তাহার পর প্রায় দুই মাইল উতরাই। দ্রুতবেগে উতরাই অবতরণ করিয়া গৌরীনদীর তটে উপস্থিত হইলাম। গৌরী হিমালয়ের তুষারগলিত শীতল-সলিল বহন করিয়া কালীর সহিত মিলিতা হইয়াছেন। জলাধিরাজ অনন্তকাল হইতে নগাধিরাজ হিমালয়কে পরিসিক্ত করিতেছেন। হিমালয়ও সেই বারির কণামাত্রও না রাখিয়া, অধিকন্তু নিজের শরীরের পরমাণু মিলিত করিয়া সমুদ্রাভি-মুখে সেই জল প্রেরণ করিতেছেন। এই অদ্ভুত আদান-প্রদান অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।

সুন্দর পুল দিয়া গৌরী পার হইলাম। গৌরীর তট দিয়া কিছু দূর যাইতে না যাইতে কুলী কহিল, "আমি আর অগ্রসর হইব না। সম্মুখে গ্রামের প্রধানের বাড়ী; উনি লোক সংগ্রহ করিয়া দিবেন।" এই বলিয়া সে প্রধানের বাড়ী বোঝা রাখিয়া চলিয়া গেল। আমার অর্থ ও ভয় দেখান সবই বৃথা হইয়া গেল। প্রধানকে ডাকাডাকি করিয়া আমার অবস্থার কথা কহিলাম। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়া অগ্রসর হইতে কহিলেন; আর কহিলেন, বোঝা যথাসময়

আমার অদ্যকার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবে। বৃষ্টির জন্য কৃষকরা ক্ষেতের কার্য্যে নিযুক্ত, সুতরাং লোক সংগ্রহে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল।

সেকালে গ্রামে কোন অতিথি-অভ্যাগত উপস্থিত হইলে, তাঁহার বোঝা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইত। এইরূপ পর পর গ্রামবাসী কর্ত্তৃক সেই বোঝা পথিকের অভীষ্ট স্থানে নীত হইত। ইহার মূলে কেমন শিষ্টাচার! কালে ইহা বিকৃত হইয়া "বেগারে" পরিণত হইয়াছে! যে পুরুষের সহিত কোনরূপ সরকারী সম্বন্ধ জড়িত আছে, সেই সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহার গ্রামবাসী হউন, অথবা সুদূরসম্বন্ধী হউন, তাহাতে কিছু আসে যায় না, তিনি একটি অবতার-বিশেষ, তাঁহার ভয়ে কুলীকুল বিভীষিকাগ্রস্ত হয়। ইহা অনেক স্থানে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

আমাদের বাঙ্গালাদেশে এই সুন্দর প্রথার এক সময় বেশ প্রচলন ছিল। বিষ্ণুপুররাজ্যে যে কেহ উপস্থিত হইতেন, তিনি সেই মুহূর্ত্তে রাজ-অতিথি! গ্রামের মণ্ডল মহাশয় ভোজনাদি দিয়া পরিচর্য্যা করিতেন। আর বোঝা থাকিলে লোক দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে পাঠাইয়া দিতেন। এ কথা আমার নহে, কলিকাতা কুঠীতে হলওয়েল নামে এক জন কুঠীয়াল ছিলেন, তিনি তাঁহার "বাঙ্গালার কথা" নামক গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

যখন আমাদের "স্বরাজ" ছিল, তখনকার প্রথার একটু কণামাত্র উদাহরণস্বরূপ প্রদত্ত হইল। আমাদের বিদেশী শিক্ষা দীক্ষায় প্রাচীন প্রথা সকল এখন পীড়ার কারণস্বরূপ হইয়াছে।

কুলীর ভাবনা পরের উপর ন্যস্ত করিয়া আনন্দের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। গৌরীর সহিত কালীর সঙ্গমস্থলকে দক্ষিণে রাখিয়া এক্ষণে কালীর নিকট দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

এ প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য অনির্ব্বচনীয়। বৃক্ষের উপর নানা জাতীয় পরগাছায় (orchid) নানা রঙ্গের পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়াতে চক্ষু পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল। অতীত পথে স্থানে স্থানে জোঁক আর পিশু ছাড়া অন্য কোন প্রকার হিংস্র জন্তুর হাতে পড়ি নাই। একমাত্র "বিচ্ছু" গাছ ছাড়া অন্য কোন প্রকার কুটিল-প্রকৃতির বনস্পতির সংস্পর্শেও আসি নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকায় বক্রাকারের এক প্রকার গাছের ফল আছে, তাহা এরূপ ভীষণ ও কুটিল যে, তাহার সংস্পর্শে আসিলে হরিণাদি কেন, সিংহাদিকেও প্রাণ হারাইতে হয়। এক সময় একটি হরিণের পায়ে ইহা ফুটিয়া যায়, যন্ত্রণায় হরিণ অবশ হইয়া পড়িয়া থাকে। একটা সিংহ মৃতপ্রায় হরিণকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করে। ভক্ষণকালে সিংহের মুখের ভিতর সেই ফলের কাঁটা লাগিয়া যায়। ইহার ফলে জ্বালা-যন্ত্রণা প্রদাহ হইয়া সিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাকে ইংরাজীতে Grapple Fruit of South Africa কহে, আর বৈজ্ঞানিক নাম Harpagophytun। কলম্বিয়ায় এক প্রকার গাছ আছে, তাহা হইতে ভয়ানক বিষ নির্গত হয়। আমাদের দেশের আলকুশী (সংস্কৃত নাম কপিকচ্ছু) এত উগ্র-প্রকৃতির নহে। আমার কুলী কহিল, সেকালে অর্দ্ধপক্ক আলকুশী ফলের সোঁ সংগ্রহ করিয়া বায়ুর গতি লক্ষ্য করিয়া শত্রুর দিকে পিচকারীর সাহায্যে চালিত করা হইত। এই ক্ষুদ্র সোঁ শত্রুকুলকে আকুলিত করিয়া তুলিত।

শব্দ যেরূপ তরঙ্গের ন্যায় আগমন করিয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, গন্ধও সেইরূপভাবে আগমন করিয়া নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করে। আমি পুষ্পের গীত বা শব্দতরঙ্গ অনুভব করিতে করিতে পরম আনন্দে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

সকল সুখেই একটু না একটু অসুখ আছে, আবার সকল অসুখের মধ্য হইতেও সময় সময় সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই নয়নরঞ্জন দৃশ্যের মধ্যেও উদ্বেগকর বিষয় উপস্থিত হইল। বৃক্ষাদির গলিতপত্র প্রথম বৃষ্টিতে পচিয়া অতি ক্ষুদ্রতম কীট উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার এদেশী নাম আমি জানি না, ইংরাজীতে ইহাকে Sand-flies বলে। নামটা ঠিক দেওয়া হইয়াছে। পথিক যখন চলিতে থাকেন, সে সময় এই সকল কীট অগণিত সংখ্যায় তাঁহার অগ্রে ও পশ্চাতে গমন করিতে থাকে। শরীরের নিম্নভাগে অধিক পরিমাণে অনুসরণ করিয়া থাকে বলিয়াই রক্ষা; অন্যথা অত্যন্ত উত্যক্তকর হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। সময় সময় ইহা এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, কৃষকরা ভূমি-কর্ষণকালে খড়ের মশাল জ্বালিয়া ইহাদের অনুসরণ হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিয়া থাকে।

আসকোট হইতে যে রাস্তা গারবাং অভিমুখে গমন করিয়াছে, সেই রাস্তার উপর অনেকটা উচ্চ সমতলক্ষেত্রে বালবাকোট অবস্থিত। ১০।১৫ খানি গৃহসমষ্টিতে এই গ্রাম গঠিত হইয়াছে। যিনি গ্রামের প্রধান, তিনি গ্রামের পাটওয়ারী—জাতিতে রাজপুত, রাজওয়াড় সাহেবের স্বজাতি ও তাঁহার এক জন প্রধান প্রজা। রাজওয়াড় সাহেবের পত্রের প্রভাবে, প্রধান মহাশয় যত্নের সহিত আমাকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নূতন নির্ম্মিত গৃহে আমার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এ অঞ্চলে সকল গ্রামে দোকান নাই, সুতরাং পূর্ব্বেই কিছু খাদ্য সংগ্রহ করা পথিকের উচিত। আমি রাজওয়াড় সাহেবের লোক বলিয়া আমাকে আহার্য্যসংগ্রহে ক্লেশ পাইতে হইল না। প্রধান মহাশয় চাউল প্রভৃতি পাঠাইয়া দেন। এক জন অন্ধ্রদেশীয় সাধুর সহিত আসকোটে দেখা হয়। তিনিও কৈলাস-যাত্রী। পাকের

সময় উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার সহিত ভোজন করা গেল। বাল-বাকোটে প্রায় ১২ টার সময় আসিয়াছিলাম, তখনও আমার বোঝা আইসে নাই। যত সময় অতীত হইতে লাগিল, ততই উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলাম। যথাসর্ব্বস্ব সেই বোঝার ভিতর ছিল, যদি হারাইয়া যায় বা চুরী যায়, তাহা হইলে অসুবিধার সীমা থাকিবে না। এ কথা বার বার প্রধানকে কহিতে লাগিলাম। "কিছু নষ্ট হইবে না" বলিয়া প্রধান চিন্তা করিতে বারণ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমার মোট আনিত হইল। শুনিলাম, রাস্তায় ৩ বার কুলী বদল হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে কোন দ্রব্য হারাইয়া যায় নাই। মনে মনে কুলীদের যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম; আর তাহাদের প্রাপ্য পয়সা দিয়া বিদায় দিলাম।

যে স্থানে আমি ছিলাম, সে স্থান হইতে নিম্নে গ্রামের শস্য-শ্যামল দৃশ্য প্রীতিপ্রদ। মনে করিতে লাগিলাম, এইরূপ সুন্দর সুন্দর স্থানে উপনিবেশ স্থাপন অথবা উপনিবেশের পরিবর্ত্তে বহুসংখ্যক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন করিয়া যদি ছাত্রদের স্থায়ী স্বাস্থ্য ও চরিত্রের ভিত্তি স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে রুগ্ন, শীর্ণ জীবন-সংগ্রামে পরাজিত যুবকের পরিবর্ত্তে দৃঢ়কায়, কর্ম্মঠ, শ্রম-সহিষ্ণু এবং সকল প্রকার কার্য্যে উৎসাহী যুবকের সংখ্যা দেশে বৃদ্ধি পাইবে।

এ দেশের রজপুতদিগের ভিতর জননীর হাতে রাঁধা ভাত খাওয়াও সামাজিক নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য। এ প্রথা কত দিন হইতে এ প্রদেশে প্রচলিত, তাহা আমরা অবগত নহি। সম্ভবতঃ কোন রজপুত নিজের বংশের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত হীনবংশের স্ত্রীর হাতের পাক করা অন্নভক্ষণ দূষণীয় বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহার পর কালক্রমে এই প্রথা রজপুতদের

মধ্যে আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকিবে। আমি যাঁহার অতিথি হইয়াছিলাম, তাঁহার এক পুত্র মিডিল ক্লাস পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছেন, তিনি এ প্রদেশের মধ্যে সুশিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে, তিনিও তাঁহার জননীর হস্তে সিদ্ধান্ন গ্রহণ করেন না। অনেক সময় তাঁহাকে রন্ধনশালার কার্য্যে সময় যাপন করিতে হয়, এ কথা তিনি দুঃখের সহিত নিবেদন করিলেন। এ সকল সংস্কার শিক্ষার বিস্তার না হইলে দূর হওয়া সম্ভবপর নহে। শিক্ষিত না হইলে মুক্তিলাভ আর সুশৃঙ্খলিত না হইলে কখন শক্তিশালী হইতে পারে না। ভারতে এই দুইটি প্রধান বিষয়েরই অভাব। সেকালে এই দুইটি প্রধান কার্য্যভার ব্রাহ্মণদের উপর ন্যস্ত ছিল। যে ব্রাহ্মণ ইহা হইতে বিমুখ হইতেন, তিনি নিন্দিত হইতেন। জাতি যখন জীবিত থাকে, তখন সে জাতিতে পর্য্যটকের সম্মান যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন আরবরা ভ্রমণকারীকে "বিজেতা" বলিয়া পূজা করিতেন, তখন তাঁহাদের অভ্যুদয়ের সময় ছিল।

সায়ংকালে কতিপয় গ্রামবাসী আমার কাছে উপস্থিত হয়। তাহারা বেশ ভদ্র, বিনয়ী ও অতিথিপ্রিয়। এ প্রদেশ নানা প্রকার সুমধুর ফল, দ্রাক্ষা, ন্যাসপাতি প্রভৃতি বৃক্ষের পক্ষে বেশ উপযোগী বলিয়া বোধ হইল, আর আমাদের পেঁপে প্রভৃতিও হইতে পারে। এ সকল গাছের বীজ ও কলম রোপণের জন্য তাহাদিগকে কহিলাম। তাহারা ক্রীড়া-কৌতুক কি করিয়া থাকে, সে বিষয় অনুসন্ধান করিলাম। যুবকদল আগ্রহের সহিত কহিল, "মহাশয়! ঐ যে সম্মুখে উন্নতশৃঙ্গ বনস্পতি-মণ্ডিত পর্ব্বত দেখিতে পাইতেছেন, উহার উপর গিয়া আমরা ভল্লুক শীকার করিয়া থাকি।

ইহা অনেক সময় বিপদ্‌পূর্ণ হইলেও ইহাতে আমরা বড় আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি। ভল্লুকের পিত্ত উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া বেশ দুই পয়সা পাওয়াও যায়। ইহার লোমপূর্ণ চর্ম্মও আমরা নিজেরা ব্যবহার ও বিক্রয় করিয়া থাকি।" এইরূপ নানা প্রকার কথোপকথনের পর বিদায় দিবার পূর্ব্বে আমার কুলীর বন্দোবস্তও করিয়া লইলাম।

প্রায় সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িয়াছিল। প্রাতঃকালেও তাহার নিবৃত্তি হয় নাই। সেই জন্য আমার যাত্রা করিবার পক্ষে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। বৃষ্টি বন্ধ হইবার পর আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। উন্নতভূমি হইতে নিম্নে নামিবার জন্য যে রাস্তা অবলম্বন করিলাম, তাহা বৃষ্টি আর গো-মহিষাদির গমনাগমন জন্য বেশ পিচ্ছিল হইয়াছিল। সেই রাস্তা অতিক্রমণকালে একাধিকবার পড়িতে পড়িতে রক্ষা পাইয়াছিলাম। তাহা কোনরূপে অতিক্রম করিয়া ঝরণার ধারা উত্তীর্ণ হইলাম। আবার কালীনদীর তট ধরিয়া যে রাস্তা উত্তরাভিমুখে গমন করিয়াছে, তাহার উপর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম।

বালবাকোট হইতে ধারচুলা প্রায় ১০ মাইল উত্তরে। যে সময় আমি এ প্রদেশ অতিক্রম করি, সে সময় রাস্তার ধারে মানববিহীন বহুসংখ্যক গৃহ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলাম। রাস্তার ধারে ধারে কলেরা-প্রপীড়িত হুনিয়াদের (তিব্বতী) তাম্বু দেখিয়াছিলাম। মনে করিলাম, মহামারীর প্রকোপে কি এ প্রদেশ জনশূন্য হইয়াছে? গৃহপালিত গবাদি পশুও এ স্থানে দেখিতে পাইলাম না। কোন কোন স্থানে কৃষ্ণমুখ হনুমান্ দল বাঁধিয়া যদৃচ্ছা বিচরণ করিতেছে। দীর্ঘ দণ্ড ও ছত্রধারী আমার মত পথিক দেখিয়া হনুমান্‌কুল চকিত

হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। রাস্তায় কালিকা নামে একটি স্থান প্রাপ্ত হইলাম। একটি বহু শাখান্বিত বটবৃক্ষের তলে কালিকা-দেবীর স্থান। তথায় কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিয়া অগ্রসর হইলাম। অদ্যকার রাস্তা অধিকাংশ সমতলভূমি অতিক্রম করিয়াছি; সুতরাং পর্ব্বতারোহণজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৭টার সময় বালবাকোট পরিত্যাগ করিয়া প্রায় ১২টার সময় ধারচুলা নামক স্থানে উপস্থিত হই। আসিবার সময় রাস্তার ধারে যে সকল সুন্দর সুন্দর গৃহ দেখিয়া আসিয়াছি, শীতের সমাগমের সহিত তাহা জনপরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এই সকল জনপদবাসী দৃঢ়কায়, কর্ম্মঠ, উদ্যোগী ও বাণিজ্যপ্রিয়। বাণিজ্যের জন্য ইহারা শীতকালে দলে দলে টনকপুর প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকে। কেহ কেহ কানপুর, কলিকাতা, দিল্লী, এমন কি, বোম্বাইয়েও গমন করিয়া থাকে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভের সহিত ইহারা গারবাং, কুটি প্রভৃতি স্থানে গমন করে। কতক কৃষি-কার্য্য করে, আর কতক বাণিজ্যব্যপদেশে তিব্বতে তাকলাকোট, গরতক, দরচীন প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া ভারতীয় দ্রব্যসম্ভার বিক্রয় ও মেষের লোম প্রভৃতি ক্রয় করিয়া থাকে। এ দেশ ভোট আর এ দেশবাসী ভোটিয়া নামে কথিত হইয়া থাকে। ইহারা হিন্দু, কিন্তু তিব্বতীদের সঙ্গের প্রভাবে তিব্বতী ভাবাপন্ন হইয়াছে। নিজেদের ভাষা ব্যতীত তিব্বতী, হিন্দী ও এ দেশের পার্ব্বতীয় ভাষা প্রায় ইহারা সকলেই

জানে। তিব্বত অঞ্চলের ভৌগোলিক জ্ঞানবিস্তারের জন্য ইঁহারা যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, যেরূপ অভূতপূর্ব্ব আত্মত্যাগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উদাহরণ সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। সর্ভে জেনারল আফিসের পণ্ডিত "A. K." রায় বাহাদুর পণ্ডিত কৃষণ সিং, আর পণ্ডিত "A" নান সিং, C. I. E. যদি পৃথিবীর অপর কোন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নাম প্রবাদবাক্যরূপে প্রত্যেক গৃহে উচ্চারিত হইত। শিক্ষাভিমানী আমরা কয় জন এরূপ অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষপ্রবরের কর্ম্মের সহিত পরিচিত আছি? এই ভুটিয়াদের সহিত আমাকে বহুদিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল, ইঁহাদের কথা সময়ান্তরে কিছু কিছু কহিব।

প্রায় ১২টার সময় ধারচুলাতে উপস্থিত হইলাম। এ স্থানে সরকার বাহাদুরের একটি আফিস আছে। তিব্বতে যে সকল দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হয়, আর তিব্বত হইতে যাহা আমদানী হয়, তাহার পরিমাণ এ স্থানে লওয়া হইয়া থাকে। এ কার্য্যে যিনি নিযুক্ত আছেন, তিনি বড় মহাশয় ব্যক্তি। ইঁহার নাম আলমোড়াতেও শুনিয়াছিলাম। এখন প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সদাশয়তার পরিচয় পাইলাম। ইঁহার নাম পণ্ডিত লোকমণি। পরিচয়ে আমাকে বাঙ্গালী অবগত হইয়া তিনি তাঁহার, বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতাবিষয়ক অভিজ্ঞতা কহিতে লাগিলেন। বৈশ্য-সম্মিলনের এক অধিবেশন একবার কলিকাতায় হইয়াছিল। তাঁহাতে তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান পর্য্যটক তাহাতে একটু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী সেই সকল পুরাতন কথা স্মরণ করিয়া আমাকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করেন। কোথায় কলিকাতা জোড়াসাঁকো শীল মহাশয়দের প্রাসাদ, আর কোথায় হিমালয়ের

অভ্যন্তরে ধারচুলা! এ স্থানে দেশের কথা শুনিব, ইহা স্বপ্নেরও অতীত হইলেও কার্য্যতঃ তাহা হইয়াছিল। এইরূপ কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর নিকটবর্ত্তী ঝরণায় স্নানাদি সমাপন করিলাম।

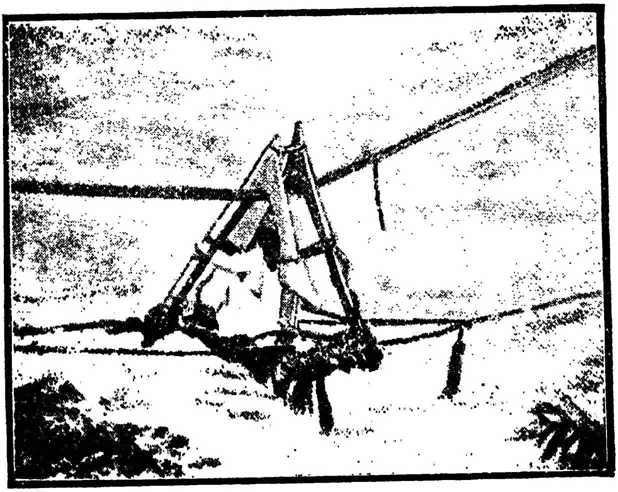
ভোজনের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া স্থান পরিদর্শনের জন্য গমন করি। প্রথমে লাল সিং ভুটিয়ার দোকানে গমন করি। ইনি তিব্বতের এক জন বড় ব্যবসায়ী, ইঁহার নামে আমার পরিচয়-পত্র ছিল। ইঁহাকে আমি আমার উদ্দেশ্যের কথা কহিলাম। তাহা শুনিয়া প্রীত হইয়া ইনি আমাকে সকল প্রকার সাহায্য করিবেন বলিলেন। লোকটি বড় ভদ্রপ্রকৃতির। কৈলাস-যাত্রীকে সাহায্য করিবার জন্য ইনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত। ইঁহার মাতাও এবার কৈলাসে যাইবেন। এ বৎসর কৈলাসের কুম্ভের বৎসর; বৌদ্ধ জগতের বহু দূর দূর দেশ হইতে যাত্রী আগমন করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে যেরূপ হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক প্রভৃতি স্থানে কুম্ভ হইয়া থাকে, কৈলাস-মানসেও সেইরূপ কুম্ভ হয়। আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। তিব্বতী বৌদ্ধরা তাহা ভুলে নাই; তাহারা এখনও তাহা স্মরণ করিয়া তথায় সমবেত হইয়া থাকে। তিব্বতীরা ইহাকে ঘোটক-বৎসর কহিয়া থাকেন। লাল সিং কহিলেন, "এ বৎসর বহু যাত্রী তথায় গমন করিবেন। এই উপলক্ষে বহু ডাকাইতেরও আমদানী হইবে।" এ কথা শুনিয়া ভাবিলাম, দেখা যাউক, অদৃষ্টে কি আছে। আসকোটের কুমার সাহেব, লাল সিংএর নামে পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন, আর বলিয়াছিলেন, "সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারেন।" সেই কথায় আর কথাবার্ত্তা ও দোকানের অবস্থা দেখিয়া সে প্রত্যয় আরও দৃঢ় হইল। সঙ্গে নগদ টাকা লওয়া বড় কষ্টকর ও বিপদপূর্ণ। পাহাড়ে রাস্তায় সব জায়গায়

ভাঙ্গান টাকা পাওয়া যায় না, এই জন্য আলমোড়া হইতে কিছু নোট ভাঙ্গাইয়া লইয়াছিলাম। সেই টাকার বেশীর ভাগ লালসিংএর কাছে জমা রাখিলাম। কিছু দিন পরে তিনি তাকলাকোট বা পুরাংএ ব্যবসার জন্য যাইবেন। সেই স্থানে আমি তাহা লইব, এইরূপ বন্দোবস্ত হইল। টাকা গচ্ছিত রাখিয়া আমি ভার ও চিন্তামুক্ত হইয়া হাল্কা হইলাম। এখন অনেকটা স্বেচ্ছাচারীও হইলাম। লালসিংএর কাছে বিদায় লইয়া কালীর উপর যে স্থানে দড়ির পুল আছে, সেই স্থানে কিছুক্ষণ বসিয়া কালীর রঙ্গভঙ্গ দেখিতে লাগিলাম। আর দেখিলাম, দড়ির পুল; দড়ি ধরিয়া এক জন লোক নেপাল হইতে ইংরাজরাজ্যে আগমন করিতেছে। এরূপ দৃশ্য বহু বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীর ও বদরীনাথ অঞ্চলে গমনকালে দেখিয়াছি, সুতরাং ইহাতে কিছু নূতনত্ব দেখিলাম না। বহু দূরের মধ্যে নেপালে যাইবার ইহা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নাই। অপর পারে নেপাল সরকারের একটি ক্ষুদ্র নগর আছে; তাহাতে নেপালী কর্ম্মচারীরা অবস্থান করিয়া থাকেন, এজন্য ইহা এ অঞ্চলে একটু প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে এ স্থানে স্বর্ণ পাওয়া যাইত, এখনও লোক সময় সময় ইহা সংগ্রহ করিয়া থাকে। এ স্থানে পাদরী মহাশয়দের একটা আড্ডা আছে। আমি যে সময় ধারচুলাতে উপস্থিত হই, সে সময় কেহ ছিলেন না। কোথায় য়ুরোপ বা আমেরিকা, আর কোথায় হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী ধারচুলা! উদ্যোগী না হইলে লক্ষ্মীই বলুন বা সরস্বতীই বলুন, কেহই প্রসন্ন হয়েন না। এক সময় ভারতবাসী, এই শক্তিশালিনী দেবীদিগের প্রসন্নতা লাভের জন্য তন্ময় হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন। সে সময় ভারত ধনে ও বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার

করিয়াছিল। সন্ধ্যাসমাগমে আমি আমার সায়ং-গৃহে উপস্থিত হইলাম।

সায়ংগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পণ্ডিতজী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কয়েক জন রোগী তাঁহার কাছে বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি সরকার বাহাদুরের কর্ম্মচারী হইয়াও বৈদ্যক শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া থাকেন; এ প্রদেশে বনৌষধি প্রভৃতিও সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কথায় কথায় তিনি এক জন বাঙ্গালী সাধুর কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন, "এরূপ অপূর্ব্ব চরিত্রের সুদীর্ঘজীবী সাধু কখন আমি দেখি নাই। তিনি নানা প্রকার রোগের ঔষধের বিষয় অবগত আছেন। তিনি নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কাছে রুষ, চীন প্রভৃতি দেশের জীবিত রাজা মহারাজাদের চিঠিপত্র দেখিয়া য়ুরোপীয় পাদরী মহাশয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। তিনি তিব্বতীবাবা নামে পরিচিত। বাঙ্গালী একাকী কার্য্য করিয়া পৃথিবীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রায় সকল বিভাগে ইহার উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার দুরদৃষ্টবশতঃ মিলিত হইয়া কার্য্য করিবার শক্তি ইঁহাদিগের এখনও বিকাশ লাভ করে নাই। ইহার উন্মেষ হইতেছে; ইহার পূর্ণতার সহিত ইহারাও জগতে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবে, আশা করা যায়।

প্রথমে উল্লেখ করিয়াছি, এ স্থান দিয়া যে সকল দ্রব্য তিব্বত হইতে আমদানী বা তথায় রপ্তানী হইয়া থাকে, পণ্ডিতজী তাহার হিসাব রাখিয়া থাকেন। ইহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করিব। তাহা পাঠে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, এই দুর্গম পথের বাণিজ্য কিরূপ ভাবে চলিতেছে।



দোদুল্যমান সেতুতে পার।

তিব্বত হইতে আমদানী

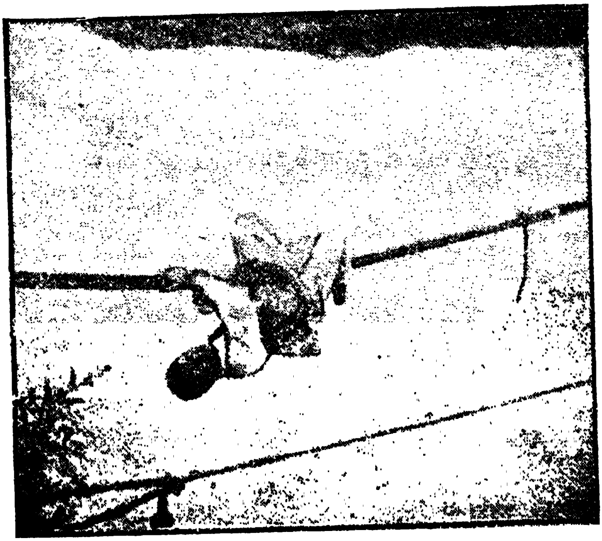
সোহাগা	২২ হইতে ২৪	হাজার মণ।
পশম	৮	" "
লবণ	২০	" "
কস্তূরী	৫০	হাজার টাকার।
ভল্লুকের পিত্ত	৫০	" "
কম্বল	৩০ হইতে ৪০	হাজার থানা।
চামর পুচ্ছ	১০	হাজার টা।
ছাগ, মেষ	২৫	" "
চামড়া	১০	" "
ঔষধি	৪।৫	হাজার টাকার।

ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী।

গুড়, মেওয়া প্রভৃতি	১	লক্ষ টাকার।
বস্ত্র	১	" "
জহরত	১	" "
গমাদি	১	" "

উপরের বাণিজ্য ভুটিয়াদেরই একচেটিয়া। তিব্বতী ব্যাপারীর সংখ্যা খুবই কম।

পাহাড় অঞ্চলে ধারচুলার কম্বলের বেশ সুখ্যাতি আছে। ভুটিয়া রমণীরা কম্বলবয়নে নিপুণা। এক সময় বিলাতের এক প্রদর্শনীতে ইহাদিগকে পাঠান হইয়াছিল। সুন্দর সুন্দর কম্বল প্রস্তুত করিয়া ইহারা তথায় সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। পুরুষরা ছড়ি প্রভৃতির উপর চিত্র অঙ্কন করিয়া থাকে। তাহা দেখিতে মন্দ নহে।



দোদুল্যমান সেতুতে দেশী লোক পার হইতেছে।

অতি প্রত্যূষে ধারচুলা পরিত্যাগ করিব মনে করিয়াছিলাম; কুলীর জন্য তাহা হইয়া উঠিল না। পণ্ডিতজী আমাকে নিরুদ্বিগ্ন হইয়া অগ্রসর হইতে অনুজ্ঞা দিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে কুলী সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন, বলিলেন। আমি তাঁহার সাদর বিদায়ে আপ্যায়িত হইয়া অগ্রসর হইলাম।

সপ্তম অধ্যায়।

ভুটিয়াদের শীতনিবাস ধারচুলা প্রায় ৩ হাজার ফিট উচ্চ। এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া আবার চড়াই চড়িতে আরম্ভ করা গেল। আজ চড়াই বড় মন্দ ছিল না। বহু চড়াই ও উতরাই; এইরূপে ১০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া প্রায় ১২টার সময় খেলায় উপস্থিত হইলাম। এ স্থান প্রায় ৫ হাজার ফিট উচ্চ। এই স্থানে যাইয়া ডাকঘর অধিকার করিলাম। স্থান সুবিধার নহে; ক্ষুদ্র কুটীরের দোতালার উপর একটি অন্ধকারপূর্ণ ঘরে ডাক আফিস। মুক্ত আকাশ ও মুক্ত বায়ুর সহিত পরিচয়-ফলে বদ্ধাকাশ ও বদ্ধবায়ুপূর্ণ অন্ধকার গৃহ ভাল লাগিল না; যেন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। ডাকঘর ছাড়িয়া একটু উপরে উঠিলাম। ক্ষুদ্র গ্রামের রাজপথে থাকিবার স্থান খুঁজিতে লাগিলাম। P, W. D. কর্ম্মচারী পণ্ডিত ভোলানাথ যোশী মহাশয় রাস্তা ঘাট দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত রাস্তায় দেখা হইল। থাকিবার স্থান অনুসন্ধান করাতে তিনি যে স্থানে আশ্রয় লইয়াছেন, সেই স্থানে থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ



হিমালয়ের অধিষ্ঠাত্রী নন্দাদেবী।

অতি প্রত্যূষে ধারচুলা পরিত্যাগ করাই লোভনীয়। আমাদের ...ীর জন্য তাহা হইয়া উঠিল । বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। এখন স্বার্থের দাস আমরা ... হইতে অন্‌রত্যাগ করিয়া বন্ধুর সেবায় তৎপরতা দেখাই। (অবশ্য এ কথাটা বনেদী বংশের পক্ষে নহে।) পণ্ডিত-জীর আমন্ত্রণটা পরে ভোজন-নিমন্ত্রণে পরিণত হইল। পণ্ডিতজীর সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ ছিল; আর ছিল নগর হইতে আনীত খাদ্যদ্রব্য। সুতরাং ভোজনের কোনরূপ অসুবিধা হইল না। ভোজনান্তে তিনি রাস্তা-ঘাটের কথা অনেক কহিলেন। আগের পথে একটা পুলের অবস্থা বড় খারাপ। তিনি আমাকে সাবধানে যাইবার জন্য উপদেশ দিলেন। গারবাংএ থাকিবার জন্য সরকারী ঘরের কথা কহিলেন। তথায় আমার থাকিবার অসুবিধা হইবে না, ইত্যাদি বহু কথা কহিলেন।

খেলা স্থানটি মন্দ নহে; পাহাড়ের গাত্রে অবস্থিত; নিম্নে ধবলী গঙ্গা। এই স্থান হইতে হিমালয়ের তুষারদৃশ্য বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে খেলার ঘৃতের খুব ভাল বলিয়া সুখ্যাতি আছে।

১৭ই জুন প্রাতঃকালে খেলা পরিত্যাগ করিয়া প্রায় ১ হাজার ফিট নিম্নে নামিয়া ধবলী গঙ্গার তটে উপস্থিত হইলাম। ধৌলী গঙ্গাকে দরমা নদীও কহিয়া থাকে। ইহার তট দিয়া দরমা অভি-মুখে একটি রাস্তা গিয়াছে। এ রাস্তা বড় দুর্গম; দুর্গম হইলেও দরমার ভুটিয়ারা এই রাস্তা দিয়া বাণিজ্যের জন্য গমনাগমন করিয়া থাকে। ধৌলী গঙ্গা, হিমালয়ের এ অঞ্চলের প্রচুর জলরাশি কালীর সহিত মিলিত করিয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। ধৌলীর পুল পার হইয়া এইবার প্রকৃত প্রস্তাবে ভুটিয়া দেশে প্রবেশ করিলাম। এখন হইতে কৈলাসের রাস্তার কঠোরতাও বুঝিতে পারা গেল। হাজার

ফিট নামিয়াছি, এখন তাহা অপেক্ষাও বেশী খাড়াই উঠিতে হইবে। রাস্তাও ভাল নহে; বৃষ্টি হইয়া যাওয়াতে স্থানে স্থানে ধস ভাঙ্গিয়া ইহাকে অধিকতর ভয়াল করিয়া তুলিয়াছে। ইহার উপর আবার সময় সময় প্রস্তরখণ্ড উপর হইতে পতিত হওয়াতে যে কোন মুহূর্ত্তে প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনাও সূচনা করিতেছে। যেন আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। সকলে একত্র মিলিত হইয়া নগাধিরাজকে আক্রমণ করা বিধেয় নহে বিবেচনা করিয়া আমরা পৃথক পৃথক হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রথম কুলীদিগকে অগ্রসর হইতে কহিলাম। তাহাদের গতি ও বিধি দেখিয়া আমি অনুসরণ করিতে লাগিলাম। সঙ্কটপূর্ণ স্থান কুলীরা বেশ অতিক্রমণ করিল দেখিয়া, আমিও সাবধানতার সহিত দ্রুতবেগে নির্ভয়ে চলিতে লাগিলাম। কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের ন্যায় একটি শিলাখণ্ড আমার পশ্চাৎ দিয়া শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল। পশ্চাতে না চাহিয়া আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম। শৈলরাজের লক্ষ্য ব্যর্থ হইলে তিনি আর প্রস্তর সন্ধান করিলেন না। আমরাও নিরাপদে তাঁহার মস্তকোপরি আরোহণ করিলাম। অপর পারে খেলার ঘরগুলি দেশালাইয়ের বাক্সের মত দেখাইতে লাগিল। ধৌলী গঙ্গা ক্ষুদ্র রেখার ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া কালীর সহিত মিলিত হইয়াছে। দৃশ্যটি মন্দ নহে। পর্ব্বতের উপরিভাগে কতকটা সমতল ভূমি অতিক্রম করিয়া অদ্যকার অবস্থানস্থানে উপস্থিত হওয়া গেল।

যে স্থানে উপস্থিত হওয়া গেল, তাহার নাম সশা। ইহা চৌদাস পট্টির অন্তর্গত। প্রাচীনকালে এ সকল প্রদেশ চতুর্দংষ্ট্র গিরির অন্তর্গত বলিয়া কথিত হইত। এই শব্দ হইতে চৌদাস শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। সশার ভুটিয়া পাটওয়ারী খুব ভদ্রতার সহিত আমার থাকিবার

বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। স্থানটি বেশ নির্জ্জন, ছোটখাট বাগানের মধ্যে। আকাশ নির্ম্মল থাকিলে এ স্থান হইতে সোর বা পিথোরা গড়ও দেখা যায়। তাহা এই স্থান হইতে সরল রেখায় ৪০।৫০ মাই-লের কম হইবে না। কালী যে পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, সেই পর্ব্বতসমূহের মধ্যে একটা ফাঁকা যায়গা হইয়াছে। সাধারণতঃ এই পার্ব্বত্য প্রদেশে ২।৩ ক্রোশের মধ্যে দৃষ্টি আবদ্ধ থাকে। এইরূপে দৃষ্টি বহুদিন হইতে আবদ্ধ ছিল। আজ অনেক দিন পরে বহুদূরদেশ নয়নগোচর হইল। দেশের সমতল ভূমি দেখি-বার জন্য ইচ্ছুক হইলেও পর্ব্বত সকল তাহার অন্তরায় হইলেন।

সশা চৌদাস বড় ভুটিয়া গ্রাম। বাড়ীগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখে ধ্বজ-যষ্টি শোভিত। ইতঃপূর্ব্বে যে সকল স্থান অতিক্রমণ করিয়া আসিয়াছি, সে সকল স্থানের স্ত্রীলোকরা যেরূপ একটু বেশী সলজ্জ, এ স্থানে ভুটিয়া রমণীরা ততটা নহে। অত্যন্ত শীতের জন্য পরিচ্ছদেরও পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের পরিধানে কার্পাস বস্ত্রের পরিবর্ত্তে পশমী কাপড়ের অধিক প্রচলন। এ স্থান ৮ হাজার ফিটেরও অধিক উচ্চে অবস্থিত; সুতরাং শীতও খুব বেশী। অন্য স্থানে এত শীত অনুভব করা যায় নাই। সন্ধ্যার সময় থার্ম্মমিটার দেখিলাম, ৬৫ ডিগ্রী নামিয়াছে। প্রাতঃ-কালে গমনকালে দেখিলাম, পারদ ৬০এ নামিয়াছে। এ স্থানে অন্ধ্র সাধুটির সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তিনি এ অঞ্চলে কিছুদিন থাকিয়া গরম কাপড় সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হইবেন। এ জন্য তিনি ভুটিয়া পল্লী হইতে কিছু কিছু অর্থ ও মৃগচর্ম্ম সংগ্রহ করিতে গমন করিয়া-ছিলেন। ভুটিয়ারা স্বভাবতঃ দয়ালু ও অতিথিপ্রিয়। কৈলাসযাত্রী সাধুসন্ন্যাসীরা ভুটিয়াদের উদারতা হইতে বঞ্চিত হয়েন না।



কালীর দৃশ্য।

বিসূচিকাভীতি এ দেশবাসীদের মধ্যে বেশ ত্রাস উৎপন্ন করিয়াছিল। তিব্বতী ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই রোগে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে এই ত্রাসের মাত্রাটা একটু বেশী বাড়িয়া গিয়াছিল। রাস্তার বহু স্থানে ইহাদের তাঁবু দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এই রোগ যাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অল্পই রোগমুক্ত হইয়াছে। এই সকল কারণে ভুটিয়ারা অনেক আগন্তুককে গ্রামে থাকিতে দেয় নাই; এমন কি, সময় সময় তাহাদের জলের ঝরণাও ব্যবহার করিতে দেয় নাই।

সশা-চৌদাস হইতে প্রাতঃকালে পুনরায় গমন করিতে আরম্ভ করিলাম। এই স্থানে আবার নূতন করিয়া কুলী সংগ্রহের জন্য একটু বিলম্ব হইয়াছিল। কুলীকে কহিলাম, আজ সামখেলা পর্য্যন্ত গমন করিব। তাহাকে সেই স্থানের পাটওয়ারীর বাড়ীতে বোঝা লইয়া আসিতে কহিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এ সকল স্থানের লোকালয় সকল সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সঘন বলিয়া বোধ হইল। রাস্তার বহু নিম্নে ভুটিয়াদের বাড়ীগুলি বেশ সুন্দর দেখিতে লাগিলাম। স্থানে স্থানে শস্যশ্যামল অনেক ক্ষেত্রও দেখিলাম। এ অঞ্চলে এ দেশের মসুর দাল প্রসিদ্ধ। আজ একটা উচ্চ পাহাড় অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। ইহার উতরাইএর শেষ সীমায় পার্ব্বত্য নদীর ধারে সামখেলা। রাস্তা হইতে একটু দূরে, এই রাস্তা বনের ভিতর দিয়া গিয়াছে। অচেনা লোকের পক্ষে ইহা বাহির করা একটু কষ্টকর। ভ্রমক্রমে সামখেলা অতিক্রমণ করিয়া নদী পার হইয়া ২ মাইল দূরে গালা বা গালাগড়ে গমন করিলাম। এই স্থানে ডাক পিয়নদের একটা আড্ডা আছে। সেই স্থানে আশ্রয় লওয়া গেল। ইহার নিকট এক ঘর দরিদ্র গৃহস্থ বাস করিয়া থাকে। তাহার সাহায্যে

ভোজ্য দ্রব্য স গ্রহ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করা গেল। মনে করিলাম, কুলীরা আমাকে সামখেলায় দেখিতে না পাইলে গালায় আসিয়া মিলিত হইবে।

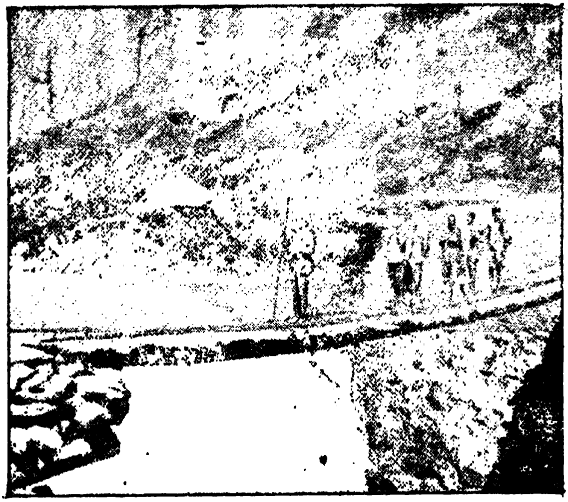
যশোদা নাম্নী এক ভুটিয়া রমণী স্থানে স্থানে পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, কুলীরা আসিলে এই স্থানে রাত্রিবাস করা যাইবে, এইরূপ চিন্তা করিয়া কুলীদের আগমন :প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। যখন দেখিলাম, তাহাদের আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই, দিবাও অবসানপ্রায় হইয়া আসিতেছে, তখন আর এ স্থানে থাকা উচিত নহে বিবেচনা করিয়া, যে রাস্তা দিয়া আসিয়াছিলাম, সেই রাস্তা দিয়া নদী অতিক্রমণ করিয়া সামখেলায় উপস্থিত হইলাম। সন্ধ্যা হইয়াছে। অল্প অল্প অন্ধকারে কোনরূপে বহুকষ্টে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। প্রত্যাবর্ত্তন সব সময়ই ক্লেশকর সন্দেহ নাই। এ যাত্রায় এরূপ ভাবে কখনও পিছু ফিরিতে হয় নাই। একটু ভ্রমের জন্য ক্লেশের সীমা রহিল না। নদীর উচ্চভূমিতে একটি কুটীরে আমার কুলীরা অবস্থান করিতেছিল। প্রধান মহাশয় আসিয়া সংবর্দ্ধনা করিলেন; ভোজনের কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আজ প্রায় ১০ হাজার ফিটের পাহাড়ে উঠিতে হইয়াছিল। ৪ মাইল অনর্থক পথিভ্রমণ ইত্যাদি কারণে শরীরটা একটু ক্লান্ত হইয়াছিল। রন্ধনের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ পান করিয়া রাত্রিযাপন করিব, স্থির করিলাম।

রাস্তায় কুলীবিভ্রাট লাগিয়াই আছে। প্রথম প্রথম বড়ই বিরক্তিকর হইয়াছিল। এখন অভ্যাস হইয়াছে। একজন কুলী বলিল, আমি আর অগ্রসর হইব না, আমার বোঝা বড় বেশী হইয়াছে। সে বোঝা বরাবর একজন কুলী আনিয়াছে। এখন তাহার জন্য আমি

দুই জন কুলী করিতে অনিচ্ছুক, সুতরাং প্রধানকে এ সমস্যা দূর করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি একজন দৃঢ়কায় ব্যক্তি নিযুক্ত করিয়া আমাকে বাধিত করেন।

আবাব প্রাতঃকাল হইল, আবার আমার গমনেরও আরম্ভ হইল। প্রধান মহাশয় ভোজন করিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে না পারাতে তিনি একটু দুঃখিত হইলেন। সামখেলা ৮।১০ খানি গৃহের সমষ্টি। গ্রাম-খানি একটু ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। আমার মত আগন্তুককে দেখিবার জন্য সুপ্তোত্থিত যুবক-যুবতীরা ঘরের বাহির হইতে লাগিল। তাহাদের মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন, তাহারা বেশ সুখস্বচ্ছন্দে আছে। গ্রামের আশপাশের শস্যক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে পথ অতি-ক্রমণ করিয়া আমার গন্তব্য রাস্তায় উপস্থিত হইলাম। কয়েক মাইল গমনের পর নিরপানির প্রাচীন রাস্তা কুলীরা দেখাইয়া দিল। এ রাস্তা বড় দুর্গম, জল পাওয়া যায় না বলিয়া ইহার নাম নিরপানি হই-য়াছে। প্রত্যাগমনকালে আমাকে ইহার সঙ্কীর্ণ বিপদ্‌পূর্ণ রাস্তা দিয়া আসিতে হইয়াছিল।

কতিপয় মাইল উতরাইএর পর ভুটিয়া-নির্ম্মিত কালীর পুলের নিকট উপস্থিত হইলাম। ইহার এক পারে ইংরাজরাজ্য, অপর পারে নেপালরাজ্য। শীতকালে ভুটিয়ারা ইহা প্রস্তুত করে; বর্ষাকালে যখন কালীর জল বাড়ে, তখন ইহা ভাঙ্গিয়া যায়। পুল ভাঙ্গিয়া গেলে অগত্যা নিরপানির রাস্তা দিয়া আসিতে হয়। নেপালরাজ্যে প্রায় এক ঘণ্টা চলিতে হইয়াছিল। গমনকালে একটি জলপ্রপাত দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। উচ্চ পাহাড়ের উপর জল পড়িতেছে। যে স্থানে জল পড়িতেছে, সে স্থানের প্রস্তর ক্ষয় হইয়া গহ্বরের আকার ধারণ



ভুটিয়া পুল।

করিয়াছে। ঘণ্টাখানেক পরে আবার ইংরাজরাজ্যে ফিরিয়া আসা গেল। কিয়ৎক্ষণ গমনের পর আর একটি জলপ্রপাত দেখা গেল। ইহা হইতে দেড় শত হাত নিম্নে প্রচুর ধারায় জল পড়িতেছে। কিয়ৎক্ষণ ইহার নিকটে বিশ্রাম করিয়া পুল পার হওয়া গেল। পুলটি যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে পড়ে হইয়াছে। একে একে ভয়ে ভয়ে পুলটি পার হওয়া গেল অদ্যকার রাস্তার শেষ ভাগটা বড়ই খারাপ, কোনরূপে ভগবৎকৃপায় তাহাও অতিক্রমণ করা গেল।

বহু কষ্টে, বহু চড়াই, উতরাই ও বহু পার্ব্বত্য নদ-নদী অতিক্রমণ করিয়া ক্লান্ত হইয়া মালপায় উপস্থিত হইলাম। ইহা প্রায় ৭ হাজার ফিট উচ্চে। এ স্থানে অধিক লোকালয় নাই। ইহা ডাক পিয়ন বদলাইবার একটা আড্ডা মাত্র। চতুর্দ্দিকে বন-জঙ্গল, নির্জ্জনতা যেন অখণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিতেছেন।

পিয়নদের ক্ষুদ্র কুটীরে উপস্থিত হওয়া গেল। তখন এক জন হরকরা আসিয়া তাহার ডাক অন্য হরকরাকে দিয়া বিশ্রাম করিতেছে। আমরা কুলী সহ তথায় উপস্থিত হইয়া তথাকার জনতা বৃদ্ধি করিলাম। তাহার কুটীরে ২।১ জন লোক কোনরূপে থাকিতে পারে। কুটীরের কিয়দংশ রন্ধনশালা, অপরাংশ শয়ন ও ভাণ্ডার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই কুটীরে থাকার সুবিধা হইবে না বিবেচনা করিয়া এই স্থানের স্বল্প নিম্নে নাতিবৃহৎ গুহার মধ্যে রাত্রিবাসের সঙ্কল্প করা গেল। এই গুহার এক পাশে একখানি পাথরের উপর আমি আমার শয্যা বিস্তার করিয়া তাহা অধিকার করিলাম। নির্জ্জনতা উপভোগের পক্ষে স্থানটি বিশেষ উপযোগী। সম্মুখে কালী যেন নৃত্য করিতে করিতে, কুলুকুলু শব্দে গান করিতে করিতে, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গমন করিতেছেন। কালী সারদা নামেও পরিচিতা। সারদার এই নৃত্য ও



সারদা বা কালীর অপর দৃশ্য।

গীতের অভিনয় অনন্তকাল ধরিয়া অভিনীত হইতেছে। এই গুহায় বসিয়া হয় ত কত শত যোগী ঋষি মহাত্মা ধ্যানস্তিমিতনেত্রে এই অভিনয় দর্শন করিয়াছেন। আমার মত কতশত পথিকও যে কিয়ৎকালের জন্য স্বর্গ ও সুন্দরীর ভাবনা ভুলিয়া গিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাস্তার ক্লেশের কথার একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু ইহার সুখের কথা একবারও কহি নাই। অন্ধকার রাস্তায় নানা প্রকারের নয়নরঞ্জন পুষ্প ও তাহাদের নাসিকাতৃপ্তিকর গন্ধের কথা উল্লেখ করি নাই। কতরূপ সুন্দর সুন্দর পুষ্প ও পত্র যে দেখিয়াছি, তাহার সংখ্যা হয় না। বর্ণের জন্য আমাদিগকে বিদেশীদের হাত-তোলার উপর নির্ভর করিতে হয়। অদূর-ভবিষ্যতে ভারতীয় যুবক-গণের চেষ্টায় কত প্রকারের রং এই হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইতে পারিবে। আশা করা যায়, সমস্ত পৃথিবীও এক দিন তাহাতে রঞ্জিত হইতে পারিবে।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম ও স্নানাহারের পর আবার যেন নূতন দেহ ফিরিয়া পাইলাম। পিয়নদের কাছে কিছু আলু পাওয়া গিয়াছিল, ভোজন বেশ তৃপ্তিপূর্ব্বকই হইয়াছিল। নক্ত-ভোজন খেলার ঘৃতসিক্ত পরাটা আর আলুর তরকারী বড়ই উপাদেয় হইয়াছিল। যুধিষ্ঠির যখন কৈলাসগমন করিয়াছিলেন, সে সময় ক্লেশ-সহনে অপটু ঔদরিক-দিগকে লক্ষ্য করিয়া যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা কৈলাসযাত্রীর পক্ষে এখনও প্রযুক্ত হইতে পারে। সময় সময় আমাদের পক্ষে তাহার কিছু কিছু ব্যভিচার হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সত্য। ধর্ম্মরাজের মুখবিনির্গত বাক্য কদাচ অলীক বা ব্যর্থ হইবার নহে। যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—

"ভিক্ষাভুজো নিবর্ত্তন্তাং ব্রাহ্মণা যতয়শ্চ যে।
ক্ষুত্তৃষ্ণোঽধ্বশ্রমায়াস-শীতার্ত্তিমসহিষ্ণবঃ॥
তে সর্ব্বে বিনিবর্ত্তন্তাং যে চ মিষ্টভুজো দ্বিজাঃ।
পক্বান্নলেহ্যপানানাং মাংসানাঞ্চ বিকল্পকাঃ॥
তেঽপি সর্ব্বে নিবর্ত্তন্তাং যেঽপি সূদানুযায়িনঃ॥"

"যাঁহারা ভিক্ষাভোজী, যাঁহারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথের ক্লেশ ও শীত সহিতে অপারগ, এরূপ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী প্রত্যাবর্ত্তন করুন। যাঁহারা মিষ্টান্নভোজী, পক্কান্নপ্রিয়, লেহ্য পান ও নানা প্রকার মাংসভোজনে রত, তাঁহারাও নিবর্ত্ত হউন। আর যাঁহারা পাচকের পশ্চাতে অনুগমন করেন, তাঁহারাও আসিবেন না।"

এই সকল দুঃখের সহিত সমর করিব বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছি। কেমন এক প্রকার তন্ময়তা আসিয়াছিল, তাহার ফলে এ সকল ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া বোধ হইত না। এইরূপ ক্লেশের ভিতর যদি ঈষৎ সুখের সঞ্চার হইত, তাহা হইলে তাহাতে আনন্দের সীমা থাকিত না। এই সামান্য আলু যে আনন্দ দিয়াছিল, বহু রাজার প্রাসাদের রাজভোগ্য দ্রব্য সে আনন্দ প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িয়াছিল। মাথার কাছে ছাতিটি খুলিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া যেরূপ সুখে নিদ্রা হইয়াছিল, সেরূপ বুঝি আর কোথাও হয় নাই।

প্রাতঃকালের সঙ্গে আবার গমনের জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। মধ্যহিমালয়ের যত মধ্যবর্ত্তী হইতেছি, ততই ইহার দুর্গমতা বুঝিতে পারিতেছি। যতই ইহার কঠোরতা উপলব্ধি করিতেছি, ততই যেন ইহাকে জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা দৃঢ়মূল হইতেছে। পৃথিবীর ভিতর সর্ব্বোচ্চ শিখরশ্রেণী বক্ষে ধারণ করিবার জন্য বহু বলের প্রয়োজন

হয়। এই স্থান হইতে পর্ব্বতের গঠনপ্রণালীরও ব্যতিক্রম আরম্ভ হইয়াছে। আজ ৯ হাজার ফিট উচ্চ বুধিতে অবস্থান করিতে হইবে। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া চলিতে আরম্ভ করা গেল। আমার মত পঙ্গুকেও তিনি শক্তি দিয়া হিমালয়বিজয়ে প্রবৃত্ত করিলেন। আলস্য আর ভয় মানুষকে অভিভূত করিয়া ফেলে। উদ্যমের ফলে আলস্য দূর হয়; আর একটু সফলতালাভের সহিত ভয়ও বিদূরিত হইয়া থাকে। সেই জন্য আমাদের শাস্ত্রে অলসতা মহাপাপের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। দীর্ঘ যষ্টির সাহায্যে শনৈঃ শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইলাম। রাস্তায় সময় সময় ভুটিয়া বা তিব্বতী ব্যবসায়ীরা বোঝাই মেষের দল লইয়া গমন করিতেছে। ইহাদের মধ্যে বলবান্ মেষের গলায় ঘণ্টা বাঁধা আছে। সে দলের নায়ক হইয়া শৃঙ্খলার সহিত পর্ব্বতের চড়াই চড়িতেছে। স্থানে স্থানে ভারক্লান্ত মেষ বিবশ হইয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়া ধুঁকিতে থাকে। সে দৃশ্য দেখিলে হৃদয়ে বড় করুণা সঞ্চার হয়। কাতরতা-ব্যঞ্জক মেষের চক্ষুর্দ্বয় এখনও আমার মনে পড়িয়া থাকে। রাস্তার ধারে ব্যবসায়ীরা বোঝা সকল শ্রেণীবদ্ধ রাখিয়া রন্ধনাদি করিতে থাকে। সে সময় পরিশ্রান্ত মেষের দল কেমন আনন্দের সহিত সাগ্রহে তৃণাদি ভক্ষণ করে। সে সময় তাহাদের আনন্দ উপভোগ করিবার বিষয়। এইরূপ নানা বিষয় উপভোগ করিতে করিতে অদ্যকার চড়াইএর শেষ সীমায় উপস্থিত হওয়া গেল। চড়াইএর পর আবার নামিতে আরম্ভ করা গেল। মনে করিয়াছিলাম, আজই গারবাং যাইব। ক্লান্ত কুলীরা তাহাতে রাজী হইল না। আমিও বড় কম ক্লান্ত হই নাই। সুতরাং সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া বুধির স্কুলগৃহে ডেরা ফেলা গেল।

বিসূচিকার ত্রাস এ অঞ্চলেও একটু একটু আসিয়াছে। কলেরার দেশ হইতে আমরা আসিতেছি, আমাদের সহিত মেলামিশি করা উচিত নহে, এ কথা লোক ভালরূপ বুঝিয়াছিল। কৈলাসযাত্রী আমরা, আমাদিগকে স্থান না দেওয়াও বড়ই দোষের, ইহাও তাহারা জ্ঞাত ছিল। উভয় দিক রক্ষা করিয়া গ্রামের উপরে স্কুলগৃহে থাকিবার পক্ষে তাহারা কোন আপত্তি করিল না।

আজ আর স্কুল বসিল না। আমাদের প্রতি সম্মান বা লোকের আত্মরক্ষার জন্য, কি কারণে স্কুল বন্ধ হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সম্ভবতঃ শেষোক্ত কারণ প্রবল হইয়া থাকিবে। স্কুলঘরটি মন্দ নহে বটে, কিন্তু পিশুতে পরিপূর্ণ। যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া বিছানা পাতা গেল। গ্রামের প্রধানকে ডাকিয়া পাঠান হইল। অনেক ডাকাডাকির পর প্রধানের পুত্র আসিয়া কহিল, প্রধান মহাশয় গ্রামান্তরে গমন করিয়াছেন। কোন বিষয়ে আমার অভাব ছিল না, সবই সঙ্গে ছিল। শাক-সব্জী ও কিছু দুগ্ধ সংগ্রহের জন্য কহিলাম। বিশেষ কিছু পাইলাম না।

শ্রান্তি দূর করিবার পর স্নানের উদ্যোগ করিলাম। বহুদূরে—নিম্নে একটি ঝরণা আছে। গ্রামের পাশ দিয়া রাস্তা। গ্রামের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র একটা কুকুর আসিয়া আক্রমণ করিল। তিব্বতের কুকুর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, এ কথা আগেই পড়িয়াছিলাম, এখন তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। আমার রাস্তার সহচর—বন্ধু যষ্টি যদি সঙ্গে না থাকিত, তাহা হইলে আমার কি দশা হইত, তাহা জানি না। একটা কুকুরের ডাক শুনিয়া গ্রামের আরও ২।৩টা কুকুর উপস্থিত হইল। কুকুরের সাহায্যের জন্য কুকুর আসিল, আমার সাহায্যের জন্য কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু

দূরে ভুটিয়া রমণীরা জল আনিতেছিলেন, তাঁহারা আমার অবস্থা দেখিয়া দ্রুতবেগে আমার দিকে আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া একটু সাহস পাইলাম। তখন আমিও খুব দৃঢ়তার সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিলাম। রণে ভঙ্গ দিলে দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না, বরং সময় সময় আমি অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিয়াছিলাম। এই যুদ্ধের সন্ধিক্ষণে রমণীরা আসিয়া সন্ধিস্থাপনে সহায়তা করিলেন। কুকুররা গ্রামের ভিতর গেল, আমিও স্নানের জন্য নিম্নে নামিয়া গেলাম। স্নানের পর সন্ধিভঙ্গভয়ে আর গ্রামের দিকে যাইলাম না, একটু ঘুরিয়া স্কুলগৃহে উপস্থিত হইলাম।

মধ্যাহ্নে আর নক্ত-ভোজনের কোন ত্রুটি হইল না। নিদ্রারও বিশেষ কোন ব্যাঘাত হয় নাই। গৃহের মধ্যস্থলে অগ্নি প্রায় সমস্ত রাত্রি প্রজ্বলিত ছিল। কুলীদের বস্ত্রের অভাব অগ্নির উত্তাপে দূর হইয়াছিল। প্রভাতের সহিত গমনের জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। শীতের প্রকোপটা খুব বেশী বোধ হইতে লাগিল। এত দিন যে বস্ত্রে শীত কাটিতেছিল, তাহা আর যথেষ্ট বিবেচিত হইল না। সঞ্চিত সোয়েটারের সদ্ব্যবহার করা গেল। বুধির নিকট বিদায় লইয়া বড় রাস্তা ধরা গেল। আজ খুব খাড়া চড়াই চড়িতে হইবে। পর্ব্বতের শিরোদেশ যেন ঠিক মস্তকের উপর অবস্থান করিতেছে। আনন্দের সহিত উঠিতে লাগিলাম। আজ গারবাংএ উপস্থিত হইব; কৈলাস-যাত্রার তৃতীয় পরিচ্ছেদ পূর্ণ হইবে। এই আনন্দলাভের জন্য পরিশ্রম বড় কম করিতে হয় নাই। বুধি হইতে গারবাং ৪ মাইল। এই ৪ মাইল যাইতে "কালঘাম" বাহির হইয়াছিল। পর্ব্বতের শিখরে উঠিবার সময় কপালে ঘর্ম্মানুভব হইয়াছিল। কিন্তু কপালে ঘামের কোন



হিমালয়ের দেবদারু।

চিহ্ন রহিল না—ঘর্ম্মের পরিবর্ত্তে লবণ-কণিকা কপালে রহিয়া গেল। বহু কষ্টে যখন পর্ব্বতের শিখরদেশে উপস্থিত হইলাম, তখন আনন্দের সীমা রহিল না। উপর হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। বুধি যেন পদতলে এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। দূরের—বহু—বহু দূরের বনস্পতিমণ্ডিত পর্ব্বতশিখর সকল কেমন শোভা পাইতেছে। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য বসিয়া উপভোগ করিবার জন্য প্রকৃতি-সুন্দরী যেন শিলা সকল সুন্দররূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন। কুলীরা বিলম্বে উপস্থিত হইল। তাহাদের ক্লান্তি দূর হইলে আবার চলিতে আরম্ভ করা গেল।

পর্ব্বতের উপর অনেকটা সমতল ভূমি ছিল। তাহাতে ভূমিসহ মিলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদে পীত, লোহিত, নীল বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, বহুমূল্যের গালিচা কোন বিশিষ্ট অতিথির অভ্যর্থনার জন্য পাতা হইয়াছে। মনুষ্য-নির্ম্মিত গালিচার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না! এই অতুলনীয় পুষ্পশয্যার তুলনা নাই। প্রকৃতি-সুন্দরী যেন নিজের মনের মত খেলা খেলিবার জন্য এই বিচিত্র কুসুমাস্তরণের রচনা করিয়াছেন। এই বিচিত্র শোভা উপভোগ করিতে করিতে পর্ব্বত-শিখরের অপর ভাগে উপস্থিত হইলাম। এ স্থান হইতে অদূরে অবস্থিত গারবাং আমাদের নয়নগোচর হইল।

পর্ব্বতের শিখর হইতে কিছু অবতরণ করিতে হইয়াছিল। একটি ঝরণা অতিক্রমণ করিয়া গ্রামাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। এক সময় এ সকল প্রদেশ তিব্বতীয় প্রভাবের অন্তর্গত ছিল। এখনও তাহার নিদর্শন পড়িয়া রহিয়াছে। তিব্বতীয় কর্ম্মচারী যে স্থানে দুষ্টের প্রতি বেত্রদণ্ড প্রয়োগ করিতেন, সেই শিলাখণ্ড এখনও

পতিত রহিয়াছে। ভূতযোনি হইতে গ্রাম রক্ষা করিবার জন্য ইহার নিকট তিনটি শিলা রহিয়াছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে "অপসর্পন্তু তে ভূতা" ভূতাপসারণ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আমরা গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

অষ্টম অধ্যায়

গারবাং এই অঞ্চলের প্রধান সহর। ইহার বহু নিম্নে কালী প্রবল-বেগে প্রবাহিতা হইতেছেন; বামদিকে বিশাল পর্ব্বত, পাদদেশে সমতলভূমির উপর গারবাং অবস্থিত। এই প্রধান সহরের গৃহ-সংখ্যা প্রায় ১ শত হইবে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি দ্বিতল। ধ্বজ শোভিত গৃহশ্রেণী অতিক্রম করিয়া গ্রামের সীমান্তে স্কুল গৃহে উপস্থিত হইলাম। এ অঞ্চলে স্কুল-গৃহে ছাত্ররা বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে, আর অতিথি-অভ্যাগত আশ্রয়স্থানও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমার আসিবার কথা ধারচুলার পণ্ডিত লোকমণিজী অগ্রেই পাঠাইয়াছিলেন, আমি উপনীত হইলেই অনেকে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কেহ কেহ কহিলেন, "আপনার অভ্যর্থনার জন্য গ্রামের প্রান্তে অপেক্ষা করিতেছিলাম, দেখিতে না পাওয়াতে মনে করিলাম, এ বেলা বুঝি আসিতে পারিলেন না।" এইরূপ সাদরসম্ভাষণে আপ্যায়িত হইলাম।

স্কুলের অধ্যাপক মহাশয় কামাগুন অঞ্চলের ব্রাহ্মণ। যত দিন ভুটিয়ারা এ স্থানে অবস্থান করে, তত দিন এ স্থানের তিনি পোষ্ট-মাষ্টার ও স্কুল-মাষ্টার। শীতের সমাগমের সহিত তিনি দীর্ঘ অবকাশ

প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নিদাঘের সহিত ভুটিয়ারা এ স্থানে আগমন করিলে মাষ্টার মহাশয়ও সেই সময় আসিয়া স্কুল ও পোষ্ট আফিস খুলিয়া থাকেন।

প্রাথমিক আলাপের পর অবস্থানের জন্য স্কুল-গৃহে স্থান দেখিতে লাগিলাম। মাষ্টার মহাশয়ও সে কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। গৃহের এক পার্শ্বে মঞ্চের উপর স্থান নির্ব্বাচন করিলাম। আসবাবপত্র যখন রাখিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলাম, সে সময় দিলীপ সিং নামক এক যুবক আসিয়া কহিলেন, "রুমাদেবী আপনাদের থাকিবার জন্য তাঁহার গৃহে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া তথায় আগমন করিয়া আমাদিগকে কৃতকৃতার্থ করুন।" পরে অবগত হইয়াছিলাম, ধারচুলার পণ্ডিত লোকমণিজী রুমাকে আমাদের কথা লিখিয়াছিলেন। তাহার ফলে এই ব্যবস্থা হইয়াছে। মাষ্টার মহাশয়ের দিকে চাহিয়া তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "সে স্থান অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন—সাধু-সন্ন্যাসী এ স্থানে আসিলে রুমা তাঁহাদিগকে যত্ন করিয়া সেবা করিয়া থাকেন।" এইরূপ কহিয়া মাষ্টার মহাশয় রুমার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মনে করিলাম, ২।৩ দিন থাকিব, ইহাদের মধ্যে অবস্থান করিলে অল্পসময়ের মধ্যে ইহাদের আচার-ব্যবহার অনেক অবগত হইতে সমর্থ হইব। এইরূপ মনে করিয়া দিলীপের আমন্ত্রণ স্বীকার করিলাম।

স্কুলের অনতিদূরে রুমাদেবীর গৃহ। কুলীরা বোঝা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল—আমরাও সাদরে অভ্যর্থিত হইলাম। আঙ্গিনায় কেদারায় আমি উপবেশন করিলাম; বহুসংখ্যক ভুটিয়া নর নারী চতুর্দ্দিক্ হইতে সাগ্রহে দেখিতে লাগিল। কেহ বা ভক্তির সহিত প্রণাম করিতে লাগিল; কেহ বা কোন্ দেশ হইতে আসিতেছি, সেই

বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিল। তাহাদের কৌতূহল দূর করিয়া যে গৃহ অবস্থানের জন্য পরিকল্পিত হইয়াছে, তথায় বস্ত্রপরিত্যাগের জন্য গমন করিলাম।

ঘরখানি দোতলার উপর। দীর্ঘ প্রকোষ্ঠের মধ্যে গৃহের দ্বার এবং যাহাতে অধিক শীতল বায়ু আসিতে না পারে, সেই জন্য ছোট একটিমাত্র জানালা। গৃহের এক ভিত্তিগাত্রে গঙ্গাদেবীর চিত্র, অপর ভিত্তিগাত্রে—

রাম রামেতি রামেতি রমে রমে মনোরমে।
সহস্রনাম তত্তুল্যং রামনাম বরাননে॥

অঙ্কিত রহিয়াছে। এ সকল দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। মানুষের সঙ্গী, পুস্তক, ব্যবহারের জিনিষ দেখিয়া অনেক সময় তাহার চরিত্র অনুমান করা যায়। পণ্ডিত লোকমণিজীর কাছে এই সাধ্বী মহিলার অনেক সদ্‌গুণের কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। এখন তাহার কিছু কিছু নিদর্শন দেখিতে পাইলাম।

কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর ভোজনাদির উদ্যোগ করা গেল।

রুমার আতিথ্যগ্রহণ জন্য বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হওয়া গেল। সেই সাধ্বী রমণী উত্তম চাউল প্রভৃতি উপকরণ প্রদান করিলেন। রন্ধনের উদ্যোগ করিয়া স্নান করিতে গমন করিলাম। এ স্থানটি সমুদ্র হইতে ১০ হাজার ফিট হইতেও বেশী উচ্চ; সুতরাং এ স্থানে যে শীত খুব বেশী, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই জন্য সর্ব্বদা বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া থাকিতে হয়। স্থানটি খুব উচ্চ বলিয়া হাওয়া খুব হাল্কা ও শুষ্ক। ইহা অপেক্ষা উচ্চ স্থান অতিক্রম করিয়াছি বটে, কিন্তু এরূপ স্থানে অবস্থান করি নাই। এই জন্য খুব সাবধানতার সহিত স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রতিও মন দিয়াছিলাম। স্থানটি বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ হইলেও

আমাদের শরীর এরূপ জলবায়ুতে অভ্যস্ত নহে বলিয়া এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলাম।

স্কুলের নিকট রাস্তার নিম্নে জলের ঝরণা, মৃদুমন্দ ধারায় জল উদ্গত হইতেছে। গরম জলে স্নান করিবার জন্য কেহ কেহ অনুরোধ করিলেন, আমি ঝরণার শীতল জলে স্নান করিবার পক্ষপাতী। ইহাতে সর্দ্দির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আমি প্রত্যহ গঙ্গায় প্রাতঃস্নানে অভ্যস্ত হইলেও এ স্থানে ১০।১১টার সময় আমার প্রাতঃস্নান সম্পন্ন হইত। সম্ভবতঃ এই স্নানের অভ্যাসের ফলে শীতের আক্রমণ হইতে রক্ষিত হই।

আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া স্কুলের দিকে গমন করিলাম। স্কুলে ৪০।৫০টি বিদ্যার্থী, ইহার মধ্যে ২।৪টি বালিকাও লেখাপড়া করিতেছে। পাঠ্যপুস্তক হিন্দীভাষায় লিখিত। এই সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশে ভুটিয়া বালকবালিকার মধ্যে হিন্দীর প্রচলন দেখিয়া প্রীত হইলাম।

মাষ্টার মহাশয় এ অঞ্চলের মধ্যে বিশিষ্ট ভদ্রপুরুষ। সরকারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। ইনি এ স্থানে সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি ও বাক্‌শক্তির প্রতিনিধি। স্কুলের ভিত্তিতে যুদ্ধে ঋণ ও প্রাণ দিবার জন্য আমন্ত্রণপত্র আবদ্ধ। ব্যবসায়ী ভুটিয়াদের মধ্যে কেহ প্রাণ দিয়া সরকারকে সাহায্য করিবার জন্য উপস্থিত হয় নাই, তাহা অবগত হইলাম।

মাষ্টার মহাশয় আমার কৈলাসগমনের কথা শুনিয়া প্রীত হইলেন। আর তিনি, "কত লোক এই স্থান দিয়া কৈলাস যাইতেছেন। আমার ভাগ্যে তাহা হইল না!" বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে সঙ্গী হইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তাঁহার কার্য্য



চকদেন, প্রস্তর স্তূপ ও পতাকা।

করিবার কেহ নাই বলিয়া তিনি অক্ষমতার কথা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। এই সকল প্রসঙ্গের পর তিনি বলিলেন, "তিব্বতীরা যে পর্য্যন্ত না রাস্তা খুলিয়া দিতেছে, সে পর্য্যন্ত গারবাংএ অবস্থান করিতে হইবে। পাহাড়ে কলেরার প্রকোপের কথা অবগত হইয়া তাহারা এই ব্যবস্থা করিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া একটু অস্বস্তি বোধ করিলাম। মনে করিয়াছিলাম, যেরূপে কোন স্থানে বেশী বিলম্ব না করিয়া আনন্দের সহিত গমন করিতেছি, সেইরূপ ভাবে গমন করিব। এ স্থানে যে এখন বাধ্য হইয়া থাকিতে হইবে, ইহাতে পথক্লেশটা বাস্তবিকই ক্লেশকর হইয়া উঠিল। "অসভ্য তিব্বত" যে স্বাধীন, সুতরাং সে ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারে। চিরপরাধীন আমাদের মাথায় সে কথা প্রবেশ করিতে পারে না! ভগবান্ যাহা করেন, তাহা মঙ্গলের জন্য করেন, এইরূপ ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া গেল। পরে বুঝিলাম, আমাদের পক্ষে ইহা মঙ্গলময় হইয়াছে। ১৬।১৭ দিন গারবাংএ ছিলাম। এই অবস্থানের ফলে শরীর এ দেশের জলবায়ুতে বেশ অভ্যস্ত হইয়াছিল। শুষ্ক হাল্কা বায়ু গ্রহণে ফুস্‌ফুস্‌ও অভ্যস্ত হইয়াছিল। তিব্বতে যে অঞ্চলে আমি ছিলাম, সে স্থানের সমতল ভূমির উচ্চতা সমুদ্র হইতে ১৪।১৫ হাজার ফিট। ইহা অপেক্ষা বহু উচ্চে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। শরীরকে যদি হাল্কা বায়ুর সহিত পরিচিত না করিয়া লইয়া যাইতাম, তাহা হইলে, বোধ হয় রুগ্ন হইয়া পড়িতাম। যদি লিপুলেখ রাস্তা বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে আমি কখনই এত দিন এ স্থানে অবস্থান করিতাম না। তাই মনে মনে ভাবিলাম, শাপ না হইয়া আমার পক্ষে ইহা বর হইয়াছে।

গারবাং, দরর্ম্মা পরগণায়, Byans পট্টির অন্তর্গত। বিয়ানস



নন্দাদেবীর অপর দৃশ্য।

ব্যাস শব্দের অপভ্রংশ। এই স্থানে ব্যাসদেবের আশ্রম ছিল। তাঁহারই নামানুসারে এ প্রদেশের নামকরণ হইয়াছে। গারবাংএর অদূরে পর্ব্বতশিখরে ব্যাসদেবের আশ্রম ছিল। এ দেশের লোক কহিয়া থাকেন, পর্ব্বত বড়ই দুর্গম। কস্তূরীলুব্ধ শীকারীরা সময় সময় তথায় গমন করিয়া থাকে। তাহাদিগের মুখে অবগত হইলাম, উপরের দৃশ্য বড়ই রমণীয়। এ স্থানে একটি নাতিবৃহৎ জলাশয় আছে; এ জন্য এ স্থানটি বড়ই মনোহর হইয়াছে। মানসখণ্ডে কথিত হইয়াছে, ভগবান্ ব্যাসদেব এই অপূর্ব্ব স্থানে অবস্থান করিয়া তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ভুটিয়াদের বিশ্বাস, এখনও এ স্থানে অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন পুরুষরা বাস করিয়া থাকেন। সময় সময় তাহার নিদর্শনও তাহারা পাইয়া থাকে। শীকারীরা বেশ ভক্তি সহকারে এ সকল কথা কহিয়াছিল; এই অপূর্ব্ব পর্ব্বতে উঠিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছিল। উপযুক্ত সঙ্গীর অভাবে আমার এই আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হয় নাই। এ জন্য এখনও আমার আক্ষেপ আছে।

গারবাং গ্রামের প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে সরকারের কয়খানি গৃহ আছে। সরকারী কর্ম্মচারা আগমন করিলে, এই স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। কিছুদিন পূর্ব্বে পোলিটিকেল এজেন্টের এই স্থানে আফিস ছিল। তিব্বতী বাণিজ্যের প্রসারবৃদ্ধি আর বৃটিশপ্রভাব বদ্ধমূল করাই তাঁহার কার্য্য ছিল। তিব্বতীরা কিছুদিন পূর্ব্বেও এ অঞ্চল দখল করিয়া ভুটিয়াদের নিকট হইতে শস্য, গুড়, কাপড় প্রভৃতি আদায় করিত। এখন তাহারা আর এ স্থানে থাকিয়া তাহা আদায় করে না, তাকলাকোটে আদায় করিয়া থাকে। ইংরাজ তাহাকে বাণিজ্য-শুল্ক নাম দিয়া থাকেন। উত্তর-পশ্চিমের দুর্দ্দান্ত সীমান্তবাসীরা যেরূপ ইংরাজরাজ্য আক্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ তিব্বতীরাও আক্রমণ



পতাকা ও স্তূপ।

করিত। সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব জন্য তাহাদের এ ভাব স্থায়ী হয় নাই।

গ্রাম ও ডাকবাংলার মধ্যবর্ত্তী জমীতে বেশ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার পলিমাটী অতীতযুগের জলপ্লাবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। জল থিতাইয়া যে পলি পড়িয়াছিল, তাহার স্তর বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ভিতর হইতে সাগরের শামুক মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। কত শত যুগ অতীত হইল, প্লাবনের জল চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই পলিমাটী তাহা যেন সে দিনের ঘটনা বলিয়া তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সময় সময় আমি এই পলিমাটীর পাহাড় অতিক্রম করিয়া নিম্নে নির্জ্জন শ্মশানের নিকট কালীর তটে প্রস্তরের উপর বসিয়া চকিতহৃদয়ে মহাকালের ক্রীড়ার কথা চিন্তা করিয়া বিমোহিত হইয়াছি। সময় সময় অপূর্ব্ব নৈসর্গিক দৃশ্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছি। এক সময় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়; সূর্য্যের কিরণ তাহার উপর পতিত হইয়া কালীর উভয়তটকে সংযুক্ত করিয়া রাহিয়াছে, এইরূপ দুইটি উজ্জ্বল, নয়ন-রঞ্জন, অদৃষ্টপূর্ব্ব রামধনুর আবির্ভাব হয়। কখন বা কুজ্ঝটিকার সময় দৃষ্টিবিভ্রমকারী দৃশ্য উৎপন্ন হইয়া বিস্ময়াপন্ন করিয়াছিল।

সময় সময় আমি নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। আমরা সমতলবাসী পর্ব্বত আরোহণের আনন্দ কল্পনা করিতে সমর্থ নহি। ইহাতে সমস্ত শরীরের মাংসপেশী সুদৃঢ় হয়, ফুস্ফুস্ বলবান্ হয়। অভাবনীয় বিপদে মানুষ যাহাতে না বিমোহিত হয়, তাহার জন্য ইহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। আমাদের নগাধিরাজ হিমালয়ের কাছে, য়ুরোপের মাউন্ট ব্লাঙ্ক প্রভৃতি পর্ব্বত কঙ্করতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহা অতিক্রমণ করিয়া

য়ুরোপীয়রা "বাহোবাতে" দিক সকল মুখর করিয়া তুলেন। আমাদের দেশের মহিলারা পুরুষ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে হিমালয়ের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া থাকেন। বদরীনাথ অঞ্চলে তীর্থযাত্রীদের মধ্যে স্ত্রী-যাত্রীর সংখ্যা বেশী দেখিয়াছি। আমি যে বৎসর কাশ্মীরের দুর্গম তীর্থ অমরনাথে গমন করি, সে বৎসরও আমাদের বাঙ্গালী মহিলাদের দেখিয়াছিলাম—তাঁহারা অকাতরে হিমালয়ের তুষারভূমি অতিক্রম করিতেছেন। আমার ধারণা, অগ্নিযোগে যাঁহাদের মুখ বিদগ্ধ (অর্থাৎ চা-চুরোট-বিড়ি-সিগারেট প্রভৃতিতে যাঁহাদের মুখ পুড়িয়াছে—কণ্ঠ-নলী দূষিত হইয়াছে, ফুস্‌ফুস্ মলিন হইয়াছে—হৃদয় দুর্ব্বল হইয়াছে, পরিপাকশক্তি হ্রাস হইয়াছে) এরূপ ব্যক্তি যেন হিমালয় আরোহণে না যায়েন। তাঁহারা এ অপূর্ব্ব আনন্দভোগের অধিকারী নহেন।

এইরূপে দিবাভাগ অতিবাহিত করিলেও একস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকার জন্য অবসাদ উপস্থিত হইত। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সিপাহীকে অর্দ্ধেক পথে লইয়া যাইয়া যদি তাহাকে নিষ্ক্রিয়ভাবে রাখা যায়, যদি তাহার সামরিক উত্তেজনা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে সেনাপতি সে সৈন্যের দ্বারা ইচ্ছানুরূপ ফললাভে সমর্থ হয়েন না। আমার পক্ষে প্রায় সেইরূপ হইয়াছিল। এক একবার মনের ভিতর তরঙ্গ আসিত, এ স্থানে এরূপভাবে অলস হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা দেশে প্রত্যাগমন করা ভাল।

একবার মনে হইয়াছিল, নেপালরাজ্যে তিঙ্কর পাস দিয়া তিব্বতে প্রবেশ করি। এ জন্য উদ্যোগও করিয়াছিলাম। ভুটিয়া বন্ধুরা বলি-লেন, এ রাস্তা তত নিরাপদ নহে, একা যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। যে সময় মনের ভাব এইরূপ হইয়াছিল, সেই সময় তিব্বত তাকলাকোট হইতে লিপুলেখ পাস অতিক্রম করিয়া এক সাধু আগমন করেন।

বেচারা সাধু শীতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহার বস্ত্রের অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল। আমার অতিরিক্ত একটা মোটা জামা ছিল; তাহা এক জন সাধুকে দিয়াছিলাম। দিবার মত বস্ত্র ছিল না—কিছু অর্থ দিয়া তাঁহার তুষ্টিসাধন জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাঁহার কাছে অবগত হই, তিব্বতীরা পালাতে অবস্থান করিয়া ঘাঁটি আগলাইতেছে। ২।৫ দিনের মধ্যে ঘাঁটি খুলিয়া দিবে। এই আশ্বাস-বাণী শুনিয়া অনেকটা স্বস্তি আসিয়াছিল।

এই সময় ছংগরু হইতে একটা আহ্বান আসিল। ছংগরুর প্রধানের একমাত্র পুত্র কিছুদিন হইল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। প্রধান মহাশয় শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন—সমস্ত সম্পত্তি তিনি লোকের কল্যাণকর কার্য্যে দান করিবেন, এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি আমার কিছু উপদেশ গ্রহণ জন্য উৎসুক হইয়াছেন। প্রথমে তথায় যাইতে আমি অমত প্রকাশ করিলাম। তাহার পর মনে করিলাম, যদি তাঁহার সম্পত্তির কিয়দংশ রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে দেওয়াইতে পারি, মিশন যদি লইতে সম্মত হইয়া এই স্থানে তাঁহাদের শাখা স্থাপন করেন, তাহা হইলে ভুটিয়াদের মধ্যে পরমহংস দেবের নামের প্রভাব বিস্তার লাভ করিবে, আর কালক্রমে দক্ষিণেশ্বরের দেবতার অপূর্ব্ব বার্ত্তা তিব্বতীদেরও কর্ণগোচর হইবে। রুমা দেবী পথিপ্রদর্শক হইয়া একদিন লইয়া চলিলেন। প্রায় ৩ মাইল পথ চলিয়া কালী অতিক্রম করিয়া ছংগরুতে উপস্থিত হইলাম। প্রধান মহাশয় যথেষ্ট সৌজন্য দেখাইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। আমিও দান-ধর্ম্ম—শরীরের নশ্বরতা প্রভৃতি বিষয়ক নানা প্রকার কথা কহিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহার কিছু ফল দেখিলাম না। আমার মানস-সৌধ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। আসিবার সময় তিনি আমাকে

তিব্বতী চিত্রকরের অঙ্কিত কৈলাসের একখানি চিত্র ও আমার সঙ্গীকে দীর্ঘলোমযুক্ত ২ খানি মৃগচর্ম্ম প্রভৃতি ভক্তিপূর্ব্বক দিয়াছিলেন। তাকলাকোটে ইঁহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল; সে সময় আমাকে তাঁহার গৃহে থাকিবার জন্য যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিলেন।

ছংগরু গ্রামখানি মন্দ নহে—অনেক ব্যবসায়ী ভুটিয়া এই স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। তিঙ্কর নদী ইহার নিকট দিয়া প্রবাহিত। তিঙ্কর পাসের রাস্তাও এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছে। নেপাল-রাজ্যের প্রজারা প্রকাশ্যভাবে অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রধানের বাড়ীতেও অনেকগুলি বন্দুক রহিয়াছে, দেখিলাম। তিনি আমাকে যে মৃগচর্ম্ম দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের মৃগয়ালব্ধ। নিরাশা পরমসুখদ—আমি নৈরাশ্যজনিত পরম সুখ সম্ভোগ করিতে করিতে আবার গারবাংএ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলাম; আর ভাবিতে লাগিলাম, মানুষ একটু অনুকূল সুযোগ পাইলে কতরূপ সঙ্কল্প করে, জাগিয়া কত স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি তীর্থ-যাত্রী, এ সময়ও কুহকিনী আশা আমাকে বেশ ছলনা করিল।

নবম অধ্যায়।

এক দিন আমি এই স্থানের নিকটবর্ত্তী একটি সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্য দেখিবার জন্য গ্রামের ভিতর দিয়া গমন করিতেছিলাম। তখন আমার সঙ্গী একখানি গৃহ দেখাইয়া কহিলেন, "এই ঘরখানিতে 'রামবাং' হইয়া থাকে।" তিনি রামবাংএর অর্থ করিতে সুরু করিয়া কহিলেন, "বিবাহের পূর্ব্বে কিশোর-কিশোরী এই স্থানে রাত্রিকালে মিলিত হইয়া পরস্পর প্রেমালাপ করিয়া থাকে। সায়ংকালে কিশোরীরা অগ্নি আনয়ন করিয়া গৃহের মধ্যস্থলে অগ্নি প্রজ্বালিত করে। তাহার দুই পার্শ্বে পুরুষ ও স্ত্রী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নানা প্রকার গান গাহিয়া থাকে। এই সকল গীতের মধ্যে পুরুষরা 'সখীর মানভঞ্জনের পালা' গান করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকরা উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিয়া নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করে। ইহাতে উভয় দলের নৃত্যও বাদ পড়ে না। ভুটিয়া মদ এই অনুষ্ঠানে স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হইয়া পান করিয়া থাকে। নৃত্য-গীত ও মদ্যপানে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইলে তাহারা তথায় শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইয়া দেয়।

স্ত্রীলোকরা অপর গ্রামের পুরুষদিগকে আহ্বান করিবার জন্য পর্ব্বতের উপর হইতে সাদা কাপড় নাড়িতে থাকে—এ দৃশ্য অনেক দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষরা এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে না, তাহারা সন্ধ্যাকালে আগমন করিয়া ওষ্ঠাধরের উপর অঙ্গুলী দিয়া সীস দিয়া তাহাদের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। এই প্রণয়-যজ্ঞে বালিকা অনুরাগ প্রকাশ করিলে, যুবক

কিছু টাকা অনুরক্তার সখীর হাতে প্রদান করিয়া থাকে। এই অর্থ গৃহীত হইলে বুঝিতে হইবে, প্রণয় পরিণয়ে পরিণত হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। ইহাই প্রথম পর্ব্ব।

এই অনুরাগের কথা বালক-বালিকার অভিভাবকরা অবগত হইয়া মত দিলে ইহাতে আর কোন প্রকার বাধাবিপত্তি উপস্থিত হয় না। অন্যথা যুবকরা বলপূর্ব্বক কন্যাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া পর্ব্বতের কোন নিভৃত স্থানে তাহাদের বন্ধুবরের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করাইয়া থাকে।

অভিভাবক সম্মত থাকিলে কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বরের গৃহে লইয়া যায়। তথায় পানাহারের ব্যবস্থা পূর্ব্বাহ্নেই করা থাকে। আগন্তুককে ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত করা হইয়া থাকে। গ্রামের বৃদ্ধরা এই নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ দিয়া বিবাহ-বন্ধন দৃঢ় করিয়া দেন। গ্রাম্য দেবতার নিকট দম্পতীকে লইয়া যাইয়া নূতন ধ্বজারোহণ করাইয়া দেবতাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে সপ্তাহের অধিককাল উভয় পক্ষ ভোজ দিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। সময় সময় বর-বধূর প্রণয়-সূত্র ছিন্ন হইয়াও যায়। সে সময় বধূ বরের নিকট হইতে শ্বেত বস্ত্র প্রাপ্ত হইলে বুঝিতে হইবে, বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে—আর তাহার চরিত্রে যে কোন দোষ নাই, ইহা সেই শ্বেত বস্ত্র সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে।

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে পুরুষ দ্বিতীয় দার গ্রহণ করিয়া থাকেন। বড়, ছোট সপত্নীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া গৃহের শান্তি রক্ষা করিয়া থাকে, তাহাও শুনিতে পাওয়া যায়। আমি এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে হিমালয়ের সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্য দেখিয়া আর প্রাচীন

কালের আট প্রকার বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ উভয় প্রকার বিবাহের মিলিত রামবাং প্রথার কথার আলোচনা করিতে করিতে প্রত্যাগমন করিলাম।

আমি যে সময় গারবাংএ অবস্থান করিতেছিলাম, সে সময় তথায় এক অপূর্ব্ব উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ইহার নাম ডুডুং। ভুটিয়াদের ইহা শ্রাদ্ধ-উৎসব। এ সময় অনেক ভুটিয়ার বাড়ীতে ডুডুং উৎসব হইয়াছিল। আমার ভুটিয়া সঙ্গী আমাকে কয়টি বাড়ীতে লইয়া যাইয়া এই উৎসব দেখাইয়াছিলেন। কর্ম্মবাড়ীতে যাইয়া দেখিলাম, বহু ভুটিয়া নর-নারী উৎসব দেখিতে আসিয়াছেন। বিদেশী বলিয়া আমি সাদরে গৃহীত হইলাম। দেখিলাম, একটি ঘরে খুব ভিড়—সেই জনতা সরাইয়া দিয়া আমার ভাল করিয়া দেখিবার ব্যবস্থা করা হইল। দেখিলাম, এক, দুই বা ততোঽধিক স্ত্রী বা পুরুষ কল্পনা করা হইয়াছে। পরিবারের মধ্যে যে কয় জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং যাঁহাদের ডুডুং বা সপিণ্ডকরণ হয় নাই, তাঁহাদের শরীর কল্পনা করা হয়। পুরুষ বা স্ত্রী হইলে তাহাদের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি দিয়া সজ্জিত করা হইয়া থাকে। সেই দণ্ডায়মান মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে তাহাদের ব্যবহৃত দ্রব্য সকল সাজাইয়া রাখা হয়। ঘটি, বাটি, বস্ত্র, আভরণ, পাদুকা, পুরুষ হইলে অস্ত্র-শস্ত্র, অশ্বারোহী হইলে ঘোড়ার জিন প্রভৃতিও রাখিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। দেখিতে যেন কৌতুকাগার-প্রদর্শনী। ভুটিয়ারা নিত্যনৈমিত্তিক যাহা যাহা ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই সকল দ্রব্য এক স্থানে দেখিবার এই সুযোগ আমি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এ সকল দ্রব্য ব্যতীত তথায় পুঞ্জীকৃত ধৈও দেখিয়াছিলাম। পুরোহিত মহাশয় মৃত ব্যক্তির সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করিয়া

থাকেন—ভূতযোনি হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। দরিদ্র ব্যক্তিরা এই সপিণ্ডকরণ করিতে না পারিলে, চিহ্নবিশেষ ধারণ করিয়া থাকেন এবং সময় হইলে ডুডুং সম্পন্ন করিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন।

যে সকল বাড়ীতে ডুডুং দেখিতে গিয়াছিলাম, সকল বাড়ীর আঙ্গিনাতে মেষ বাঁধা দেখিয়াছিলাম। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়রা সেই মেষকে নানা প্রকার দ্রব্য ভোজনের জন্য প্রদান করিতেছে। বহুভোজনে মেষের অগ্নিমান্দ্য হইলেও বলপূর্ব্বক তাহার মুখে খাদ্যদ্রব্য প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। মৃত ব্যক্তির প্রিয় খাদ্য দূর প্রদেশ হইতে ডাকে আনাইয়া মেষকে খাওয়ান হইয়া থাকে।

এই উৎসবের কয়েক দিন পরে গ্রামবাসী পুরুষদের অসিনৃত্য—অদ্ভুত ব্যাপার। পুরুষরা সম্ভবতঃ মদ্যপান করিয়া এই তাণ্ডব-নৃত্যের অভিনয় করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধবাড়ীতে এই নৃত্যের অভিনয়টা একটু যেন অধিক মাত্রায় হইয়া থাকে। অনেকে অসিচালনায় বেশ নৈপুণ্য দেখাইয়া থাকে। দলবদ্ধ হইয়া ইহারা যখন গমন করিতে লাগিল, তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন যুদ্ধবিজয়ী বীরসকল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন, আর গ্রামবাসীরা তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করিতেছেন।

যে মেষকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল, যাহাকে আত্মীয় বিবেচনায় কত সেবা-শুশ্রূষা করা হইয়াছিল, শেষে তাহাকে গ্রাম হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। যাহাতে সে পুনরায় গ্রামমধ্যে প্রবেশ না করে, সেই জন্য তাহাকে পাহাড়ের জঙ্গলে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। মেষকে তাড়ানর পর তিব্বতীরা সেই ভেড়া ধরিয়া আনিয়া হত্যা করিয়া থাকে।

এইরূপে দুই এক দিন বেশ কাটিয়া গেল—দিন আর কাটে না। কখন স্কুলে যাইয়া ছেলেদের কিছু কিছু পড়াই; তাহাদিগকে ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু উপদেশ প্রদান করি; কখন বা স্কুলের নিকট বৃত্তাকার চত্বরে—যখন গ্রামবাসীরা সমবেত হইয়া পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে—সেই স্থানে অন্যান্য দেশের সহিত আমাদের দেশের তুলনা—আমাদের দেশের প্রাচীন কালে কিরূপ অবস্থা ছিল ইত্যাদি তাহাদিগকে বলিয়া সময় যাপন করি।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। প্রতিদিন প্রথম রাত্রিতে এক জন লোক উচ্চৈঃস্বরে কিছু কহিতে কহিতে গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমন করিয়া থাকে। লোকটির স্বর বেশ গম্ভীর ও উচ্চ, সম্ভবতঃ এই গুণের জন্য লোকটি এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলাম, লোকটি কোন নূতন সংবাদ থাকিলে তাহা গ্রামবাসীর কর্ণগোচর করিয়া থাকে। রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে "গ্রামঘোষের" নাম আমরা অবগত হই। প্রাচীন কালের গ্রামঘোষের কার্য্য এই ব্যক্তি করিয়া থাকে। যে সময় সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল না, সে সময় গ্রামবাসীকে বাহিরের সংবাদের সহিত পরিচিত করাইবার পক্ষে ইহা মন্দ উপায় নহে। ইহাতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই দেশের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত পরিচিত থাকেন। আর সেই সংবাদের সদ্ব্যবহার করিবার পক্ষেও তাঁহারা সময় পাইয়া থাকেন। জ্ঞানই শক্তি, আর শক্তিশালীই সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করিয়া থাকেন। অজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বত্র ধর্ষিত, প্রপীড়িত ও প্রতারিত হইয়া থাকে। আমরাই তাহার উত্তম উদাহরণ।

এ দেশের অধিবাসীর অনেককে বিদেশীদের মধ্যে সেভেজ

লেণ্ডোর (Mr. A. Henry Savage Landor) মহাশয়ের নাম সম্ভ্রমের সহিত স্মরণ করিতে দেখিয়াছি। ভারতে ইংরাজ সরকারের কোন কোন কর্ম্মচারী তাঁহার গমনপথে বহুবিধ বাধা প্রদান করিলেও, তাঁহার বিষয়ে নানা প্রকার অলীক কথা প্রচার করিলেও ভুটিয়ারা কিন্তু তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তিনি ভুটিয়াদের সহিত মিলিত হইতেন, তাহাদের দুঃখের কথা অবগত হইতেন, সময় সময় তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। অপর পক্ষে এরূপ উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীর কথা আমরা অবগত হইয়াছি, যিনি তিব্বতীদের সহিত একরূপ ব্যবহার করিতেন, আর জগতে প্রচার করিতেন অন্যরূপ! ইহাই কি প্রতীচীর সুসভ্য ডিপ্লোমেসী ?

যে সকল কুলী তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে এক জনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে তাঁহার অধ্যবসায়, দৃঢ়তা, নির্ভীকতা ও সমদর্শিতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া তাঁহার ভ্রমণকাহিনী বিবৃত করিয়াছিল। সমদর্শিতার দ্বারা যেরূপ হৃদয় জয় করা যায়, সেরূপ আর কোন উপায়ে হয় না। হিমালয়ের এই নিভৃত প্রদেশে ইংরাজচরিত্রের মহিমা তিনি যেরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেরূপ মহিমা অসির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না!

আমার আবাসস্থানের নিকট এক ঘর তিব্বতী বাস করিত। বহুদিন হইলে, সে তিব্বত পরিত্যাগ করিয়া এই দেশবাসী হইয়াছে। এক দিন দেখিলাম, সে চর্ম্মসংস্কার করিতেছে—শক্ত চামড়াকে পিটিয়া পিটিয়া তাহার ভিতর এক প্রকার মাটী দিয়া পুঁটলির মত করিয়া পদদ্বারা দলিত করিতেছে। তাহার এই কার্য্য দেখিয়া আমার চর্ম্মখানি নরম করিবার জন্য তাহাকে প্রদান করিলাম।

সে উক্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা অল্পসময়ের মধ্যে সেখানি বেশ নরম করিয়া দিল। ইহার পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ মোটে একটি সিকি প্রদান করিয়াছিলাম; সে তাহাতেই প্রীত হইয়াছিল। আমাদের দেশে চর্ম্মকাররা কত রকম মসলা খরচ করিয়া চর্ম্ম কোমল করিয়া থাকে, আর এ স্থানে সামান্য মৃত্তিকা ও পরিশ্রমে কেমন সুন্দর ফল পাওয়া গেল!

হিমালয়ে কতরূপ যে বনৌষধি আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা সে সকলের গুণের সহিত পরিচিত নহি। তাপস যুবকের দল যখন এই সকল দ্রব্যের গুণগ্রাম অবগত হইবার জন্য একাগ্রতার সহিত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে, তখন তাহারা চিকিৎসাবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে যুগান্তর প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে। এ অঞ্চলে এক প্রকার তৃণ জন্মায়, তাহা সাবানের কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাতে বস্ত্র বেশ পরিষ্কৃত করা যায়। কত প্রকার ফলের তৈলপূর্ণ বীজ অব্যবহারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সেই বীজ হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে তৈল উৎপন্ন হইতে পারে। হিমালয়ের সর্ব্বত্র জল হইতে প্রচুর পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা যাইতে পারে। আমাদের অধ্যবসায় ও দূরদর্শিতার অভাবে এই অপূর্ব্ব শক্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। দেবাদিদেব মহাদেব হিমালয়ের অধীশ্বর। এই জন্যই বোধ হয় চক্ষুষ্মান্ ভক্ত বলিয়াছেন,—"শিবই দারিদ্র্যদুঃখদহনে" সমর্থ। যিনি হিমালয়ের সহিত পরিচিত—যিনি এ স্থানের দ্রব্যের গুণের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তিনি কখনও দারিদ্র্যদুঃখে নিপীড়িত হইতে পারেন না।

এ অঞ্চলের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বড় কম নহে—শস্যও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ভুটিয়ারা সেই শস্য ভূগর্ভে ভূর্জ্জবল্কলের

আবরণ দিয়া রাখিয়া দেয়। ইহার মধ্যে শস্য বেশ ভাল থাকে। গ্রীষ্মসমাগমের সহিত সেই শস্য তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে।

এ অঞ্চলে বৃষ্টি বড় বেশী হয় না। 'মনস্থন' অর্থাৎ বর্ষা এ প্রদেশে আসিবার পূর্ব্বেই তাহার জল নিঃশেষ হইয়া যায়, উচ্চ পর্ব্বতমালা তাহার আগমনপথে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং বেশী বৃষ্টি হয় না। যখন নিম্নভূমিতে বৃষ্টি বা বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়, তখন সেই দৃশ্য এই উচ্চ ভূমি হইতে দেখিতে মন্দ হয় না। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য—মেঘপুঞ্জে তড়িৎ-প্রকাশ বহুবার দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি।

এ দেশে বৃষ্টি যে খুব কম হয়, ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বৃষ্টির স্বল্পতার জন্য ভূমি শুষ্ক থাকে। এ দেশে যে শস্য উৎপন্ন হয়, ভুটিয়ারা তাহা তাহাদের শীতাবাসে লইয়া না যাইয়া এই স্থানে ভূগর্ভে রাখিয়া থাকে। গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে ভূর্জ্জ-বল্কলে আবরণ বিন্যস্ত করিয়া শস্য রাখিলে আর্দ্রতা ও মূষিকাদি হইতে রক্ষিত হয়। শীতকালে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলে চোরও ইহার সন্ধান বড় শীঘ্র জানিতে পারে না।

শীতকালে যখন ভুটিয়ারা চলিয়া যায়, তখন ২।৪ জন ভুটিয়া এই স্থানে থাকিয়া গ্রাম রক্ষা করিয়া থাকে। সে সময় এ প্রদেশ বরফে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, রাস্তাঘাট সব বন্ধ হয়, গমনাগমনের রাস্তাও থাকে না। এরূপ দুর্গম অবস্থাতে একবার কয়েক জন চোর আসিয়া ভুটিয়াদের বহুমূল্য দ্রব্য অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। এই ঘটনার পর হইতে তাহারা সতর্ক হয়। চোরের আক্রমণ হইতে গারবাং রক্ষা করিবার জন্য কয় জন লোক এই স্থানে অবস্থান করে।

এক দিন এক জন তিব্বতী ৫০৷৬০টা ভেড়া লইয়া গারবাংএ উপস্থিত হইল। এ স্থানের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া যেন তাহারা অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পাছে মেষ রুগ্ন হয়, এই ভয়ে তিব্বতীরা গারবাংএর নিম্নে গমন করে না। তিব্বতী লোম-বিক্রয়ের জন্য আসিয়াছে, এক একটা ভেড়াতে প্রায় ২ সের ২৷৷০ সের লোম পাওয়া যায়। কেশকর্ত্তনের পালা সুরু হইল; ৩৷৪ জন লোক মেষের লোম কাটিতে আরম্ভ করিল, যাহাদের চুলকাটা হইল, সে ভেড়ারা যেন গ্রীষ্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

মেষের আগমনে আমিও যেন বিপুল ভার হইতে মুক্তিলাভ করিলাম। তিব্বতীর আগমনে আমরা বুঝিলাম, লিপুলেখের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে; আমাদের গমনপথ অনর্গল হইয়াছে। যাইবার জন্য "সাজ" "সাজ" সাড়া পড়িয়া গেল। তিব্বতের জন্য আবশ্যক দ্রব্যসংগ্রহে ব্যস্ত হওয়া গেল। এবার বোঝা আর কুলীর পৃষ্ঠে যাইবে না, এ জন্য একটা ঝব্বু সংগ্রহ করা গেল। চামরী গাই আর বৃষের সহযোগে ঝব্বুর জন্ম। ইহা খুব ক্লেশসহিষ্ণু আর পর্ব্বত আরোহণে অভ্যস্ত; ইহার পদ-স্খলন প্রায় হয় না। মহা বৃষভবাহনের দেশে ঝব্বুর সাহায্য না পাইলে এই দুর্গম পথ অধিকতর দুর্গম হইত।

এ দেশে একটা চলতি কথা আছে যে, গয়াতে গমন করিতে হইলে টাকার দরকার, আর মানসে যাইতে হইলে ছাতুর প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই প্রবাদ অনুসারে কিছু ছাতু আর গুড় সংগ্রহ করা গেল। মনে করিয়াছিলাম, বেশী করিয়া ছাতু লইয়া যাইব—সাধু, সন্ন্যাসী, লামাদিগকে দেওয়া যাইবে। ঝব্বুওয়ালা বেশী লইতে আপত্তি করিল; সুতরাং বেশী লওয়া হইল না।



ভারবাহী ঝব্বু।

বোঝার জন্ম ঝব্ব, আর আমার নিজের জন্ম একটি ভুটিয়া ঘোড়া ভাড়া করা গেল। এবারের রাস্তা বিকট না হইলেও উন্নত প্রদেশ দিয়া গমন করিতে হইবে—বায়ু অত্যন্ত রুক্ষ ও পাতলা, অল্প পরিশ্রমে শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হয়, এ জন্য ঘোড়া সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ৮ই জুলাই আমার সমস্ত দ্রব্য সংগৃহীত হইল। ৯ই এ স্থান হইতে যাত্রা করিবার জন্ম প্রস্তুত হইলাম।

দশম অধ্যায়

৯ই জুলাই প্রাতঃকালে ভোজনাদি করিয়া গারবাং হইতে গমন করিবার জন্ম প্রস্তুত হওয়া গেল। ঘোড়ার কায না থাকিলে ভুটিয়ারা ঘোড়া জঙ্গলে চরিবার জন্ম ছাড়িয়া দেয়। জঙ্গল হইতে ঘোড়া খুঁজিয়া আনিতে বিলম্ব হওয়াতে একটু অধীর হইলাম। খুঁজিয়া যদি আনিতে না পারে, তাহা হইলে ত আবার এক দিন বিলম্ব হইবে ; এই চিন্তায় অধীর হইয়াছিলাম। কিছুক্ষণ পরে ঘোড়া আসিল। আমার অভীষ্ট স্থানে গমন করিতে আর অযথা বিলম্ব হইবে না, মনে করিয়া আনন্দিত হইলাম। ছেলেবেলা মা'র মুখে শুনিতাম, "অমুককে জগন্নাথ টেনেছে। সে ছেলে-মেয়ে ফেলে প্রভুর চাঁদমুখ দেখ্‌তে গিয়েছে।" আমিও কৈলাসের "টানে" ছুটিতেছি ; বিলম্ব ভাল লাগে না। কখন্ কৈলাস দেখিয়া কৃতার্থ হইব, ইহাই আমার সে সময়ের ধ্যান-ধারণার বিষয়।

ঘোড়ায় চড়িয়া, স্কুলের পাশ দিয়া রাস্তা যখন অতিক্রম করি, সে সময় মাষ্টার মহাশয় আসিয়া কুশলকামনা করিয়া আমাকে বিদায়

দিলেন। আর বিদায় দিল, পাঠশালার বালক-বালিকারা। তাহাদের অমায়িক দৃষ্টি—স্মিত-বদন—আর করযোড়ে অভিবাদন আমার চক্ষুর সম্মুখে যেন এখনও বিরাজিত রহিয়াছে। ছোট ছোট বালক-বালিকাকে আমি বড় ভালবাসি। তাহাদিগকে দেখিলে আমার মনে কোনরূপ ভেদ-বুদ্ধি উপস্থিত হয় না। আমার এইরূপ ধারণা, যদি কেহ শ্রীভগবানের কমনীয় রূপের কণামাত্র দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন মুক্তদৃষ্টিতে শিশুর মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করেন। এইরূপ, ঐশ্বরিক গন্ধও শিশুর গাত্র হইতে বহির্গত হইয়া থাকে। যাযাবরদিগের মধ্যে এ ভাব থাকিলে তিনি সর্ব্বত্র আনন্দ ও জনসাধারণের সহানুভূতিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

কালীর তট দিয়া গমন করিতে লাগিলাম। কখন বা নেপাল, কখন বা ইংরাজরাজ্য দিয়া গমন করিতে হইয়াছিল। এখন বৃক্ষের মধ্যে হিমালয়ের দেবদারুর সংখ্যাই অধিক। সময় সময় এই দেবদারু-বনের মধ্য দিয়া পরম আনন্দে গমন করিতে লাগিলাম। এই রাস্তায় স্থানে স্থানে যেরূপ নয়নরঞ্জন দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, সেরূপ অন্যত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। স্থানে স্থানে পুষ্পিত ক্ষেত্র সকল দেখা গেল, তাহারা বনের বৈচিত্র্য আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। সেই তুলনারহিত নিস্তব্ধতা, হৃদয়মধ্যে এক প্রকার অপূর্ব্ব ভাব আনয়ন করিয়া থাকে।

রাস্তায়, গুঞ্জী ও কুটী যাইবার রাস্তা অতিক্রম করা গেল। স্থানে স্থানে ২।১টি তিব্বতী শিলালেখও দেখিতে পাইয়াছিলাম। কালাপাণিতে বৃক্ষ বড় নাই, এ জন্য কুলীরা শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে লাগিল। কালাপাণিতে কাষ্ঠের যেমন অভাব, শীতের প্রতাপও তেমনই অধিক। বনস্পতিরাজ্য অতিক্রম করিয়া এখন তুষার-রাজ্যমধ্যে

প্রবেশ করা গেল। এই কালাপাণি পর্য্যন্ত ভুটিয়ারা চাষ-আবাদ করিয়া থাকে। কালাপাণিতে অপরাহ্নে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে ২।১টি ক্ষুদ্র পান্থনিবাস আছে, আর একটু অগ্রে রায় সাহেব গোবরিয়া পাণ্ডিতের একখানি বাংলা আছে। ইনি এক জন ব্যবসায়ী ভুটিয়া, তিব্বতীদের কাছে ইঁহার বহু সম্মান থাকায়, ইংরাজ সরকার ইঁহার দ্বারা তিব্বতীদের নিকট অনেক কার্য্য হাসিল করিয়া থাকেন। নেপালদরবারেও ইঁহার প্রতিষ্ঠা বড় কম নহে। ইঁহার নামে আমার একখানি পরিচয়পত্র ছিল। শুনিলাম, তিনি নেপালে অবস্থান করিতেছেন। আমি আর তাঁহার বাড়ীতে গেলাম না, পান্থশালায় রাত্রিবাসের আয়োজন করিতে লাগিলাম। সর্ব্বত্রই ধর্ম্মশালা আবর্জ্জনাপরিপূর্ণ থাকে, ইহাতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আমার কুলীরা গৃহ পরিষ্কার ও অগ্নি প্রজ্বালিত করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। আমার এই সায়ংগৃহের অনতিদূরে একটি পার্ব্বত্য নদী প্রবলবেগে বড় বড় পাষাণখণ্ডকে পদাঘাত করিতে করিতে গমন করিতেছে। আমি ইহার তটে একটি বৃহৎ শিলার উপর উপবেশন করিয়া ভীতিপ্রদ নির্জ্জনতা উপভোগ করিতে লাগিলাম। আমি যখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উপবেশন করিয়া কিছু লিখিতেছিলাম, তখন এক জন সাধু জলপান করিতে আসিয়া একটি হিন্দী দোঁহা আবৃত্তি করিলেন। আমি চকিত হইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। তিনি সহাস্যবদনে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে আমার সঙ্গে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলাম; তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া অগ্রে গমন করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। তাঁহাকে পুনরায় দেখিবার জন্য অনেক দিন ইচ্ছা করিয়াছিলাম। সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার অপূর্ব্ব মিলন ও বিয়োগ অনেককাল স্মরণ

থাকিবে। আর স্মরণ থাকিবে, সেই সুন্দর দোঁহা। হিমালয়ের এই অপূর্ব্ব স্থানে দোঁহাটি পাইয়াছিলাম বলিয়া, বোধ হয়, এত ভাল লাগিয়াছিল। দোঁহাটি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

চরণ ধরত কম্পতে হিয়ো
ন হি শোহাবত সোর।
সুবর্ণ কো ঢুঁড়ত ফিরে,
কবি কামী ঔর চোর ॥

যে কবি—কামী ও চোর সুবর্ণ খুঁজিয়া বেড়ান, তাঁহাদের পদন্যাস করিতে হৃদয় কম্পিত হয়, কোলাহল হইতে তাঁহারা দূরে অবস্থান করিয়া থাকেন। সুবর্ণ অর্থাৎ সুন্দর শব্দ, ধন ও কামিনী।

আরও কিছুক্ষণ নদীর ধারে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম। ধর্ম্মশালার পার্শ্বেই এক ঘর ভুটিয়া থাকে। গৃহস্বামী এক বাঙ্গালী সাধুর কথা দুঃখের সহিত কহিতে লাগিল। প্রথম বাঙ্গালী, তাহার পর সাধু, এ জন্য কথাটা একটু আগ্রহের সহিত শুনিতে লাগিলাম। সে কহিল, কয়েক বৎসর অতীত হইল, এক জন বাঙ্গালী সাধু যখন এই স্থানে আইসেন, সে সময় তাঁহার বোঝা কালীতে পড়িয়া যায়। সাধু বোঝার জন্য বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। বোঝা উদ্ধার করিয়া দিতে পারিলে, তিনি যথেষ্ট অর্থ পুরস্কার প্রদান করিবেন, এই বলিয়া তিনি নিকটের লোকদিগকে উৎসাহিত করিতে থাকেন। তাঁহার কথার কোন ফল ফলে নাই। সাধুমহাশয় দুঃখিত হইয়া গমন করেন। ভগবানের কৃপায় এ পর্য্যন্ত আমার এরূপ কোন বিপদ উপস্থিত হয় নাই।

অনেকে ভ্রমক্রমে এই স্থানকে কালীর উৎপত্তিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অনেকে এ স্থানে স্নানাদি তীর্থকৃত্যও করিয়া থাকেন।

মোটা মোটা পরেটা ভোজন করা গেল। খানকতক পরদিবসের জন্যও রাখা গেল। এ দিন হাঁটিতে হইবে অনেক, এ জন্য ভোজ্য-দ্রব্য কিছু সঙ্গে লইবার ব্যবস্থা করিলাম।

এই নির্জ্জন স্থানে কোন জীব-জন্তু দেখিতে পাইলাম না সত্য বটে; কিন্তু পিশুমহাশয়ের উপদ্রবের নিবৃত্তি নাই। প্রথম প্রথম বড়ই বিরক্তিকর হইল। ক্ষুদ্র গৃহ ধূমপরিপূর্ণ হওয়াতে চক্ষুর্দ্বয়ে জ্বালা উপস্থিত হইল, সমস্ত শরীর পিশুব্যাপ্ত হওয়াতে বড়ই কষ্টানুভব হইল। শরীর হইতে মনকে সরাইয়া লইয়া এক বিষয়ে নিবদ্ধ করিলাম। শরীর শ্রান্ত ছিল, নিদ্রাদেবী দয়া করিয়া পার্থিব সুখ ও দুঃখ সব ভুলাইয়া দিলেন।

গারবাংএ ভুটিয়া বন্ধুরা উপদেশ দিয়াছিলেন, লিপুলেখ যত সকাল সকাল অতিক্রম করিতে পারিবেন, তুষারপাত, জল, ঝড় প্রভৃতি বিপদ্‌সম্ভাবনা ততই কম হইবে। প্রতিদিন মধ্যাহ্নকাল হইতে দেব-দানবের যুদ্ধের ন্যায় জল-ঝড় আরম্ভ হইয়া থাকে। সে সময় পথিক এ স্থানে উপস্থিত হইলে বিপন্ন হয়, সময় সময় তাহার প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

অতি প্রত্যূষে কালাপাণি পরিত্যাগ করিলাম। আজ হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতে উপস্থিত হইব, এই চিন্তা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, কোন স্থানে কোনরূপ বনস্পতির চিহ্নমাত্র নাই। ভূমিসহ মিলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ, তাহাতে নানা বর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত। এই সকল দেখিতে দেখিতে অল্প অল্প উপরে উঠিতে লাগিলাম। ইতঃপূর্ব্বে যেরূপ কঠোর চড়াই চড়িয়াছিলাম, এখন সেরূপ চড়াই নাই। অল্প অল্প চড়াই চড়িয়া সঙ্গচান নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে কোন লোকালয় নাই, স্থান

নির্দ্দেশ করিবার জন্য স্থানে স্থানে প্রস্তরখণ্ড সাজান আছে, লিপুলেখ অতিক্রম করিয়া আর অগ্রসর হইতে না পারায়, মেষাদি পশুসহ এই স্থানে যাহারা অবস্থান করিয়াছিল, তাহাদের আবর্জ্জনা সকল সঙ্গচানের নাম পথিকগণকে জ্ঞাপন করিতেছে। সমুদ্র হইতে সঙ্গচান প্রায় ১৫ হাজার ফিট উপরে।

সঙ্গচান অতিক্রম করিয়া, যে জলধারা লিপুলেখ হইতে উৎপন্ন হইয়া কালীর সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার তট দিয়া গমন করিতে লাগিলাম। কিছু দূর যাইবার পর দেখিলাম, ঝব্বুর পৃষ্ঠে আমার যে বোঝা ছিল, তাহার একদিক্ ঝুলিয়া পাথরের সহিত ঘর্ষণ করিতে করিতে ঝব্বু যাইতেছে। ঝব্বুর সঙ্গের যে লোক ছিল, সে অনেক দূরে পিছনে ছিল—তাহার কোন সাড়া-শব্দ না পাওয়াতে ঘোড়া হাঁকাইয়া ঝব্বু ধরিবার জন্য গমন করিলাম। ইহাতে বিপরীত ফল ফলিল—ঝব্বু স্বল্পতোয়া নদী পার হইয়া একটা উচ্চ স্থানে গিয়া তৃণ ভক্ষণ করিতে লাগিল। আমার অনেক ডাকাডাকির পর ঝব্বুর লোক আসিয়া অনেক কষ্টে তাহাকে ধরিল। তখন বোঝা ভাল করিয়া বাঁধিয়া ঝব্বুর পৃষ্ঠে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। পাহাড়ের ঘেঁসড়ানিতে সতরঞ্চির স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। আর বিশেষ কিছু লোকসান হয় নাই। আমার কৈলাস-যাত্রার সঙ্গী সতরঞ্চিখানি যখনই দেখি, তখনই লিপুলেখে তাহার যে দশা-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়।

এখানকার দৃশ্য হৃদয় অদ্ভুতরসে পরিপূর্ণ করে। এ প্রদেশে কোন জীবজন্তুর চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। চতুর্দ্দিকে তুষার আর কঠিনতম প্রস্তর। তুষারের প্রভাবে শিলা সকলও যেন দগ্ধ হইয়াছে, জীবনীশক্তি হারাইয়াছে। ইহাতে কোমলতার

নামমাত্রও নাই। উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ সকল যেন গর্ব্বোন্নত মস্তকে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছে। কত যুগ ধরিয়া এই উন্নত মস্তককে অবনত করিবার জন্য কত শত কুলিশপাত ইহার উপর হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা যদি কোমল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে বহুদিন পূর্ব্বেই পড়িয়া গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। কত আলোড়ন, কত উত্তাপ, কত আকুঞ্চন সহন করিয়া হিমালয় এই উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা আমরা উপর উপর দেখিয়া সে কথা ভুলিয়া গিয়া বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়ি। ব্যক্তিগত বা জাতিগত উন্নতিও হিমালয়ের অনুরূপ। তপস্যা-বিমুখ, অধ্যবসায়বিহীন, কাতরতাপূর্ণ ব্যক্তি বা জাতি দুইটা ফাঁকা কথা কহিয়া বা জ্যাটামি করিয়া স্থায়িরূপে উচ্চস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয় না, যদি বা কিয়ৎকালের জন্য সমর্থ হয়, তবে নিদাঘের সূর্য্যকিরণস্পর্শে তুষার যেরূপ বিগলিত হয়, বহু নিম্নে সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, পরে নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারায়, সেই জাতি বা পুরুষের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া থাকে।

এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা-তরঙ্গ আসিয়া আমাকে আকুলিত করিয়া দিল। যাউক্ সে সব কথা। ধীরে ধীরে যত আমরা উপরে উঠিতে লাগিলাম, ততই আমাদের মধ্যে একটা অসুখের ভাব আসিতে লাগিল। আমার ঘোড়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল—সঙ্গের লোকেরা অবসন্ন ও শিরঃপীড়ায় অভিভূত হইল, যেন চলচ্ছক্তি লোপ পাইতে লাগিল। ভুটিয়া সহিস কহিল, নিকটে অত্যন্ত বিষাক্ত উদ্ভিদ্ আছে। সেই উদ্ভিদ্ সহ মিলিত বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাস প্রবেশের ফলে আমাদের এই দশা হইয়াছে।

সরল বিশ্বাসী ভুটিয়া পর্ব্বত-পীড়ার এইরূপ কৈফিয়ৎ দিয়া নিবৃত্ত



নিপুর তুষার দৃশ্য।

হইল। সমুদ্রে যেরূপ সমুদ্র-পীড়া আরোহীকে বিবশ করিয়া ফেলে, এই পর্ব্বত পীড়াও সেইরূপ যাত্রীকে শিরঃপীড়ায় অবসন্ন করিয়া ফেলে। উচ্চ হইতে অবতরণই ইহার প্রতীকারের একমাত্র ঔষধ। ভগবৎকৃপায় আমাকে এই ক্লেশদায়ক পর্ব্বত-পীড়া আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যভাগে বিশাল তুষারক্ষেত্র—ইহাকে দক্ষিণভাগে রাখিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিলাম। যতই উপরে উঠা গেল, আমার সঙ্গের লোকরা পর্ব্বত-পীড়ায় ততই বিবশ হইতে লাগিল—শ্বাসকৃচ্ছ্রতা আসিয়া শ্বাসরোধে সহায়তা করিতে লাগিল। ঘোড়ার কষ্ট দেখিয়া আমি পদব্রজে তুষারক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। স্থানে স্থানে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করা গেল। চতুর্দ্দিকে তৃণশূন্য তুষারাচ্ছাদিত পর্ব্বতমালা বিরাটপুরুষের ন্যায় দাঁড়াইয়া অতীত যুগের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—দেখিতে লাগিলাম। লিপুলেখ গিরি-বর্ত্ম, শ্রান্ত আমাদের কাছে যত নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, বাস্তবিকপক্ষে ততটা নিকট ছিল না; বায়ুমণ্ডল দৃষ্টিবিভ্রম জন্মাইয়া প্রতারণা করিতে লাগিল।

বহু ক্লেশ, বহু পীড়ার পর যখন পর্ব্বতের উপর উঠিলাম, তখন বোধ হইল, যেন এক কুহকীর রাজ্যে উপস্থিত হওয়া গিয়াছে। বহুদূরের দৃশ্যকে নিকটবর্ত্তী করিয়া, অস্পষ্ট রেখাকে স্পষ্ট করিয়া, কিয়ৎকাল সূর্য্য-কিরণে দিক্ সকল উদ্ভাসিত করিয়া, কখন বা ঘোর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছাদিত করিয়া ঐন্দ্রজালিকপ্রবর যেন আপন মনে ক্রীড়া করিতেছেন! নানাবর্ণে রঞ্জিত তিব্বতের তৃণবিহীন পর্ব্বতমালা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিক-হৃদয়ে অলৌকিক আনন্দ প্রদান করিতেছে। উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয়ে যখন তিব্বতের



লিপুলেখের নির্জ্জন রাস্তা।

দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত করি, সূর্য্যকরোজ্জ্বল গরলামান্ধাতা, গৈরিকাদি রঙ্গে রঞ্জিত শৈলশ্রেণী যখন প্রথম দর্শন করি, তখন বোধ হইল, নিপুণ কুহকী ব্যতীত এই মনোমুগ্ধকর চিত্র অঙ্কনে অন্য কেহ অধিকারী নহেন। মানুষের তুলিকা বা শব্দ এই অব্যক্ত বিষয়কে ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে।

তিব্বত দেখিয়া একবার চকিতহৃদয়ে, অনিমেষনয়নে ভারতের দিকে চাহিলাম। সমুদ্রে যেরূপ প্রবল ঝড়ের সময় উত্তাল তরঙ্গমালা ব্যাপ্ত থাকে—সেই তরল তরঙ্গ পোতযাত্রীর হৃদয় ভয়ে অভিভূত করিয়া থাকে; সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় এই বিশাল শৈলমালা হৃদয়কে অভিভূত করিল। যিনি ইহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বোধ হইল, হিমালয় যেন আমন্ত্রণ করিতেছেন; আর কহিতেছেন, বৎসরের অধিকাংশ সময় আমার বক্ষ দিয়া উল্লঙ্ঘন করিতে পথ প্রদান করিব। ক্লেশসহ হও, উদ্যোগী হও, অসাধারণ হও, তাহা হইলে কুবেরের রত্নাগারের দ্বার অনর্গল হইবে।

ভারতের সুদূর দক্ষিণ সীমায় কন্যা কুমারিকায় মাতৃতীর্থে উপবেশন করিয়া যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহার তুলনাও আর নাই। কিন্তু সে তরল-তরঙ্গ-দৃশ্য যেন স্ত্রীত্বব্যঞ্জক, তাহার কঠোরতার ভিতর কোমলতা আছে,—তাহার বিশালতার ভিতর সঙ্কীর্ণতা আছে—তাহা অপার হইলেও পার প্রদান করিয়া থাকে।

লিপুলেখের উপর উঠিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। ভুটিয়া ভক্তরা চোকদান প্রস্তর-স্তূপ প্রস্তুত করিয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ অনেকগুলি রহিয়াছে দেখিলাম। কোন ভক্ত রজ্জুতে বস্ত্রখণ্ড গ্রথিত করিয়া পথের দুই পার্শ্বে বাঁধিয়া মালা পরাইয়া

দিয়াছে। সমুদ্র হইতে লিপুলেখের উচ্চতা প্রায় ১৬ হাজার ৭ শত ৮০ ফুট হইবে। নেপাল-যুদ্ধের পর ভাগ্যবান্ ইংরাজ এই সুগম রাস্তা অধিকার করিয়াছেন। যখন এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিতেছিলাম, তখন আমার ভুটিয়া সঙ্গী বলিল, "এ স্থানে বেশী বিলম্ব করা সঙ্গত নহে। যে কোন সময় জল-ঝড় ও তুষারপাত হইতে পারে। তখন ইহা অত্যন্ত বিপদ্‌পূর্ণ হইয়া উঠিবে, অতএব শীঘ্র গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হউন।" গমন করিবার পূর্ব্বে একবার ভারতকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। কি জানি, যদি এ শরীর প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে এই দর্শনই আমার শেষ দর্শন হইবে বিবেচনা করিয়া, মনে মনে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া তিব্বতে নামিবার জন্য অগ্রসর হইলাম।

একাদশ অধ্যায়

ভুটিয়া সঙ্গীর কথা অনুসারে লিপুলেখে অধিক বিলম্ব না করিয়া ইচ্ছা না থাকিলেও নামিবার উদ্যোগ করা গেল। লিপুলেখের ভারতের দিক্‌টা বেশ ঢালু, তিব্বতের ভাগটা, বিশেষতঃ শিলুর নিকট খাড়া চড়াই। ঘোড়ায় চড়িয়া নামা সুবিধাজনক নহে বিবেচনা করিয়া হাঁটিয়া নামিতে লাগিলাম। কিছু দূর নামিতে না নামিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে শিলার আকার ক্ষুদ্র ছিল বলিয়া আমরা রক্ষা পাইলাম। সময় সময় ইহা হংসডিম্বাকারেও বর্ষিত হইয়া থাকে। শিলা-পাতের সহিত অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। ইহাতে রাস্তা পিছল হইয়াছিল, এ অবস্থায় এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া

সৌন্দর্য্যভোগ করিবার অবকাশ রহিল না। দীর্ঘ যষ্টির সাহায্যে "দৃষ্টি-পূতং ন্যসেৎ পাদং" বাক্যের সার্থকতা করা গেল। লিপুলেখ হইতে অবতরণকালে একটি জলপ্রবাহের সঙ্গ লইয়াছিলাম। ইনি লিপুর নিকট হইতে বহির্গত হইয়া নিম্নাভিমুখে গমন করিয়াছেন। ইহার তটে বহুদূর ব্যাপ্ত কৃষ্ণ-শিলা দেখিলাম। তাহা পাথুরিয়া কয়লা বলিয়া আমার ভ্রম হইয়াছিল। আর ইহা পাথুরিয়া কয়লা হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য নিম্নে গমন করিতে উদ্যত হইলে, ভুটিয়া সঙ্গী বারংবার আমাকে নিষেধ করিতে লাগিল। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে ধস ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাওয়াতে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাতেও পাথুরিয়া কয়লা বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

তিব্বত খনিজ-সম্পদে পরিপূর্ণ। মিষ্টার ওয়াডেল বলেন, তিব্বতে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়, পৃথিবীর অপর কোন স্থানে সেরূপ পাওয়া যায় না। এই বলিয়া তিনি তাঁহার স্বর্ণপ্রিয় স্বদেশ-বাসীকে তিব্বত অধিকার করিবার জন্য বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া-ছিলেন।

সোনার কথা যাউক্। নদীর তট অবলম্বন করিয়া প্রায় ৪ মাইল নিম্নে পালা নামক স্থানে উপস্থিত হওয়া গেল। এ স্থানে ইহার নামের উপযুক্ত কিছুই নাই। থাকিবার মধ্যে আছে দুইটি প্রস্তর-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহ। আর আছে, যাহারা লিপুলেখ চৌকি দিবার জন্য এ স্থানে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছিল, তাহার ভস্মাবশেষ মাত্র।

এখন আর বৃষ্টি নাই, করকাপাত নাই, সূর্য্যদেব তাঁহার কিরণে যেন সকলকে অভয় প্রদান করিতেছেন। এ স্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া জলযোগ করা গেল।

কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর ২-২॥•টার সময় আবার চলিতে আরম্ভ করা গেল। রাস্তায় বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। সকালবেলায় এগুলিতে বড় বেশী জল থাকে না। যত অপরাহ্ণ হইতে থাকে, ততই প্রবলবেগে জলধারা প্রবাহিত হইতে থাকে, সূর্য্যের কিরণে বরফ গলিয়া জল বাড়িয়া থাকে। সে সময় এই সকল পার্ব্বত্য নদী পার হওয়া বিপজ্জনক হয়। আমার ঝব্বুকে স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। প্রায় এক ঘণ্টা যাইবার পর বেশ শস্য-শ্যামল ভূমিতে উপস্থিত হওয়া গেল। এই সকল ভূমি জলসিক্ত করিবার জন্য তিব্বতীরা পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া ভূমিকে সজল করিয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে মটর, যব, সর্ষপ প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে দুই একখানি কৃষকদের কুটীর দেখিতে পাওয়া গেল। ইতঃপূর্ব্বে তৃণ-হীন দৃশ্য দেখিয়া চক্ষু যেন পীড়িত হইয়াছিল, এখন এই শস্য-শ্যামল নয়নরঞ্জন দৃশ্য দেখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। লিপুলেখ হইতে দূরে তাকলাকোট দুর্গ অস্পষ্ট-ভাবে দেখিয়াছিলাম, এখন বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দেখিতে কর্ণালীর তটে উপস্থিত হওয়া গেল। নদীর তটে একখানি বড় গ্রাম, ইহাও তাকলাকোট নামে পরিচিত। উচ্চপাড় হইতে নদী অনেক নিম্নে। আমি ঘোটক পরিত্যাগ করিয়া হাঁটিয়া চলিতে লাগিলাম। নদীর বিস্তার প্রায় অর্দ্ধ-মাইল হইবে। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারায় বিভক্ত হইয়া কর্ণালী প্রবাহিত হইতেছে। এখন বেশ সজীবতা বোধ হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক ছাগ, মেষ, ঝব্বু, ঘোটক নদী পার হইতেছে, বহু স্ত্রী-পুরুষ বস্ত্রাদি নদীতে কাচিতেছে, স্থানে স্থানে জলের শক্তিতে চাকা চালাইয়া যবাদি চূর্ণ করিতেছে। নদীর অপর

পারে দুর্গের পাদদেশে উন্নত ভূমির উপর ভুটিয়ারা বাজার বসাইয়াছে। কষ্টে সাবধানতার সহিত নদী পার হইয়া প্রায় ৬৷৷০টার সময় তাকলাকোটে উপস্থিত হওয়া গেল।

নদী পার হইয়া উপরে উঠিয়া এক ভুটিয়া ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি যেন আমাকে আসিতে দেখিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রথম আলাপেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, লালসিংহের ডেরা কোথায়? তিনি বলিলেন, "লালসিং এখনও আইসেন নাই। চলুন, তাঁহার দোকান দেখাইয়া দিতেছি।" লালসিং আইসেন নাই শুনিয়া একটু উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম; পরে দোকানের কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আজ প্রায় ১৭৷১৮ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। রাস্তায় নানা অবস্থা ভোগ করাতে শরীরও খুব অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এ অবস্থায় একটু থাকিবার আশ্রয় পাইয়া শ্রীভগবানের দয়ার কথা ভাবিতে লাগিলাম। খিচুড়ি প্রস্তুত করা গেল, গরম গরম খিচুড়ি খাইয়া প্রজ্বলিত জঠরানল নির্ব্বাপণ, আর শয়ন করিয়া বৌদ্ধের দেশে নির্ব্বাণসম সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। সকল সুখেই দুঃখ আছে, ভোজনের পর যখন ঠাণ্ডাজলে হাত ধুই, তখন বোধ হইল, হাতের উপর যেন অস্ত্র-উপচার হইয়াছে, সে হাত যেন কিছুতেই গরম হইতে চাহে না।

যে ঘরে ছিলাম, তাহার উপরটা পাল-ঢাকা, প্রাচীর পাথর আর মাটী দিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। এ দেশে দিবাভাগে প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। রাত্রিকালে এ বেগ থাকে না বলিয়া রক্ষা। এইরূপ ঘরে তাকলাকোটে কয়েকদিন কাটাইয়াছিলাম। তাহাতে শীতের জন্য কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করি নাই বা স্বাস্থ্যের কোনপ্রকার ব্যতিক্রম হয় নাই।



তাকলাকোট ও কর্ণালী নদী।

দ্বাদশ অধ্যায়

তাকলাকোট, তাকলা খর ও পুরাং নামেও পরিচিত। তিব্বতীরা শেষোক্ত নামই ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রাতঃকালেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—বাহিরে গিয়া দেখি, কয়েকজন তিব্বতী রমণী ক্ষিপ্রকারিতার সহিত গরু, ঝব্বু, ভেড়া প্রভৃতির পুরীষ সংগ্রহ করিতেছে। অল্প-সময়ের মধ্যে সে স্থানে মেষাদি পশুর মলের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। এ প্রদেশে জ্বালানী কাষ্ঠের অত্যন্ত অভাব। তাই স্ত্রীলোকরা শীতকালের জন্য ইন্ধন সংগ্রহ করিতেছে।

যখন এই সকল দৃশ্য দেখিতেছিলাম, তখন সানাইএর শ্রুতিমধুর শব্দ কানের ভিতর আসিল। কোন্ স্থান হইতে এই শব্দ আসিতেছে, তাহার সন্ধান লইবার জন্য যখন এদিক্ ওদিক্ দেখি, তখন শব্দ আরও স্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। উপরদিকে চাহিয়া দেখিলাম, দুইটি লোক রৌপ্য-নির্ম্মিত সানাই বাজাইতে বাজাইতে দুর্গ-প্রাচীরের ধারে ধারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন, আর তাঁহাদের পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রায় দুই শত পুরুষ সুসজ্জিত হইয়া গমন করিতেছে। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, ইঁহারা সৈনিক লামা, কাওয়াজ করিতেছেন। যদি কখন ধর্ম্মের উপর কোনপ্রকার আপদ উপস্থিত হয়, সে সময় যাহাতে না তাঁহারা অলস হইয়া অবস্থান করেন, ইহা তাহার পূর্ব্ব-অনুষ্ঠান।

লামা হউন, সন্ন্যাসী হউন বা ব্রাহ্মণ হউন, ধর্ম্মরক্ষা তাঁহাকে করিতে হইবেই হইবে। ধর্ম্ম যথায় সুরক্ষিত হয়, তথায় সকলই সুরক্ষিত হইয়া থাকে। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রকাররা কহিয়াছেন,

"যথায় ধর্ম্মের অবমাননা হয়, তথায় দ্বিজগণ অস্ত্র গ্রহণ করিবেন।" পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত আমাদের দেশে "দেশাত্মবুদ্ধি", "দেশানুরাগ" প্রভৃতি অহিন্দু ভাব ও শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। এ ভাব আমাদের বেদ-পুরাণে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার পরিবর্ত্তে "ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব প্রদান করিবে", "ধর্ম্মরক্ষার জন্য শুভ অবসর আসিলে বুঝিতে হইবে, সৌভাগ্যক্রমে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে" ইত্যাদি ভাবনায় ভাবিত আমাদের পূর্ব্বজরা, অলিক-সন্দরকে (আলেকজেণ্ডার) বাধা দিবার জন্য দলে দলে গমন করিয়াছিলেন। এই ভাবনায় প্রণোদিত হইয়া শত শত বৎসর পূর্ব্বে—অসংখ্য হিন্দু দূরপ্রদেশ হইতে গমন করিয়া সমুদ্রতটে সোমনাথের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-মণ্ডিত মন্দির রক্ষার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। এ ভাবনা আমাদের হিন্দুর মর্ম্মে মর্ম্মে সুনিহিত আছে। দেশের নামে—হিন্দুর নিকট এই অস্বাভাবিক আহ্বানে কয় জন সমবেত হইবেন জানি না, কিন্তু ধর্ম্মের নামে এখনও শত শত, সহস্র সহস্র, প্রয়োজন হইলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে প্রস্তুত, ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। হিন্দুর নিকট সমস্ত বসুধাবাসী কুটুম্ব বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। তিনি জীবমাত্রকে শিবস্বরূপ বিবেচনা করিয়া প্রেমের চক্ষুতে দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট সমস্ত পৃথিবীই স্বদেশ, আর সমস্ত পৃথিবীবাসী তাঁহার আত্মীয়। এরূপ অবস্থায় হিন্দুর বিশাল হৃদয়ে ক্ষুদ্র—সীমাবদ্ধ দেশের কথা কখনও আসিতে পারে না। ইহার পরিবর্ত্তে যাহা তাঁহার ইহকাল ও পরকালের সুহৃৎ—যাহা তাঁহার সংস্কারকে গঠন করিয়া থাকে, সেই ধর্ম্মরক্ষার জন্য তিনি যে কোন মুহূর্ত্তে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না।

কেহ কেহ মনে করেন—ধর্ম্মগুরু সংসারবিরাগী লামাদের যুদ্ধ করাটা ভাল দেখায় না। আমার কাছে কিন্তু এ ব্যবস্থা খুব ভালই বোধ হইল। ইঁহারা বর্ত্তমান প্রথানুসারে অর্থাৎ লোকের নির্দ্দয়ভাবে প্রাণসংহার বিদ্যায় অভ্যস্ত হইলে, পাশ্চাত্য সমাজে বিশেষ গৌরব অর্জ্জন করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উপরের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, দুর্গের পাদদেশ ধরিয়া কিছু অগ্রসর হইতে লাগিলাম। নিম্নে কর্ণালীর দৃশ্য মন্দ নহে—দূরে লিপুলেখ—তুষারমণ্ডিত হিমালয় সূর্য্যোদয়ের সহিত আরক্তবস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভার আধার হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অমল-ধবল অম্বরে শোভিত সাত্ত্বিক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শোভিত হইলেন। ক্ষণে ক্ষণে এই অদ্ভুত পটপরিবর্ত্তন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ফিরিয়া আসিলাম।

আবাসস্থানে আসিয়া দেখি, ঘোড়াওয়ালা ভাড়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সে গারবাংএ ফিরিয়া যাইবে। এ সময় ব্যবসায়ীরা তাকলাকোটে আসিবে, এ জন্য ঝব্বু প্রভৃতি ভাড়া দিয়া দুই পয়সা তাহারা রোজগার করিয়া থাকে। গারবাং হইতে তাকলাকোট ঘোড়া দুই টাকা—ঘোড়ার সঙ্গের লোকও দুই টাকা, আর ঝব্বুর ভাড়া দুই টাকা হিসাবে দিয়াছিলাম। ইহার উপর কিছু বক্‌সীসও দিতে হইয়াছিল। ঘোড়াওয়ালার হাতে ২।১খানি পত্র ডাকে দিবার জন্য দিলাম; আর বলিয়া দিলাম, আমার নামে পত্র আসিলে এ স্থানে যে ব্যবসায়ী আসিবে, তাহার হাতে যেন পাঠাইয়া দেন। এ জন্য পোষ্টমাষ্টার মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলাম।

নদীর দিক্ দিয়া যদি কেহ তাকলাকোট দুর্গের দিকে আগমন করেন, তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টি প্রাচীরশ্রেণীর উপর পতিত হইবে।

এই প্রাচীর দুর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া নদীর তট পর্য্যন্ত আসিয়াছে। তাকলাকোট দুর্গের জলের অভাব কর্ণালীর জলে দূর হইয়া থাকে। এ জন্য প্রতিদিন পালা করিয়া গ্রামবাসীরা জল যোগাইয়া থাকে। এই জল বন্ধ করিতে পারিলে দুর্গ জয় করিতে বিলম্ব থাকে না। কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ গোলাবসিংহের জোরাবরসিং নামে এক জন প্রতিভাসম্পন্ন সেনানী ছিলেন। ইংরাজ যখন পঞ্জাব গ্রাস করিয়া উদরস্থ করিতেছিলেন, সে সময় গোলাবসিংহের সেনানী হিমালয়ের উত্তরভাগ জয় করিয়া রণবিষয়ক প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন। জোরাবরসিং লাদাক জয় করিয়া তাঁহার বিজয়ী বাহিনী লইয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। যে স্থানে তিনি উপস্থিত হয়েন, সেই স্থানেই বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কগতা হয়েন। এইরূপে দেশ জয় করিতে করিতে শতদ্রুর তটে তিব্বতীদের পবিত্র তীর্থ, তীর্থপুরীতে আগমন করিয়া তিনি তাঁহার বিজয়-শিবির স্থাপন করেন।

এক সময় তিব্বতী সেনাপতি ৮ হাজার সৈন্য লইয়া, জোরাবরসিংকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, জোরাবরসিং এ সংবাদ অবগত হইয়া, তিব্বতী সেনাপতিকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিবার জন্য অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জোরাবর, তড়িদ্‌গতিতে গমন করিয়া বজ্রের ন্যায় প্রবলবেগে বরখার প্রান্তরে তিব্বতী সৈন্য আক্রমণ করেন। ৮ হাজার তিব্বতী সৈন্য, দেড় হাজার ভারতীয় সৈন্যের কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। তিব্বত-বাসীদের হৃদয়ে দারুণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়; জোরাবরের নামের প্রভাবে যেন সকলে বিবশ হইয়া পড়ে।

তাকলাকোট অঞ্চলের শস্যশালিনী ভূমি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। কেবলমাত্র তাকলাকোট দুর্গ তিব্বতীদের হস্তগত রহিয়া

যায়। তাকলাকোট যখন অবরুদ্ধ হয়, সেই সময় জলাভাবে যাহাতে দুর্গ জোরাবরের হস্তগত না হয়, সেই জন্য জলবাসীদের রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তিব্বতীরা অতি দক্ষতার সহিত উভয়দিকে প্রাচীর প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

জোরাবরের অপূর্ব্ব অবদানের কথা ভারতবাসী ভুলিয়া গিয়াছে—তিব্বতীরাও তাহাদের সে দারুণ বিপদের কথা মনে আর স্থান দেয় না। কিন্তু এই প্রাচীর সেই অতীতের স্মৃতি লইয়া এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! বর্ত্তমান লেখক বহুদিন এই প্রাচীরের কাছে বসিয়া তিব্বতীদের দুর্গে জল বহনের দৃশ্য দেখিয়াছেন, আর ৮০ বৎসরের পূর্ব্বে ভারতবাসী যে রণপাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন—নানা প্রকার অভাবের মধ্যে থাকিয়াও অভীষ্টসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন—দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া বিস্তীর্ণ বসুধা জয় করিয়াছিলেন, সে সকল বিষয় চিন্তা করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। কৈলাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পরবৎসর আমি কাশ্মীরে অমরনাথ দর্শন করিতে যে সময় গমন করিয়াছিলাম, সেই সময় শ্রীনগরে জোরাবর-সিংএর বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, মহারাজ প্রতাপসিংহকেও এ বিষয় জানাইয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যক্রমে আমার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হয় নাই। য়ুরোপের মাটীতে জন্মগ্রহণ করিলে, জোরাবর যে হানিবল বা নেপোলিয়নের সহিত তুলিত হইতেন, তাঁহার অপূর্ব্ব কার্য্যপরম্পরা গর্ব্বের সহিত আলোচিত হইত, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বীরবর জোরাবরসিং যে স্থানে অবস্থান করিয়া তাকলাকোট দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে স্থানে তাঁহার নির্ম্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও পতিত রহিয়াছে।



তিব্বতে প্রথম শিবির।

জোরাবরসিং তিব্বতীদিগকে নিপীড়িত করিলে, চীন-সম্রাট্ ইহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন। এ সংবাদ অবগত হইয়া তিনি, তাঁহার সহিত যে সকল স্ত্রীলোক অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রেরণ করেন এবং লাদাক হইতে তাকলাকোটে আসিবার রাস্তায় যাহাতে কোনরূপ বাধা উপস্থিত না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে গারতক পর্য্যন্ত গমন করেন। প্রত্যাগমনকালে তাকলাকোটের ২ মাইল দূরে তোয় নামক স্থানে তিনি বীরাঙ্গনা-পরিচালিত এক তিব্বতীসেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন। যখন তিব্বতীরা হতবীর্য্য, নিরুদ্যম, কর্ত্তব্য অবধারণে অসমর্থ হইয়া পড়েন, সেই সময় এই বীররমণীর আবির্ভাব হয়। তিনি কতকগুলি বীরহৃদয় যুবক সংগ্রহ করিয়া জোরাবরসিংকে তাঁহার আগমনপথে অকস্মাৎ আক্রমণ করেন। এ দেশের স্ত্রীলোকরাও অস্ত্রচালনায় পটীয়সী। কথিত আছে যে, এই বীরাঙ্গনার বন্দুকের গুলীতে জোরাবরসিং আহত হইয়া ঘোটকপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। যে স্থানে বীরবর জোরাবরসিং পঞ্চত্বলাভ করেন, সে স্থানে পশ্চাৎকালে একটি সমাধি-স্তূপ নির্ম্মাণ করা হয়। বর্ত্তমানকালেও সেই স্তূপ তাঁহার স্বদেশ ও বিদেশবাসী উভয়ের কাছে সম্ভ্রম-শ্রদ্ধার সহিত দর্শিত হইয়া থাকে।

জোরাবরসিংএর মৃত্যু-সংবাদে তিব্বতীরা আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া দারুণবেগে ভারতীয় সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। জোরাবরের সহযোগী সেনানী বস্তিরাম এই আকস্মিক বিপৎপাতে ম্রিয়মাণ হইয়া বিচলিত হইলেন। তিনি তিব্বতী আক্রমণ প্রতিহত করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তিব্বতীরা তাঁহার সাহায্যপ্রাপ্তির পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। যখন লাদাক হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির আশা

নির্ম্মূল হইল, তখন তিনি লিপুলেখ দিয়া হিমালয় অতিক্রম করিয়া ভারতে আশ্রয় লইবার সঙ্কল্প করিলেন। তিব্বতীদের বাহুবল অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ আর জল-বায়ুর কঠোরতা তাঁহাকে অধিকতর বিপন্ন করিয়াছিল। বস্তিরাম তাকলাকোট পরিত্যাগ করিয়া পালাতে গমন করেন। শত্রুবর্গ বস্তিরামের গমনকথা অবগত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ ও ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। তিনি নিপুণতার সহিত সৈন্য সকল পরিচালনা করিয়া পালায় শিবির সংস্থাপন করেন। তিব্বতীরা পলায়মান শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিবার জন্য উৎসাহের সহিত উপস্থিত হইতে লাগিল। যে সকল ভারতীয় সৈন্য শত্রুহস্তে পতিত হইল, তাহারা নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইতে লাগিল।

বস্তিরাম তিব্বতীদের চক্ষুতে ধূলি দিয়া আত্মরক্ষার উদ্যোগ করিলেন। তিনি অন্য রাত্রি অপেক্ষা তাঁবুতে অধিকসংখ্যক অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন। তিব্বতীরা মনে করিল, শত্রুসৈন্য সতর্কতার সহিত শিবির রক্ষা করিতেছে। তিনি ধীরে ধীরে লিপুলেখের দিকে সৈন্যসহ অগ্রসর হইলেন। দারুণ শীত, তুষারপাত, দুর্গম রাস্তা আর তিব্বতীদের আক্রমণে ভারতীয় বীরগণ দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপস্থিত হইলেন। তিব্বতীরা যাহাদিগকে বন্দী করিতে সমর্থ হইল, তাহারা অত্যন্ত নৃশংসতার সহিত নিহত হইল। এরূপ কথিত আছে, তিব্বতীরা জোরাবরসিংএর কেশাদি শরীরের অংশ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় স্বীয় গৃহে ঝুলাইয়া রাখিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল, এরূপ অসাধারণ শত্রুর শরীরের অংশ যে গৃহে থাকে, সে গৃহে কখনও অমঙ্গল আসিতে পারে না। যাহারা হিমালয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহারা অস্ত্রাদির বিনিময়ে একমুষ্টি অন্নসংগ্রহ করিয়া জীবন রক্ষা করে। আসকোটে এরূপ অস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতের বাহিরে ভারতীয় সেনানী-পরিচালিত ভারতীয় সৈন্যের এই অভিযানের কথার সহিত আমরা পরিচিত নহি। ভারতের ইতিহাসের এই ক্ষুদ্র অধ্যায়—বিস্মৃত, জীবনীপ্রদ এই ক্ষুদ্র অধ্যায় বালকদিগের পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত হউক। আত্মশক্তিতে প্রত্যয়-হীন আমাদের শক্তিসংগ্রহের পক্ষে উপযোগী এমন উদাহরণ আর নাই।

তিব্বতীরা নেপালী প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতে একটু ইতস্তত: করিয়া থাকে। নেপাল-দরবার নিজের প্রজারক্ষা করিবার জন্য কঠোরতার সহিত তিব্বতীদের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাছে নেপালী সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হয়, ইহাই সদ্ব্যবহারের কারণ।

নিশীথে এ স্থান হইতে চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের দৃশ্য অদ্ভুত। চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল—আর ঘোর তমসাবৃত রাত্রি উভয় সময় এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া বিমূঢ় হইয়াছি। আকাশের দিকে যখন দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছি, তখন নক্ষত্র সকল বৃহত্তর বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে—তাহাদের স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতায় নীল আকাশ সুশোভিত হইয়া বিস্ময়প্রদ শোভার আধার হইয়াছে। তিব্বতে এইরূপ বহুরাত্রি শীতের কষ্ট ভুলিয়া আকাশ দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

———

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আমি যে সময় তাকলাকোটে উপস্থিত হই, তাহার দুই দিন পরে দুর্গমধ্যে লামাদের এক প্রধান মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দলে দলে তিব্বতী ও ভুটিয়া নর-নারী সেই উৎসব দেখিবার জন্য উপরে গমন করিতেছেন। তাহা দেখিবার জন্য পরিচিত ভুটিয়ারা প্রস্তুত হইলেন আর আমাকেও তাঁহাদের সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলেন। আমি কখনও অপ্রস্তুত নহি, সর্ব্বদাই প্রস্তুত। মনে করিলাম, এক যাত্রায় দুইটি কার্য্য সিদ্ধ হইবে,—লামাদের ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান আর কেল্লা দেখা হইবে। অনেক চড়াই উঠিয়া কেল্লায় উপস্থিত হইলাম। ইহার প্রকাণ্ড দরজা আমাদের ভারতের কাষ্ঠে প্রস্তুত। তিব্বতের এ অঞ্চলে গাছই নাই, তক্তা আসিবে কোথা হইতে? তিব্বতীরা যে সকল দ্রব্য ভুটিয়াদের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্যে কাষ্ঠ অন্যতম। মনুষ্যের স্কন্ধ ব্যতীত হিমালয়ের দুর্গম রাস্তা অতিক্রমণ করিবার অন্য কোন উপায় নাই। ইহা আনিতে যে কত ক্লেশ ও পরিশ্রম হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই দ্বার অতিক্রমণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরটা একটু অন্ধকার। সিঁড়ি অতিক্রমণ করিয়া উপরে উঠিলাম। নিম্নে লামাদের ভোজনের বন্দোবস্ত হইতেছে। সম্মুখে ভগবান্ বুদ্ধদেবের বিরাট পটমূর্ত্তি, যেন রঙ্গমঞ্চের যবনিকা—চীন-চিত্রকরের অঙ্কিত বলিয়া বোধ হইল। এই চিত্রপটের পশ্চাদ্ভাগে ভগবানের ধাতুময়ী মূর্ত্তি। উপাসকরা ছোহারা প্রভৃতি শুষ্ক ফল, কেহ বা এলাচদানা প্রভৃতি উপকরণ

প্রদান করিয়া পূজা করিতেছেন। লামা মহাশয়রা আগ্রহের সহিত তাহা সংগ্রহ করিতেছেন। কেহ বা টাকা-পয়সা দিয়া ভক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছেন, কেহ বা ধূপ জ্বালাইয়া চতুর্দ্দিক সুগন্ধিত করিতেছিলেন। এই সকল দৃশ্য দেখিয়া প্রধান লামা মহাশয়ের নিকট গমন করিলাম। তিনি একটি নিভৃত কক্ষে অবস্থান করিয়া মালা ফিরাইতেছিলেন। অপেক্ষাকৃত উচ্চ আসনে তিনি সমাসীন ছিলেন। ক্ষুদ্র ঘরখানি ভগবান্ বুদ্ধদেবের নানা প্রকার চিত্রে ভূষিত ছিল। তাহার মধ্যে জর্ম্মণীতে প্রস্তুত দ্রব্যেরও অভাব ছিল না। অবশ্য তাহা ভক্তের উপহার। আমার ভুটিয়া সহচরকে লামা মহাশয় "মিত্র" "মিত্রা" বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া বসিতে কহিলেন। আমি ব্রাহ্মণ—কৈলাসযাত্রী কাশী-লামা—তাঁহার আদর-আপ্যায়ন হইতেও বঞ্চিত হইলাম না। সাধু ব্রাহ্মণ এ দেশে কাশীলামা নামে সম্মানিত হইয়া থাকেন। চা-পানের জন্য অনুরুদ্ধ হইলাম, তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারায় তিনি বিস্মিত হইলেন। তাঁহার এ মঠে পুস্তক সংগ্রহ কিরূপ, তারানাথের গ্রন্থ তাঁহার গ্রন্থাগারে আছে কি না ইত্যাদি প্রশ্ন তাঁহাকে করিলাম। তিনি আমার প্রশ্নে প্রসন্ন হইয়া তারানাথের গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি সমরের কথা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রায় দেড় মাস আমি আলমোড়া পরিত্যাগ করিয়াছি, য়ুরোপীয় সভ্যতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি, দেড় মাসের পুরাতন খবর ইঁহারা খুব টাটকা বলিয়া আগ্রহের সহিত নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধের কথা আমি এক রকম ভুলিয়া গিয়াছিলাম—আবার মনে করিয়া তাঁহার চিত্তরঞ্জন করিতে লাগিলাম। লামাদের

আচার-ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইল যেন, আমি আমাদের এক হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থান করিতেছি। সিংহল, শ্যাম প্রভৃতি দেশে হীনযান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক দিন অবস্থান করিয়াছি, তাঁহাদের অপেক্ষা মহাযানপথাবলম্বীদের সহিত আমাদের অনেক সাদৃশ্য দেখিলাম।

বিদায় লইবার পূর্ব্বে তিনি আমাকে আমাদের হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিবার জন্য কহিলেন, দেখাইবার জন্য এক জন লামাও নিযুক্ত করিয়া দিলেন। লামা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতের প্রথম ভাগেই আমি কিছু রজতখণ্ড দিয়া আমার ভক্তি দেখাইয়াছিলাম, বিদায়ের সময় আমাকে কিছু মিছরী দিয়া তিনি তাঁহার প্রসন্নতা দেখাইয়াছিলেন। নানা স্থান দেখিয়া পুনরায় চিত্রপটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন বারান্দা ভুটিয়া আর তিব্বতী নরনারীতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিম্নে লামা মহাশয়দের ভোজন আরম্ভ হইয়াছে। ইঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইল যেন, রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক। ইঁহাদের শিরস্ত্রাণ কিন্তু সামরিক ভাব প্রকাশ করিতেছিল। চা, গোলা ছাতু আর মাংসের সূপই প্রধান খাদ্য, যুবক লামারা এই সকল দ্রব্য পরিবেশন করিতেছিল। পরিবেশনের পর প্রত্যেক বারই গমনের সময় পরিবেশক ভক্তিভাবে অভিবাদন করিয়া গমন করিতেছিল। এই শিষ্টাচার আমার কাছে বেশ ভাল লাগিয়াছিল। ভোক্তা লামারা নিস্তব্ধ হইয়া, কোনরূপ চঞ্চলতা না দেখাইয়া ভোজন করিতেছিলেন। এই সকল দেখিয়া, যে সকল ছোট ছোট ঘরে লামারা থাকেন, তাহাও দেখিলাম। সে সকল ঘরে শয্যা ছাড়া অপর কোন আসবাব দেখিলাম না। এই সকল দেখিয়া এক প্রকাণ্ড চক্রের কাছে উপস্থিত হইলাম।

ভক্ত নর-নারী এই ধর্ম্মচক্র ভক্তিভাবে প্রবর্ত্তন করিয়া "ধর্ম্ম" উপার্জ্জন করিতেছিলেন। এই চক্রে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার ছিল। মধ্যযুগে আমাদের ভারতীয় যে অক্ষর তিব্বতে নীত হইয়াছিল, বর্ত্তমান তিব্বতীও তাহার অণুমাত্র ব্যতিক্রম করেন নাই; অন্ধভাবে তাহাই অনুকরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন করেন নাই।

দুর্গের অপর অংশে শাসনকর্ত্তা মহাশয় অবস্থান করেন। তিনি কিছুদিন হইল লাসায় গমন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার স্ত্রী শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। তিনি কোন কার্য্যে নিযুক্তা থাকায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। শাসনকর্ত্তা মহাশয় গৃহস্থ। তিনি ও প্রধান লামা মহাশয় মিলিত হইয়া দেশের কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান লামা মহাশয় সাধন-ভজন ও ধর্ম্মকার্য্য লইয়াই থাকেন, বিশেষ ঘটনা না হইলে তিনি প্রায়ই শাসন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না।

নানা বিষয় দেখিয়া শুনিয়া অপরাহ্নকালে ভুটিয়া বাজারে আমার ডেরায় উপস্থিত হওয়া গেল। কিছু বিশ্রামের পর যাঁহারা কৈলাস যাইবেন, তাঁহাদের খোঁজ খবর লইবার জন্য বাজারে এ দোকান ও দোকানে একটু ঘুরিলাম। ঘোরার ফলে বুঝিলাম, অন্ততঃ এক দল যাত্রী মিলিত না হইলে, সঙ্গে ২।৪টা বন্দুক না থাকিলে যাওয়া উচিত নহে। কুম্ভের বৎসর বলিয়া বহুদূর হইতে ডাকাইতের দল তীর্থ ও লুণ্ঠন উভয় কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য আগমন করিয়াছে। সঙ্গে অন্ততঃ ২টা বন্দুক থাকা প্রয়োজন। এরূপ সঙ্গী যে পর্য্যন্ত না একত্র হইতেছে, সে পর্য্যন্ত যাওয়া হইবে না, এইরূপ স্থির হইয়াছে। তিব্বতী বন্দুক অপেক্ষা বিলাতী

বন্দুক অনেক বেশী শক্তিশালী। তিব্বতী বন্দুকে বারুদ ভরিতে—বন্দুকটিকে ছুড়িবার উপযুক্ত করিয়া রাখিতে অন্ততঃ দেড় মিনিট দুই মিনিট সময়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ঐ সময়ের মধ্যে পুরাতন বিলাতী বন্দুক অনেকগুলি আওয়াজ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এজন্য তিব্বতীরা বিলাতী বন্দুককে বড়ই ভয় করে। ডাকাইতরা আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে, তাহাদের যজমানদের শিবিরে কিরূপ অস্ত্রশস্ত্র আছে, তাহার সংবাদ লইয়া থাকে। সংবাদ লইবার জন্য বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বা ছোট ছোট বালক-বালিকা নিযুক্ত হয়। তাহারা ভিক্ষার ছলনা করিয়া আসিয়া প্রত্যেক শিবির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে। ডাকাইতদের ধারণা, তীর্থযাত্রীরা তাহাদের যজমান—শস্যক্ষেত্রস্বরূপ—কৃষকরা যেরূপ ক্ষেত্র হইতে শস্য সংগ্রহ করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের যেরূপ পাপ স্পর্শ করে না, সেইরূপ ইহাদেরও লুণ্ঠন-কার্য্যে কোন পাপ নাই।

এরূপ অবস্থায় আমি বুঝিলাম, আত্মরক্ষার জন্য শস্ত্রশূন্য হইয়া যাওয়া পাপ, আর শস্ত্রপাণি যাওয়াই পুণ্যজনক। এখন বুঝিলাম, দুরাচারীকে বধ করাই পুণ্য—আর না করাই পাপ। যাত্রিদল মিলিত হইতে ৫।৭ দিন লাগিবে, এই দীর্ঘ সময় কি করিয়া কাটান যায়? এই স্থান হইতে ৯।১০ মাইল দূরে খোজরনাথের বিখ্যাত মন্দির ও মঠ; তাহা দর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

১৩ই জুলাই সকাল সকাল কিছু ভোজন করিয়া খোজরনাথ যাইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। খোজরনাথ সংস্কৃত খেচরনাথ শব্দের অপভ্রংশ। মানসখণ্ডে ইহার যথেষ্ট প্রশংসা পাঠ করিয়াছিলাম। যে সকল যাত্রী কৈলাসদর্শন করিতে আগমন করেন, তাঁহাদের ইহা অবশ্য-দ্রষ্টব্য। কৈলাস, মানস, আর খোজরনাথ দর্শন না করিলে কৈলাসদর্শন পূর্ণ হয় না। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, কৈলাস দর্শন করিয়া পশ্চাৎ ইহা দর্শন করিব। সে সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিলাম। রাস্তা দেখাইবার জন্য এক জন ভুটিয়া আর আমরা তিন জন যাত্রী মিলিত হইলাম। ৯টার সময় তাকলাকোট পরিত্যাগ করিয়া কিছু নামিয়া কর্ণালীর তটে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে আর একটি নদী আসিয়া মিলিতা হইয়াছে। মানসখণ্ডে ইহা সাবিত্রী নামে অভিহিতা হইয়াছে। কাঠের তিব্বতী পুল দিয়া নদী পার হইলাম। এই সেতুর লৌহকীলকের স্থান চর্ম্মরজ্জু অধিকার করিয়াছে। নদীর নিকট বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী মেষের লোম ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে। উন্নতভূমির শিখরদেশে কয়টি গুহা দেখিলাম; সংসারবিরাগী লামা সজন হইয়াও এই নির্জ্জন স্থানে অবস্থান করিয়া সাধন-ভজন করিয়া থাকেন। তাকলাকোট দুর্গের পাহাড়েও এইরূপ গুহা দেখিয়াছিলাম। ধীরে ধীরে লোকালয় অতিক্রম করিয়া গ্রামের বাহিরে উপস্থিত হইলাম। রাস্তায় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম; ধর্ম্মভীরু তিব্বতী রাস্তা চলিবার সময় ও পুণ্যসঞ্চয় মানসে পথের মধ্যস্থলে প্রস্তরখণ্ড সকল রাখিয়া দিয়াছে।

এই সকল প্রস্তরের উপর "ওঁ মণি পদ্ম হুং" প্রভৃতি মন্ত্র অঙ্কিত করিয়া দাতার নামাদিও তাহাতে ক্ষোদিয়া দিয়াছে। রাস্তায় বহুদূর পর্য্যন্ত এই দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। তিব্বতে সযত্নে রচিত এরূপ রাস্তা আর দেখি নাই। পথিকরা এক পার্শ্ব দিয়া গমন ও অপর পার্শ্ব দিয়া আগমন করিয়া থাকেন। এইরূপে সমস্ত প্রস্তরখণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রীরা ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া থাকেন। এ স্থানে পথিকগণের গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য প্রহরীর প্রয়োজন হয় না। এই সকল প্রস্তরখণ্ড আর পথিকদিগের ধর্ম্মভাবই সে স্থান পূর্ণ করিয়া থাকে।

রাস্তার দুই ধার শ্যামল শস্যক্ষেত্রে শোভিত। এই সকল ক্ষেত্র জলসিক্ত করিবার জন্য বহু দূর হইতে জলধারা আনয়ন করা হইয়াছে। বৃষ্টিবর্জ্জিত দেশে এই উপায়ে প্রচুর পরিমাণে এক প্রকার যব জন্মাইয়া থাকে। এই সকল হরিৎ ক্ষেত্রের মধ্যে সর্ষপের পীত পুষ্প বেশ নয়নরঞ্জন হইয়াছিল। স্থানে স্থানে মেষপালক বালকরা পশু সকল চরাইতেছে। এই সকল বালক দরিদ্র হইলেও বেশ স্বাস্থ্যসম্পন্ন, কেহ নিরস্ত্র নহে, সকলেরই কটিদেশে অস্ত্র সকল শোভিত হইতেছে দেখিলাম। এমন কি, ভিক্ষুকও সশস্ত্র হইয়া ভিক্ষা করিতে আইসে।

রাস্তা চলিবার সময় পথিক খুব কমই দেখিয়াছিলাম। লোকালয় নাই বলিলেই চলে। তাকলাথ আর খোজরনাথের মধ্যে সুজী নামে একখানি গ্রাম দেখিয়াছিলাম। এই স্থানের কর্ণালীর অপর পারে যুদিথর নামে সদুর্গ একটি স্থান আছে। তাহা আমাদের গমনপথ হইতে বেশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। তুষারমণ্ডিত হিমালয় আর কর্ণালীকে দক্ষিণদিকে রাখিয়া অগ্রসর হইতে

লাগিলাম। যাইতে যাইতে হিমালয়কে দেখিলাম, যেন তুষারমুকুট ধারণ করিয়া নগাধিরাজ—পৃথিবীর মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গর্ব্বোন্নত অভিষিক্ত মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহাই ঘোষণা করিতেছেন। এই মুকুটের পশ্চাদ্ভাগ তিব্বতের দিকে আর সম্মুখভাগ আমাদের ভারতের দিকে। গমনকালে আমার ভুটিয়া পথিপ্রদর্শক পাহাড়ের একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "অদূরে ঐ যে উন্নত স্থান দেখিতে পাইতেছেন, উহার নিকট ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—ঐ স্থানে তিনি ঘোর তপস্যা করিয়া অসাধারণত্ব লাভ করিয়াছিলেন!" ঐ স্থানে লইয়া যাইবার জন্য আমার সঙ্গীকে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন, ৩।৪ মাইল ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ স্থানে রাস্তা গিয়াছে, আর উহা বড় দুর্গম। এ সময় উক্ত স্থানে যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম। প্রত্যাগমনের সময় দেখিয়া যাইব মনে করিলাম।

সূর্য্যদেব যত মস্তকের উপর কিরণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার উগ্রতা অনুভূত হইতে লাগিল। শরীরের নিম্নভাগ যেন জমিয়া যাইতেছে, আর মস্তক যেন দগ্ধ হইতেছে। এইরূপ শীত ও গ্রীষ্ম যুগপৎ উভয়ই ভোগ করা গেল। দিবাবৃদ্ধির সহিত বায়ুও প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সময় সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরকণিকা পথিকের মুখমণ্ডলে বিদ্ধ হইয়া থাকে। খোজরনাথের পথে তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পার হইতে হইয়াছিল।

রাস্তা খুব নির্জ্জন, সময় সময় দুই এক জন স্থানীয় গ্রামবাসী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিতেছিল। দুই এক জন মেষপালক দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এক জন পুরুষ ও এক রমণী ৪।৫ বৎসরের বালক লইয়া গমন করিতেছিল দেখিয়াছিলাম।



খোজরনাথের মন্দির।

তাহাদের পরিচ্ছদ দেখিয়া নিতান্ত নিঃস্ব বলিয়া বোধ হয় নাই। পুরুষ বোঝা লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিল, বালকসহ রমণী গবাদির গোময় সংগ্রহ করিতে করিতে গমন করিতেছিল। এ দেশে জ্বালানী কাঠের অভাব পূরণ করিবার জন্য মেষাদির শুষ্ক পুরীষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভূমির সহিত মিলিত এক প্রকার ছোট ছোট গাছ আছে, তাহা কাঁচাই প্রজ্বলিত হয়, তাহাও ইন্ধনের জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

এই সকল দেখিতে দেখিতে খোজরনাথের নিকটবর্ত্তী হইলাম। কর্ণালীর বাঁকের উপর ইহা স্থাপিত হওয়াতে দৃশ্যটি বেশ সুন্দর হইয়াছে। মানস খণ্ডে কথিত হইয়াছে যে, এই পুরী বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। কালপ্রভাবে সে পুরী নষ্ট হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু সে স্থানে কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই। নদীও পূর্ব্বকালের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে, নিকটবর্ত্তী গৈরিক প্রভৃতি বর্ণের পর্ব্বতও পূর্ব্বের মত উন্নতশিরে অবস্থান করিতেছে। এজন্য ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্যও অধিকতর সুন্দর হইয়াছে। অনেক য়ুরোপীয় বলেন, হিন্দুর সৌন্দর্য্য-জ্ঞান নাই। এ কথা কখনই শ্রদ্ধেয় নহে। যিনি ওঙ্কার মান্ধাতার নর্ম্মদার দৃশ্য দেখিয়াছেন, তিনি কখনই এ কথার উপর আস্থাস্থাপন করিবেন না। অথবা যিনি কন্যা কুমারিকা, কিংবা সোমনাথের প্রাচীন মন্দিরের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের দৃশ্য দর্শন করিয়াছেন, তিনিও এ কথা অনভিজ্ঞের প্রলাপোক্তি বলিয়া উপেক্ষা করিবেন।

নদীর তটের নিকট দ্বার দিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলাম। অন্ধকার কক্ষের ভিতর দিয়া মন্দিরের আঙ্গিনায় উপস্থিত হওয়া গেল। প্রথমে রাম-সীতার মন্দির—অপর মন্দিরে মহাকাল মহাকালী— যন্ত্রের

চতুর্দ্দিকে বুদ্ধদেবের বিভিন্ন সময়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি—এ সকল মূর্ত্তি আমাদের কালী-তারা-মূর্ত্তির অনুরূপ। এক জন লামা অন্ধকারপ্রায় গৃহে এই সকল মূর্ত্তি দেখাইয়া দীপের ঘৃতের জন্য কিছু আদায় করিলেন। যে সময় মন্দিরমধ্যে উপস্থিত হই, সে সময় লামারা মহাকালের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভোজনকার্য্য সম্পন্ন করিতেছিলেন। এই সকল দেখিয়া ভগবান্ রামচন্দ্রের মন্দিরে উপস্থিত হওয়া গেল।

মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের ধাতুময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গেল। বিগ্রহগুলি বেশ সুগঠিত, ইহাতে কারুকরের কর্ম্মকুশলতা বেশ প্রকটিত হইয়াছে। নিপুণ শিল্পী প্রতিমাত্রয়ের মুখশ্রীতে উৎসাহ, দৃঢ়তা ও বিক্রমব্যঞ্জক ভাব বেশ ভাল করিয়া ফুটাইয়াছেন। অলসভাবে আসীন অবস্থায় অবস্থান না করিয়া দেবতারা যেন কর্ম্মের জন্য সদাই উদ্যুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। প্রতিমার সম্মুখে ও পার্শ্বদ্বয়ে দীপাধারশ্রেণী রচিত হইয়াছে। এই দীপপুঞ্জ প্রজ্বালিত হইলে এ স্থানের শোভা বহুগুণে বিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ফলফুলের দেশের দেবতা, এই বরফের দেশে ধূপ আর দীপ দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন। এই স্থানে আরও কয়টি মূর্ত্তি দেখিলাম; সঙ্গের লোকটি কহিলেন, ইহা ঋষিসপ্তকের প্রতিমা। এক দল ভুটিয়া যাত্রী "দর্শন" করিতে আসিয়াছেন; তাঁহারা এই স্থানে রাত্রিবাস করিয়া যাইবেন।

শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ভুটিয়ারা বহু অর্থ ও অলঙ্কারাদি অর্পণ করিয়া থাকেন। কয় বৎসর অতীত হইল, এই মন্দিরে আগুন লাগিয়া সব পুড়িয়া গিয়াছিল। লামারা বহুকষ্টে প্রতিমাত্রয় রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই অগ্নিতে মন্দিরের বহু দিনের সঞ্চিত বহু দ্রব্য ভস্মীভূত হয়।

রাত্রিযাপন কোথায় করা যাইবে, এখন তাহাই হইল চিন্তার বিষয়। মন্দিরের আঙ্গিনার উপর একখানি দোতলা ঘর দেখা গেল। যদি ইহা অপেক্ষা ভাল ঘর না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই স্থানেই থাকা যাইবে, স্থির করা গেল। খোজরনাথের মঠ এ অঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ। এই মঠ দেখিবার জন্য মন্দিরের ফটক অতিক্রম করিয়া বাহিরে উপস্থিত হইলাম। সম্মুখভাগে খানিকটা খালি যায়গা; তাহার একটু উপরে শস্যক্ষেত্রের মধ্যস্থলে খোজরনাথের সুপ্রসিদ্ধ মঠ।

মঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া আমার আগমনবার্ত্তা মঠাধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে প্রেরণ করিলাম। মঠ দ্বিতল; নিম্নে গবাদি পশু আর ভৃত্যবর্গ অবস্থান করে। উপরে লামা মহাশয়রা অবস্থান করিয়া থাকেন। অনতিবিলম্বে উপরে যাইবার জন্য আহূত হইলাম। আমার ভুটিয়া সঙ্গীটি আমার পরিচয়ে বলিলেন, আমি এক জন বড়-দরের কাশীলামা, দেশে নামডাকও বেশ আছে, আর এই সকল লোক আমার সঙ্গী। এইরূপ বাড়াইয়া বলিয়া তিনি আমার পরিচয় দয়াছিলেন। আমরা যে স্থানে বসিয়াছিলাম, তাহার সম্মুখভাগে ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি, বামদিকে স্বতন্ত্র আসনে মঠাধীশ লামা মহাশয়। দক্ষিণভাগে ২।৩ বৎসরের একটি বালক শিক্ষানবীশ, আর দুই জন প্রৌঢ় লামা উপবেশন করিয়াছিলেন। বসিবার স্থানটি বেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। বিস্তৃত আসন পাতা দেখিয়া বুঝিলাম, ভক্ত যাত্রীর দল সর্ব্বদা গমনাগমন করিয়া থাকেন। অভ্যর্থনা ও প্রথম আলাপের পর চা-পানের জন্য অনুরুদ্ধ হইলাম। আমার সঙ্গীরা চা-পাত্র গ্রহণ করিলেন। আমি বিনয়ের সহিত চা-পানে অভ্যস্ত নাহি, নিবেদন করিলাম। আমার পানের জন্য স্বতন্ত্র পেয় ব্যবস্থা হইল। এ পেয় আর কিছু নহে, তক্র। দীর্ঘপথ অতিক্রমণ করায় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলাম।

এ সময় এ তক্র শক্রদুর্ল্লভ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বহুদিন এরূপ অম্লরসযুক্ত পেয় পান করি নাই। তক্র একটু বেশী অম্ল হইলেও বেশ শ্রান্তি দূর করিয়াছিল। তিব্বতে আরও দুই এক স্থানে এইরূপ তক্রে সংকৃত হইয়াছিলাম। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, ভুটিয়া ও তিব্বতীরা যথেষ্ট তক্র পান করিয়া থাকেন। জানি না, তাঁহাদের স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইবার পক্ষে ঘোল একটা কারণ কি না। ঘোলভক্ত ম্যাচিনিকফ ইহার মহিমা কীর্ত্তন করাতে এখন আমাদের দেশের "বাবু"-মহলে ইহার নষ্ট মহিমা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা মুক্তকণ্ঠে ঘোলের সুখ্যাতি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন :—

> ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচি-
> ন্ন তক্রদগ্ধাঃ প্রভবন্তি রোগাঃ।
> যথা সুরাণামমৃতং সুখায়
> তথা নরাণাং ভুবি তক্রমাহুঃ।

ঘোলসেবী কখন ব্যথিত হয়েন না, তক্রদগ্ধ রোগ সকল পুনরুৎপন্ন হয় না। দেবতাদিগের পক্ষে অমৃত যেরূপ সুখদ, পৃথিবীতে নরগণের পক্ষে তক্রও সেইরূপ কথিত হইয়া থাকে।

অ-লবণ তক্র পান করিয়া শ্রম ও তৃষ্ণা দূর করিয়া আনন্দলাভ করিলাম।

আমরা যখন ঘোল পান করিতেছিলাম, সেই সময় এক পরিচারক আসিয়া লামা মহাশয়দিগকে চা পরিবেশন করিয়া গেল। চা'র সহিত কিছু কিছু ছাতুও দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপ চা ও ছাতু ১০।১৫ মিনিট অন্তর তাঁহারা সেবন করিতে লাগিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা আমি তাঁহাদের কাছে বসিয়াছিলাম। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে

আমি তাঁহাদিগকে, বিশেষতঃ প্রধান লামা মহাশয়কে কোনরূপ অঙ্গচালনা করিতে দেখি নাই; মর্ম্মর-মূর্ত্তির ন্যায় যে ভাবে বসিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই ছিলেন। চা-পানের সময় সপাত্র হস্ত ধীরে ধীরে মুখের কাছে উঠিতেছিল, আর ধীরে ধীরে নামিতেছিল। এ অবস্থাতেও অপর কোন মাংসপেশীর সঞ্চালন পরিলক্ষিত হইল না। ইঁহাদের অপেক্ষাও সেই ছোট বালকের তিতিক্ষা, সংযম ও আসনসিদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। আমাদের দেশের বালক এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কত দৌড়াদৌড়ি, কত হাসি-কান্না, কত চঞ্চলতা দেখাইত; এই ২।৩ বৎসরের বালকের কোনরূপ চঞ্চলতা দেখিতে পাওয়া গেল না। ভবিষ্যৎকালে এই ক্ষুদ্র বালক প্রধান লামার পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া এখন হইতে তাহাকে সেই পদের উপযুক্ত হইবার জন্য শিক্ষিত করা হইতেছে। বাল্যকালই শিক্ষার উৎকৃষ্ট সময়, এই সময় হইতে বালককে ভাবনা দ্বারা ভাবিত না করিলে, সে উচ্চস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয় না। আমাদের দেশে যেরূপ গোলাম হয়, পৃথিবীমধ্যে সেরূপ উৎকৃষ্ট গোলাম বোধ হয় আর কোথাও হয় না। লোকনায়ক হওয়াও শিক্ষাসাপেক্ষ। অনুচিকীর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া গোলাম, নায়ক সাজিতে পারে, কিন্তু কার্য্যের সময়, পরীক্ষার সময়, স্খলিত-পদ ও বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া থাকে। সে কালে ভারতীয় মাতারা পুত্রকে শিক্ষা দিতেন, "হে পুত্র! তুমি জনগণের নিয়ন্তা, দুষ্টের দমনকর্ত্তা, তুমি সহায়সম্পন্ন অথবা সহায়হীন হও না কেন, তথাপি তোমাকে যাবজ্জীবন এইরূপ অনুষ্ঠান-পরায়ণ হইতে হইবে।"

নিযচ্ছন্নিতরান্ বর্ণান্ বিনিঘ্নন্ সর্ব্বদুষ্কৃতঃ।
সসহায়োঽসহায়ো বা যাবজ্জীবং তথা ভবেৎ॥



তাকলাকোট।

এরূপ ভাবনায় ভাবিত পুত্র লোক-নায়কপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন।

যে সময় লামা মহাশয়ের সহিত আমার কথাবার্ত্তা হয়, সে সময় কতিপয় নেপালী ভক্ত উপস্থিত হয়েন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন আমাদের মধ্যে দোভাষীর কার্য্য করিয়া আলাপের পক্ষে সুবিধা সম্পাদন করিয়াছিলেন। একখানি হিন্দী গীতা মঠের পুস্তকাগারে রাখিবার জন্য আমি উপহার প্রদান করি। লামা মহাশয় গীতার কিছু কিছু শুনাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আর শুনিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। এ উপলক্ষে সাধন-ভজন সম্বন্ধেও কিছু আলাপ হয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে কথা শুনিবার জন্য সকলে আগ্রহান্বিত ছিলেন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধ প্রসঙ্গ শুনিবার জন্য লামা মহাশয়ও যথেষ্ট ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। লামা মহাশয়ের কেন, তিব্বতীয় জনসাধারণেরও জার্ম্মাণ-অনুরাগ, জার্ম্মাণ পক্ষপাতিত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। জার্ম্মাণদের রণ-কৌশল, অভিনব অস্ত্র-শস্ত্রের আবিষ্কার প্রভৃতি কথা শুনিয়া সকলে আনন্দ অনুভব করিত। ইহার সঙ্গে নিজের নিজের উদ্ভাবিত কথা মিলাইয়া তাহারা জার্ম্মাণ বল বিক্রম প্রভৃতিকে শত শত গুণে বিবর্দ্ধিত করিয়াছিল। সময় সময় প্রকৃত অবস্থা কহাতে, সে কথা তাঁহাদের মনোরঞ্জক না হওয়াতে তাঁহারা আমার প্রতি সন্দেহের দৃষ্টিপাতও করিয়াছিলেন!

তিন ঘণ্টা এক আসনে অবস্থান করিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যে তাঁহাদের সুজনতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ইহার ভিতর কৃত্রিমতা বোধ হয় নাই। ইঁহাদের মধ্যে মুহুর্মুহুঃ চা-পানের ব্যবস্থা দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু চা-পানজনিত কোন প্রকার অসুখ তাঁহাদের মধ্যে দেখি নাই। সম্ভবতঃ প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়াতে কিছু বৈশিষ্ট্য

আছে। চা'য়ে তিব্বতীরা নবনীত প্রভৃতি মিলিত করিয়া পান করিয়া থাকেন। ইহাতে বোধ হয়, চা'র অপকারিতা নষ্ট হইয়া যায়। অগাধ পাণ্ডিত্যের আধার ভারতের গৌরব মহামতি হেমচন্দ্র বিলাসী শ্রমণদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইল ;—

মৃদ্বী শয্যা, প্রাতরুত্থায় পেয়া,
মধ্যে ভক্তং পানকাং চাপরাহ্নে।
দ্রাক্ষাখণ্ডং শর্করা চার্দ্ধরাত্রে,
মোক্ষশ্চান্তে শাক্যসিংহেন দৃষ্টঃ ॥

কোমল শয্যা, প্রাতঃকালে উঠিয়া দুগ্ধপান (সম্ভবতঃ সে সময় ভারতে চা'র প্রচলন হয় নাই।) মধ্যাহ্নে অন্ন, অপরাহ্নে পানা, মধ্য-রাত্রিতে দ্রাক্ষাখণ্ড ও শর্করা আর অন্তকালে, শাক্যসিংহ মোক্ষের বিধান ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ শ্লেষবাক্য সকল শ্রমণের প্রতি প্রযুক্ত না হইতে পারে, ইঁহাদের ভিতর সাধন-ভজনসম্পন্নও অনেকে আছেন। কদাচারীর সংখ্যাও কম আছে বলিয়া বোধ হয় না।

মঠাধীশ মহাশয় আমাদের ভোজনের জন্য তণ্ডুল ও নবনীত ব্যবস্থা করিয়া অতিথিসৎকার করেন। ক্ষেত্রে "বেতো" শাক ছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া ভোজনের ব্যবস্থা বেশ ভালই হইয়াছিল।

লামা মহাশয় আমার শয়নব্যবস্থা উপরেই করিয়াছিলেন—আমি কাশী-লামা কি না, সেই জন্যই আমার প্রতি তাঁহার এই সম্মান। আমার সঙ্গের লোক, অসংযত হইয়া শয়ন করিয়া এ স্থানের পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না, সেই জন্য তাহাদের শয়ন-ব্যবস্থা নিম্নে করা হইয়াছিল। আমার প্রতি এই অনুগ্রহের জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, প্রবাসকালে সঙ্গের লোকের সহিত একত্র

সুখ-দুঃখ ভোগ করা উচিত। ইহা শুনিয়া তিনি প্রসন্ন হইলেন, আর আমার কথার অনুমোদন করেন।

রাত্রিকালে আর একবার মন্দিরে গমন করি। সে সময় দীপ-মালার আলোকে উদ্ভাসিত মন্দিরে তিব্বতী ও ভুটিয়া নরনারী আগমন করিয়া দীপদান, প্রণতিপাত প্রভৃতির দ্বারা ভক্তি প্রকাশ করিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া প্রত্যাগমন করিলাম। আমাদের ঘরের পাশেই প্রণালী (নালী) দিয়া পরিষ্কার জল প্রবাহিত হওয়াতে কোনরূপ জলকষ্ট হয় নাই। তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া ক্ষুদ্র ঘরে শয়নব্যবস্থা করা গেল। দরজার কাছে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকায় শীতের প্রকোপও অধিক অনুভূত হয় নাই। এইরূপে শয়ন করিয়া সুনিদ্রায় রাত্রিযাপন করিলাম।

প্রাতঃকাল হইল। তাকলাকোট গমনের উদ্যোগ করা গেল। কেহ কেহ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, এই স্থানে কিছু ভোজন করিয়া গমন করিলেই ভাল হয়। আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না; সুতরাং গমনের জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। অসময়ে লামা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া তাঁহার লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইয়া বিদায় লইলাম; আমার শ্রদ্ধার সহিত সম্মান-প্রদর্শনের কথাও নিবেদন করিয়া পাঠাইলাম। লামা মহাশয় থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

প্রায় ৬টার সময় শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিয়া খোজরনাথ পরিত্যাগ করিলাম। কর্ণালীর তট দিয়া গমন করিয়া একটু উচ্চ স্থানে উঠিয়া মন্দিরের দিকে শেষ দৃষ্টিপাত করিয়া লইলাম। সূর্য্যদেবের উদয়ের সহিত মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগের পাহাড়ের আর তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যও ভাল করিয়া দেখিয়া

লইলাম—সুহাসিনী প্রকৃতি দেবী যেন স্মিতহাস্যে আমাকে বিদায় প্রদান করিলেন। একটু গমনের পর খোজরনাথের মন্দির চির-কালের জন্য আমার চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য হইয়া গেল। আত্মীয়-বন্ধু প্রভৃতির জন্য মনটা যেন ব্যাকুল হইল। প্রিয়জনসহ মিলিত হইয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য ভোগ করিলে না জানি কতই মধুর বোধ হইত।

কিয়ৎকাল গমন করিবার পর এক দল তীর্থযাত্রী অশ্বারোহীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। পরিচয়ে অবগত হইলাম, তাঁহারা চুম্বী উপত্যকা হইতে আগমন করিয়াছেন। প্রায় ৬ মাস হইল তাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই যেন স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি—তাঁহাদের আনন্দ, স্ফূর্ত্তি ও মুখশ্রীতে তেজস্বিতা দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছিলাম। দলপতি মহাশয়, আমি বাঙ্গালী অবগত হইয়া, ব্যবসা উপলক্ষে তাঁহার কলিকাতা-গমনবিষয়ক অভিজ্ঞতার কথা কহিলেন। এই দলের মধ্যে একজন জটাজূটধারী সন্ন্যাসী ছিলেন। দলপতি মহাশয় তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার মুখশ্রীতে একটু অপূর্ব্বত্ব ছিল—একটু দেবভাব ছিল। প্রত্যেকের সহিত আলাপ করিলাম। আমাকে তাঁহাদের সঙ্গী করিতে পারেন কি না, সে বিষয় অনুসন্ধানও করিলাম। দলপতি মহাশয় পথের কঠোরতা, আর ভোজনাদির ক্লেশের কথা কহিলেন, আমি তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হইব না বলিয়া তিনি স্মিতহাস্যে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। খোজরনাথ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি তাকলাকোটে আমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া গমন করিলেন।

এই অল্পসময়ের মধ্যে তাঁহাদের সহিত যেন আত্মীয়তা সংস্থাপিত হইয়াছিল—আমরা পরস্পর হৃদয়ের কথার আদান-প্রদান

করিয়াছিলাম। সেই জন্যই উভয় হৃদয়ের সম্মিলন হইয়াছিল। যে ভাষায় আমরা কথোপকথন করিয়াছিলাম—যে ভাষার প্রভাবে সে সময়ের জন্য আমরা এক-হৃদয় হইয়াছিলাম—তিব্বতের এই নির্জ্জন প্রদেশ যে ভাষার জন্য আমার স্মরণীয় হইয়া আছে, সেই হিন্দীভাষা এক দিন ভারতের সাধারণ ভাষায় পরিণত হইবে, এ কথা চিন্তা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

রাস্তা অত্যন্ত নির্জ্জন—বায়ু বেগে প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্যের উত্তপ্ত কিরণে মস্তক যেন পুড়িয়া যাইতেছে, শীতে পা যেন খসিয়া যাইতেছে, এরূপ অবস্থায় আমি যখন একাকী গমন করিতেছিলাম, সেই সময় ৬ জন অশ্বারোহী, পৃষ্ঠে বন্দুক, কটিতে তরবারি বাঁধিয়া আমার নিকট দিয়া গমন করিল। তাহারা আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গেল। তাহাদের পশ্চাতে একটি স্ত্রীলোক অশ্বারোহণ করিয়া পুরুষদের ন্যায় অস্ত্র-শস্ত্র-সুসজ্জিতা হইয়া গমন করিতেছিল। আমার নিকট আসিলে আমি তাহার লক্ষ্যের বিষয় হইলাম। সে তাহার মস্তকের আবরণ উত্তোলন করিয়া ক্রূর দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। তাহার দেখিবার ভঙ্গী দেখিয়া আমার মনে একটু সন্দেহ উপস্থিত হইল। আমার চক্ষুতে চক্‌চকে নিকেলের চশমার উপর বোধ হইল যেন তাহার লোলুপদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। যখন সে আমাকে ভাল করিয়া দেখিয়া দ্রুতবেগে অশ্বপরিচালনা করিল, তখন আমার সন্দেহ গাঢ়তর হইয়া আসিল। যখন সেই দানবী যমরাজসহোদরসম পুরুষের সহিত কিছু কথা কহিয়া আমার দিকে আগমন করিতে লাগিল, তখন আমি আত্মরক্ষাবিষয়ক কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। ইষ্টদেবতা, পিতা-মাতা, জন্মভূমি, প্রিয়জন প্রভৃতির কথা বিদ্যুল্লেখার মতন আসিল ও চলিয়া গেল। মৃত্যুর জন্য আমি



চশমার খাপ হস্তে শাস্ত্রী।

কাতর নহি, কিন্তু কাপুরুষের মত মরিব না; অতএব এখন কি করিব, কেমন করিয়া বিপুলবলশালী সশস্ত্র দস্যুকে পরাজিত করিয়া বিজয়লাভ করিব, কেমন করিয়া বিদেশে-বিভূমে শরীরটা রক্ষা করিব, এইরূপ নানা চিন্তা আসিয়া আমাকে আকুল করিয়া ফেলিল। একটা উপায় উদ্ভাবন করিলাম—ইহাদিগকে এরূপ ভাব দেখাইব যে, ইহারা স্তম্ভিত হয়; ইহারা মনে করে, আমি ইহাদের সমবেতশক্তি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী—আমার নিকট ইহারা তুচ্ছ হীনাদপি হীন। যখন দস্যুরা আমার ২০ হাত দূরবর্ত্তী হইল, তখন আমার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহাদের দিকে ২।৩ পা অগ্রসর হইলাম। অট্ট অট্ট হাস্য করিয়া—অবশ্য দাঁতের হাসি হাসিয়া—তাহাদিগকে দেখাইয়া পকেট হইতে চশমার খাপখানি রিভলবারের ন্যায় ধরিয়া বজ্রনির্ঘোষে কহিলাম—আমার এ ভাষায় বাঙ্গালা, হিন্দী, দুই চারিটা যাহা তিব্বতী শিখিয়াছিলাম, সেই সকলের সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত ভাষা রচনা করিয়া কহিলাম—"সাবধান, যদি আর এক পা অগ্রসর হও, তাহা হইলে যমলোকের অতিথি হইতে হইবে।" এই বলিয়া আমি আমার চশমার কোষ তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিলাম। তাহারা সম্মোহিত হইল—আর অগ্রসর হইল না; যেন স্পন্দনহীন হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিল। যখন বুঝিলাম, আমার উপায়ে ফল ফলিয়াছে, তখন তাহাদিগকে আবার ভরসা দিলাম, "চলিয়া যাও। আমি তোমাদিগকে হত্যা করিব না। আমি তীর্থযাত্রী"। হস্ত দিয়া বার বার তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে আজ্ঞা করিলাম। মন্ত্র-মহৌষধি-মুগ্ধ সর্পের ন্যায় যখন তাহারা বিনত হইয়া ঘোড়ার মুখ ফিরাইল, তখন আমার আর আনন্দের সীমা ছিল না। এই অভূতপূর্ব্ব বিজয়-লাভে মনে মনে অর্জ্জুনসখা শ্রীভগবচ্চরণে অসংখ্য প্রণাম করিলাম।

আমি সিংহের ন্যায় গম্ভীরভাব অবলম্বন করিয়া আমার গন্তব্য স্থানের অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কেবল একবার পশ্চাতে ফিরিয়া তাহাদের গতি দেখিয়া লইলাম। পাছে তাহাদের মোহ ভাঙ্গিয়া যায়, এই ভয়ে পশ্চাতে চাহিতে শঙ্কা হইতেছিল। এইরূপে যমের মুখ হইতে—সর্ব্বস্বান্ত হইবার উপক্রম হইতে রক্ষা পাইলাম। যে সময় আমি দস্যুদিগকে এইরূপে অভিভূত করি, সে সময় আমার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়াছিল, আমার সমস্ত শরীর, স্বর, এমন কি আমার শ্বেতবর্ণের সুদৃঢ় দন্তপংক্তিও আমার এই সম্মোহন ব্যাপারে কম সাহায্য করে নাই।

১৪।১৫ হাজার ফুট উচ্চ ভূমির উপর দিয়া আমাকে এ সময় চলিতে হইয়াছিল। এ স্থানে শুষ্ক বায়ু শ্বাসকৃচ্ছ্রতা আনয়ন করিয়া আমাকে একটু অবসন্ন করিয়াছিল। পুরাতন তেঁতুল আর মিছরী পকেটে রাখিতাম। ক্ষুধার্ত্ত হইলেও রাস্তায় কোন প্রকার খাবার পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। দিবা প্রায় ১টার সময় ৯।১০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাকলাকোটে ভুটিয়া-বাজারে উপস্থিত হইলাম।

আমার সঙ্গীরা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমার রাস্তার বিপদের কথা আমি সকলের কাছে বিবৃত করিলাম। এক জন সঙ্গী কহিল, "আমি সঙ্গে থাকিলে প্রস্তর ছুড়িয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতাম।" এই কথা শুনিয়া আমি কহিলাম, "ভগবান্ এই জন্যই বোধ হয়, তোমাকে আমার সঙ্গে রাখেন নাই। তুমি সঙ্গে থাকিলে বিপদ্ ঘনীভূত হইত, আর দস্যুদের হস্ত হইতে কোনরূপে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না।" তিব্বতী নর-নারী

প্রস্তরচালনায় অভ্যস্ত। এ কায তাহারা শিক্ষা করিয়া থাকে। শারীরিক বলে সেই স্ত্রীলোকটি অবলীলাক্রমে আমার মত ১০ জনের নিগ্রহ করিতে সমর্থা ছিল।

এই ঘটনা শুনিয়া ভুটিয়ারা আমাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। এক জন তাঁহার কর্ম্মচারীর নির্ব্বুদ্ধিতা ও অর্থহানির কথা দুঃখের সহিত কহিলেন। কিছু দিন হইল, তিনি তাঁহার এক কর্ম্মচারীর হাতে ৪ শত টাকা দিয়া কিছু ভেড়ার লোম ক্রয় করিতে পাঠান। যে রাস্তা দিয়া ভুটিয়া যাইতেছিল, সেই রাস্তায় এক জন লামা ধর্ম্মচক্র ঘুরাইতে ঘুরাইতে উপস্থিত হয়। ভুটিয়া তাহাকে ডাকাইতদের অগ্রদূত বিবেচনা করিয়া অতি সাবধানতা অবলম্বন করিয়া একটা পাথরের নীচে সমস্ত টাকা লুকাইয়া রাখে। ভিক্ষুক লামা, ভুটিয়ার কার্য্য দূর হইতে দেখিতেছিল। ভুটিয়া চলিয়া না গিয়া সেই স্থানের আশপাশে গমনাগমন করিতে থাকে। লামা যে সময় সেই স্থানে উপস্থিত হইল, তখন ভুটিয়া একটু দূরে চলিয়া গেল। যে স্থানে ভুটিয়া টাকা লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সেই স্থানের পাথর সরাইয়া লামা সমস্ত টাকা হস্তগত করিল। ভুটিয়া দ্রুতবেগে সেই স্থানে আসিয়া নিম্ন হইতে লামাকে আক্রমণ করিল। লামা উপর হইতে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া ভুটিয়াকে বিবশ করিয়া ফেলিল। ভুটিয়াকে পরাভূত দেখিয়া লামা মহাশয় উপরে উঠিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলেন।

অনেক সময় অবকাশ পাইলে সাধুও অসাধু হইয়া থাকেন। ভুটিয়া যদি বিভীষিকাগ্রস্ত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহার অর্থনাশ হইত না।

ভুটিয়া বন্ধুরা আমার আত্মরক্ষা, দস্যুগণকে সম্মোহিত করা প্রভৃতি বিষয় লইয়া বেশ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

তাকলাকোট হইতে কৈলাস প্রায় ৪ দিনের রাস্তা। কৈলাসের এত নিকটে আসিয়া অভীষ্ট স্থানে না পৌছিয়া তাকলাকোটে অবস্থানটা যেন বিষের মতন বোধ হইতে লাগিল। তাকলাকোটে যে কয়দিন ছিলাম, আমার দুইটি কার্য্য ছিল—প্রথম শীঘ্র শীঘ্র কৈলাস যাইবার জন্য ভুটিয়া যাত্রিগণকে উৎসাহিত করা—আর তাকলাকোটের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল পরিদর্শন করা।

ইতঃপূর্ব্বে আমি উল্লেখ করিয়াছি যে, এ বৎসর কৈলাসের কুম্ভের বৎসর—তিব্বতীদের "ঘোটক-বৎসর"। এই ঘোটকের আবার বিভিন্ন বিভিন্ন নাম আছে। যথা,—অগ্নি-ঘোটক, জল ঘোটক, লৌহ-ঘোটক, কাষ্ঠ-ঘোটক প্রভৃতি। এই ঘোটক-বৎসরে যেমন বহু দূরদেশ হইতে যাত্রিদল পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য আগমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ দূরদেশ হইতে প্রসিদ্ধ দস্যুদলও অর্থ ও পুণ্য উভয় সংগ্রহের জন্য আগমন করিয়া থাকে। যাত্রী ও দস্যুর কিছু কিছু নমুনা ইতঃপূর্ব্বে পাইয়াছি।

এখনও সব যাত্রী আসিয়া মিলিত হয় নাই। মিলিত না হইয়াও কেহ যাইতে সাহসী হইতেছে না। লালসিংএর মাতা কৈলাসে যাইবেন—এই দলের সঙ্গে ৩।৪টা বন্দুক আর ২।৩টি তাঁবু থাকিবে। লালসিং এই দলের সহিত যাইবার জন্য আমাকে পরামর্শ দিলেন। আমিও ইহা সুবিধাজনক বিবেচনা করিয়া গমনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

এখন আমার বিশেষ কোন কায নাই; কেবল তাকলাকোটের আশ-পাশ দেখা আর যাত্রীদের সহিত মিলিত হইয়া যাত্রার দিন

স্থির করা। যাহাতে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় কৈলাসে পৌছান যায়, এই কথা যাত্রীদিগকে বুঝাইয়া দিলাম, আর সে জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলাম।

সাধু-সন্ন্যাসী খোঁজা আমার একটা 'বাই' ছিল। এই 'বাই'এর বশবর্ত্তী হইয়া অনেক স্থানে আমি গমন করিয়াছি। ভুটিয়াদের কাছে শুনিলাম, অনেক ভারতীয় সন্ন্যাসী এ দেশে আসিয়া লামাদের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া সিদ্ধিলাভের জন্য কঠোর সাধনা করিয়া থাকেন। আমার ভারতীয় সাধু দেখিবার জন্য আগ্রহটা বেশী হইয়াছিল।

ভুটিয়াদের কাছে এক জন ভারতীয় সাধুর কথা শুনিয়াছিলাম, তিনি "ময়ূর-পঙ্খী বাবা" নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি তিব্বতীদের কাছেও ভক্তিভাবে পূজিত হইতেন। তাঁহার মস্তকে পাগড়ীর উপর ময়ূরপুচ্ছ থাকিত বলিয়া তিনি ময়ূরপঙ্খী বাবা নামে সাধারণে পরিচিত ছিলেন। শুনিয়াছিলাম, শীতের কয়মাস তিনি বৃন্দাবন-নগরায় অবস্থান করিতেন; নিদাঘে প্রতি বৎসর কৈলাস যাত্রা করিতেন। এইরূপ বহু বৎসর তিনি নিয়মিতরূপে কৈলাস-গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার গমন-শক্তি অদ্ভুত ছিল। আমরা যে পথ দুই দিনে অতিক্রম করিতে অবসন্ন হইয়া পড়ি, তিনি অবলীলাক্রমে এক দিনে তাহা অতিক্রম করিতেন। আনন্দের তিনি যেন উৎসস্বরূপ ছিলেন। তিনি আনন্দমূর্ত্তি হইলেও তিব্বতে যে সকল ইংরাজ আগমন করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি রুদ্র-মূর্ত্তি ধারণ করিতেন। এক সময় এক জন ইংরাজ রাজপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ভুটিয়ারা বলেন, তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করিয়া কহেন, "তিব্বত কেন অপবিত্র করিতে আগমন করিয়াছ?"

এ ভূমি তোমাদের জন্য নহে; এ স্থান হইতে দূর হও!" তাঁহার মৃত্যুও অদ্ভুত, তিনি রোগহীন শরীরে কৈলাসে আগমন করিয়া সঙ্গীয় লোককে কহেন, "এ শরীর আর বহন করিব না।" এই কথা কহিয়া তিনি সমাধিস্থ হইয়া কৈলাস পরিক্রমার প্রারম্ভস্থান দারচীনে দেহরক্ষা করেন। দারচীনে একটি ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিবার তাঁহার একবার ইচ্ছা হইয়াছিল। যাত্রীদের দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি তাহা পূর্ণ করেন নাই। তিব্বতীরা তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিত; এমন কি, ডাকাইতরাও তাঁহার নামে ভয়বিহ্বল হইয়া ভক্তি প্রদর্শন করিত। বাঙ্গালীদিগকে তিনি সকরুণ দৃষ্টিতে দেখিতেন। শিষ্য করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার অধিক না থাকিলেও ঢাকা অঞ্চলে তাঁহার কয় জন শিষ্য আছেন। ভুটিয়াদের কাছে এ সব আমি অবগত হই।

তিব্বত সন্ন্যাসীর রাজ্য। এ রাজ্যে সাধারণ সন্ন্যাসীও সর্ব্বত্র ভক্তিভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ভিক্ষার্থী লামা কাহারও দ্বারে উপস্থিত হইলে রিক্তহস্তে কোথাও তিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েন না। আমাদের দেশে কণ্টকশায়ী, উর্দ্ধবাহু, মৌনাবলম্বী প্রভৃতি কঠোর সাধনশীল সাধু দেখিতে পাওয়া যায়; তিব্বতে এই কঠোরতা চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। এক অদ্ভুত সাধুর কথা শুনিলাম, তাঁহার নির্জ্জননিবাস কথা শুনিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। একটি ক্ষুদ্র কুটীর এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা হয় যে, কোনরূপে এক জন লোক তাহার ভিতর শয়ন করিতে পারে। এই গৃহে দুইটি ছিদ্র থাকে, উপরের ছিদ্র দিয়া ধূমনির্গমন হয়। নিম্নের ছিদ্র দিয়া ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ করা হয়।

প্রতিদিন ভোজ্য আর সপ্তাহের পর কিছু কাষ্ঠ ও চা প্রদান করা হয়। লামা মহাশয় চা প্রস্তুত করিয়া পান করিয়া থাকেন।

এই প্রকারে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হয়। যে সময় ভিতরের লামা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে বিরত থাকেন, তখন বাহিরের লামারা অনুমান করেন যে, লামা রুগ্ন হইয়াছেন বা তনুত্যাগ করিয়াছেন। জীবনের যখন কোনরূপ সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না, তখন বাহির হইতে ভিত্তি ভাঙ্গিয়া সাধুর মৃতদেহ বাহির করা হইয়া থাকে।

লামাদের মৃত্যুর পর সাধারণতঃ তাঁহাদের শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া পক্ষীদিগকে ভোজনার্থ প্রদান করা হইয়া থাকে। যাঁহারা নির্জ্জনবাস করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, তাঁহাদিগের শরীর অগ্নিযোগে ভস্ম করা হইয়া থাকে। ভক্তরা এই ভস্মের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এরূপ কঠোর ব্রতাবলম্বী লামার কথা যেমন শ্রবণ করিয়াছি, সেইরূপ সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন, এরূপ অনেক তিব্বতীও দেখিয়াছি।

মধ্যাহ্নকালে সময় সময় লামারা দুর্গ হইতে অবতরণ করিয়া ভুটিয়া বাজারে বেড়াইতে আসিতেন। যে ভুটিয়ার গৃহে আমি আশ্রয় লইয়াছিলাম, তিনি এক জন প্রধান ব্যবসায়ী। তাঁহার দোকান-ঘরে লামারা আসিয়া নানাপ্রকার গল্প করিতেন। ব্যবসায়ী মহাশয় কিস্‌মিস্, ছোহারা প্রভৃতি প্রদান করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন। এই সকল লামার মধ্যে এক জন শিক্ষিত পণ্ডিত লামার সহিত আমার পরিচয় হয়। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ক অনেক গল্প করিয়াছিলেন। যখন তিনি অবগত হয়েন, আমি এক জন বঙ্গদেশীয় কাশী-লামা, তখন তিনি ভক্তিমিশ্রিত ভাষায় প্রাচীনকালে আমাদের বঙ্গদেশ হইতে যে সকল দেবচরিত্র বাঙ্গালী তিব্বতে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম

ও চিকিৎসা-শাস্ত্র সংক্রান্ত নানাপ্রকার জ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সদাচার, সামাজিক শিষ্টাচার প্রভৃতি প্রচলন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা কহিয়া আমাকে অপূর্ব্ব ভাবে অভিভূত করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বনের পূর্ব্বে তিব্বতীরা রাক্ষস-প্রকৃতিপ্রায় ছিলেন। হিংস্রপ্রকৃতির বন্য পশু বশীভূত করা অনেক সময় সহজ; কিন্তু হিংস্র প্রকৃতির মনুষ্যকে সুসভ্য করা, সদাচার-সম্পন্ন করা, সর্ব্বোপরি ঈশ্বরপরায়ণ করা সামান্য কথা নহে। তিব্বতে বাঙ্গালী যেরূপ ভাবের ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন—যেরূপ একনিষ্ঠা, অধ্যবসায়, কর্ম্ম-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহার উদাহরণ নিতান্ত সুলভ নহে। কালের কি বিচিত্র গতি! যে দেশের লোক অন্য দেশবাসীকে ধর্ম্মালোকে আলোকিত করিয়াছেন—জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন করিয়াছেন, আজ তাঁহাদের দেশবাসীকে যিশুর অনুচররা ধর্ম্ম ও শিক্ষা প্রদান করিয়া "আদমী" করিতেছেন। যাউক্ সে সকল কথা। হই না কেন আমি হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান বা ইসাই, যে কোন সম্প্রদায়গত হই না কেন, আমরা বাঙ্গালী—বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য আমাদের নিকট হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে না—আমাদের সকলকে মিলিত হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সে জন্য আমাদিগকে উদার হইতে হইবে। লামা মহাশয়ের নিকট এই সকল প্রাচীন কথা শুনিয়া আর আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবিয়া আমি বিক্ষিপ্তচিত্ত হইতাম।

আষাঢ়ী পূর্ণিমার আর অধিক বিলম্ব নাই। তাকলাকোট হইতে কৈলাস প্রায় ৪ দিনের রাস্তা। অন্ততঃ পূর্ণিমার দিন যাহাতে দারচীন—যে স্থান হইতে কৈলাসের পরিক্রমা আরম্ভ হয়—যে স্থানে তিব্বতীয় রাজকর্ম্মচারী অবস্থান করেন—সে স্থানে পৌছান যায়,

তাহার জন্য যাত্রীদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলাম। আমার উত্তেজনায় ফল ফলিল। ঝব্বু ভাড়ার জন্য লোক প্রেরণ করা হইল—যাত্রিমহলে সকলে প্রস্তুত হইতে লাগিল। সকল দ্রব্য আমার নিকট ছিল; কিছু জলখাবার প্রস্তুত করাইয়া লইলাম। দুগ্ধ চারি আনা সের—ইহাতে চামরী গাই, ছাগী আর ভেড়ীর দুধও মিশ্রিত আছে। এই দুগ্ধের ক্ষীর করিয়া আর তাহাতে শর্করা সংযুক্ত করিয়া বেশ খাবার তৈয়ার করিয়া লইলাম। ইহা প্রস্তুত করিতে ছংগরুর প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ৪।৫ সের দুধের ক্ষীর করিতে কাষ্ঠের বড় কম প্রয়োজন হয় না। প্রধান মহাশয় তাহা যোগাইয়াছিলেন। আর খানিকটা মাখন সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এ দেশে টাট্‌কা মাখন সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন। বহুবর্ষের মাখন সাধারণতঃ বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। প্রবল শীতের জন্য ইহা বিকৃত হয় না। আমার এক ভুটিয়া বন্ধু টাট্‌কা মাখন সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমার ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। ইংরাজ শাসনপ্রভাবে আকুমারিকা—গারবাং পোষ্টকার্ডের মূল্য যেরূপ সর্ব্বত্র সমান, সেইরূপ কলিকাতাতে মাখনের যে দর, এ স্থানে তাহা অপেক্ষা কম নহে। বাণিজ্যের প্রভাবে সর্ব্বত্র সমান মূল্য! অবশ্য গুণে এ স্থানের মাখন যে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলাই বাহুল্য।

দেখিতে দেখিতে ৪ঠা শ্রাবণ ২০শে জুলাই দ্বাদশী শনিবার উপস্থিত হইল। এই দিন আমরা তাকলাকোট পরিত্যাগ করিয়া কৈলাস-দর্শন জন্য প্রস্তুত হই। ঘোটক-বৎসর বলিয়া ঝব্বুর ভাড়া বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। পয়সার দিকে লক্ষ্য না করিয়া ঝব্বু সংগ্রহের জন্য আমাদের ব্যগ্রতাই এই ভাড়াবৃদ্ধির কারণ। প্রাতঃকালে ভোজনাদি সম্পন্ন করিয়া গমনের জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। আমার

বাহনের জন্ত ঘোটক পাওয়া গেল না ; সুতরাং ঝব্বুর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিতে হইবে। ষাঁড়ের উপর চড়িয়া গমন করিতে প্রথম প্রথম একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। কিন্তু কি করি, অন্ত কোন গতি নাই—অগত্যা ইহাতেই রাজী হইয়াছিলাম। এ যে মহা বৃহভবাহনের দেশ। দেবতা যেরূপ, ভক্তও সেইরূপ আচরণ করিবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কোথায়? আরবে উষ্ট্র যেরূপ মরুভূমির জাহাজ, ঝব্বুও সেইরূপ তিব্বতের এই ভীষণ কান্তারের একমাত্র শরণ্য।

এ স্থানে একটা কথা উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। আমার একটা সঙ্কল্প ছিল, প্রত্যাগমনকালে নীতিপথ দিয়া বদরীনারায়ণের রাস্তা যোশী মঠে অথবা তিমিরসিয়ন—গামসালী হইয়া দুর্গম রাস্তা দিয়া হনুমানচটিতে উপস্থিত হইব। আমার সে আশা পূর্ণ হইল না। আমার ভুটিয়া অভিজ্ঞ বন্ধুরা তাহাতে বাধা প্রদান করিলেন। কৈলাস হইতে নীতির রাস্তা বড়ই বিপৎপূর্ণ; হিংস্রপ্রকৃতির ডাকাইতদের ইহা প্রিয় ভূমি। বিশেষতঃ এ বৎসর ঘোটক-বৎসর হওয়াতে ইহাদের সংখ্যা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার প্রতিকূলে যাহা কিছু কহিলাম, তাঁহাদের প্রণয়গর্ভ বাক্যের কাছে সে সমস্তই বিফল হইয়া গেল। নীতিপথের জন্ত এ স্থানে বাহন সংগ্রহের আর ব্যবস্থা করিলাম না। সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম।

প্রায় ১০টার সময় তাকলাকোট পরিত্যাগ করি। আমার ঝব্বুর ইচ্ছা নহে যে, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন। এই জন্ত তিনি তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা দেখাইতে লাগিলেন। মধুর বাক্যেও যখন তিনি সম্মত হইলেন না, তখন প্রহারের ভয় ও প্রহার হইতে লাগিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বেচ্ছাচারী হইলেন; বেগতিক দেখিয়া

আমি পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলাম। তিব্বতী সঙ্গী যখন নাকের দড়ি ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন বেচারী ঝব্বু গৃহের মায়া-মমতা পরিত্যাগ করিয়া ভদ্রভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছুদুর গমন করিয়া আমি তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। ঝব্বুর সহিত প্রথম পরিচয়ে তাহার ঔদ্ধত্য দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলাম, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার সুজনতা দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলাম। 'উঁচু-নীচু'তে উঠা-নামার জন্য আমার আসন শিথিল হইয়া যায় ; ইহার ফলে আমি নীচে পড়িয়া যাই। খালি পড়িয়া গেলে বিশেষ কিছু হইত না—পা রেকাবটিতে আটকান থাকায় আমার অবস্থা যথেষ্ট হাস্যোদ্দীপক হইয়াছিল। রাস্তায় দেখিবার লোক বেশী না থাকায় আমার এ অভিনয় বৃথা হইয়াছিল। ঝব্বু আমাকে টানিয়া লইয়া যাইবার পরিবর্ত্তে বেশ শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সঙ্গের লোক আমাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া নিষ্কৃতি প্রদান করে। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরে পীরপঞ্জাল পর্ব্বত অবতরণকালে ঘোড়া হইতে আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম, সুশিক্ষিত অশ্ব আমার জামা কামড়াইয়া ধরিয়া নিম্নে পতন হইতে আমাকে রক্ষা করে। জীবের প্রতি দয়া আমাদের দেশের পশু-হৃদয় হইতেও বিলুপ্ত হয় নাই। ঝব্বু বা ঘোড়া যদি আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন না করিত, তাহা হইলে আমাকে যে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইত, তাহা বলাই বাহুল্য।

ঝব্বু দল বাঁধিয়া যাইতে বড় ভালবাসে। আমাদের দলে আমরা ৪।৫ জন ঝব্বু আরোহী ছিলাম। ঝব্বু যখন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন করিত, তখন সময় সময় তাহারা সংহত হইয়া গমন করিত। সে সময় আমাদের পায়ে পায়ে লাগিয়া যাইত—বহু চেষ্টায় তাহাদিগকে দূরে দূরে পৃথগ্‌ভাবে লইয়া যাওয়া হইত। একজন মহিলা আরোহী



জোরাবর সিংহের সমাধি।

ঋব্বুর এরূপভাবে গমনকে "কাওয়াইজ করিয়া যাওয়া" সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন।

তাকলাকোট পরিত্যাগের কিয়ৎক্ষণ পরে তোয় নামক গ্রামে বীরবর জোরাবর সিংহের সমাধি দর্শন করিলাম। ঋব্বু হইতে অবতরণ করিয়া ক্ষত্রিয়কুলতিলক জোরাবরের প্রতি একটু বাহ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলাম। আর অন্তরে সেই বিরাট পুরুষকে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া কহিয়াছিলাম, "ভগবন্, যে দেশের সকল শ্রেণী, সকল জাতির ভিতর মহাসত্ত্বসম্পন্ন অসংখ্য পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশে এখন মহাপ্রাণসম্পন্ন পুরুষের দুর্ভিক্ষ কেন? প্রভু! একবিন্দু করুণা বিতরণ কর, তাহার ফলে দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হইবে, সুভিক্ষ আসিবে, আর কোটি কোটি প্রপীড়িত নরনারীর আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইবে।"

অপরাহ্নকালে আমাদের নেতা একটি ক্ষুদ্র জলধারার তটে সিকটার বিস্তৃত প্রান্তরে ডেরা ফেলিবার আদেশ প্রদান করেন। কয় জন লোক তাঁবু তুলিতে লাগিল; আর কয়েক জন লোক শুষ্ক গোময় সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। অনতিকাল পরে তাহারা ছোট ছোট কাঁচা গাছ ও শুক্‌না গোবর লইয়া উপস্থিত হইল। আমাদের শিবিরের অনতিদূরে পর্ব্বতের পাদদেশে ছংগরুর প্রধান দলবলের সহিত অবস্থানস্থান নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। আরও কতকগুলি যাত্রী আমাদের কাছে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে ধীরে ধীরে কৈলাস-যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই যাত্রিদলের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের আমরা ৩ জন মাত্র মিলিত হইয়াছিলাম, অবশিষ্ট ভুটিয়া ও তিব্বতী যাত্রীতে পূর্ণ হইয়াছিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

তাকলাকোটে আমাদিগকে জ্বালানী কাষ্ঠের অভাব ভোগ করিতে হয় নাই। ভুটিয়ারা ভারত হইতে কাষ্ঠ আনিয়া সে অভাব দূর করিত। এখন গোময় আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ ইন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র গাছ কাঁচা অবস্থাতেও বেশ প্রজ্বলিত হয়। এই তৃণহীনপ্রায় দেশে মেষ, ছাগ প্রভৃতি পশু বেশ দৃঢ়কায় ও পরিপুষ্ট। হিমালয়ের তৃণবহুল প্রদেশের পশুর সহিত তুলনা করিলে তাহারা দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। মাংসভোজীরা এ প্রদেশের মেষের মাংসের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। এ প্রদেশের তৃণ সারবান্, অল্পেই তাহা শরীর পরিপুষ্ট করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই জন্যই এ প্রদেশের পশু সকল বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলবান্।

আমরা এখন যে প্রদেশে অবস্থান করিতেছি, তাহা সমুদ্র হইতে প্রায় ১৫।১৬ হাজার ফুট উচ্চ। এরূপ উচ্চ স্থানে স্বভাবতঃই বেশী শীত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতও সন্নিকটে থাকায় শীতের মাত্রাটা খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। শয়নকালে সমস্ত শীত বস্ত্র পরিধান করিয়া, উপরে কম্বল ঢাকা দিয়া কোনরূপে শীত নিবারণ করা যাইত।

তিব্বতের প্রান্তরে চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল প্রথম রজনী বেশ আনন্দে অতিবাহিত করা গেল। আবার প্রভাত হইল, আবার আমরা গমন করিতে আরম্ভ করিলাম। তাকলাকোটে এক যোড়া ডোকচা (তিব্বতী পাদুকা—ইহার নিম্নভাগ চর্ম্মাবৃত, উপর প্রায় জানু

পর্য্যন্ত লোমশ কম্বলে ঢাকা থাকে) লই। সেই গরম মোজা—তিব্বতী পাদুকা—ফ্লানেলের পট্টি ও পাজামা—এরূপভাবে পা ঢাকা থাকিলেও যখন ঝব্ব চড়িয়া গমন করিতাম, বোধ হইত, পদদ্বয় যেন আমার শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আজ আমরা গরলামান্ধাতার অনতিদূরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলাম। গমনকালে আমরা কর্দ্দম বামে রাখিয়া বলদাক নামক স্থান অতিক্রমণ করিয়াছিলাম।

যাঁহারা পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কর্দ্দম নামের সহিত পরিচিত আছেন। অতি প্রাচীনকালে কর্দ্দম নামে একজন প্রজাপতি ছিলেন। প্রজাপতি হইবার পূর্ব্বে তিনি এই স্থানে ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারে বর্ত্তমানকালেও সেই স্থান পরিচিত হইয়া থাকে।

যে স্থানে আমরা শিবির স্থাপন করিয়াছিলাম, তাহার অনতিদূরে চিরতুষারাবৃত গরলামান্ধাতা। মান্ধাতার জন্মের প্রথম দিনে ইহার মস্তকোপরি যে তুষার পতিত হইয়াছিল, পৃথিবীর সেই আদি-যুগের তুষারসঙ্গশীতল বায়ুস্পর্শে আমাদের শরীর শীতল হইয়াছিল। যে স্থানে অবস্থান করিয়া মান্ধাতা ঘোর তপস্যার প্রভাবে সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীতে আধিপত্যলাভ করিয়াছিলেন, আমি সে স্থানে অবস্থান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া নিজেকে পরম পবিত্র বিবেচনা করিতে লাগিলাম।

আমাদের নেতা এই সময় হইতে খুব সতর্কতা সহকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন; নিকটে তিব্বতীদের কোন তাঁবু আছে কি না, তাহারও সংবাদ লইলেন। এরূপ সংবাদ লইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তরে কহিলেন, যদিও আমরা



লিপুলেখ পাশার নিকট অসমতল দৃশ্য।

তীর্থযাত্রী, আমাদের সহিত বেশী ধন বা পণ্যদ্রব্য নাই, তথাপি একটু সাবধান হওয়া ভাল। দলের ভিতর স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী; যদি অকস্মাৎ ডাকাইত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। এজন্য পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলে আমরা ৪।৫ জন বন্দুকধারীই ডাকাইতের দলকে দূর করিতে সমর্থ হইব। ভুটিয়া রমণীরা নিতান্ত ভীরু বা দুর্ব্বলা নহেন; কিন্তু প্রয়োজন হইলে তাঁহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থা হইলেও তাঁহারা স্ত্রীলোক ত বটেন! এই বলিয়া আমাদের দলের নেতা তাঁহার যুদ্ধের "প্ল্যান" (মতলব) আমাকে জ্ঞাপন করেন। আমি আমাদের নায়ক—দলপতির রণবিষয়িণী প্রতিভা দেখিয়া পুলকিত হইলাম। অস্ত্রশস্ত্রের পরিবর্ত্তন জন্য যুদ্ধের ভীষণতা বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু মূলসূত্র বা সিদ্ধান্তগুলি মান্ধাতার সময় যাহা ছিল, বর্ত্তমান সময়েও ঠিক তাহাই আছে। যাহারা শত্রু কর্ত্তৃক অকস্মাৎ আক্রান্ত হয়, তাহারা লুণ্ঠিত, পরাজিত ও শক্তিশূন্য হইয়া পড়ে। উপযুক্ত সেনানী এরূপ শোচনীয় অবস্থায় কখনও পতিত হয়েন না। দুর্ব্বল যদি বলবান্‌কে এইরূপে মুগ্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অনতিকালমধ্যে ধন ও নৈতিক বলসম্পন্ন হইয়া বিজয়লাভ করিয়া থাকেন। আমাদের নেতা মহাশয় যুদ্ধশাস্ত্রের এই মূলসূত্রের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। এরূপ নায়ক কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হওয়াতে আমরাও নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। মান্ধাতার চরণতলে দ্বিতীয় রাত্রিও বেশ কাটিয়া গেল।

রাত্রি ৩টার সময় নেতা মহাশয়ের আদেশে আমরা যাত্রা করিলাম। এরূপ অসময়ে যাত্রার কারণটা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। পাওনাদারকে প্রতারণা করিবার জন্য দুষ্ট

লোক যেরূপ অকস্মাৎ স্থানপরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, সেইরূপ আমরা কাহাকে প্রতারণা করিবার জন্য এরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহা জানি না। অন্য সময় হইলে নেতা মহাশয়কে তাঁহার এ আদেশ সম্বন্ধে পুনরায় বিচার করিতে অনুরোধ করিতাম, কিন্তু আজ আমি তাহা করিলাম না। আজ বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিব—আজ কোটি কোটি নরনারীর আরাধনার বিষয় দর্শন করিব বলিয়া নেতার আজ্ঞার বিরুদ্ধে কোন কথা উত্থাপন করি নাই।

আজিকার শীতটাও যেন মেরুপ্রদেশের শীত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কৈলাস দর্শনের উৎসাহ যদি ঝব্বুদের মধ্যে একটু থাকিত, তাহা হইলে আমরা শীঘ্র শীঘ্র রাস্তা অতিক্রমণ করিতে সমর্থ হইতাম। আমাদের তাঁবুর কাছে একটা ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ ছিল, ঝব্বু কোনরূপে তাহা পার হইতে ইচ্ছুক নহে, আমিও তাহা হাঁটিয়া পার হইতে রাজী নহি। উভয়েই স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপন জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা গিয়াছিল। যখন উভয়েই স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার জন্য দ্বন্দ্ব করিতেছিলাম, তখন ঝব্বুর লোক আসিয়া আমাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করে। সে ঝব্বুর নাকের দড়ি ধরিয়া তুষার-শীতল জলধারা পার করিয়া আমাকে রক্ষা করে। আমার একজন সহযাত্রী ঝব্বু-আরোহী, ঝব্বুর দুরাচারের জন্য শীতল-জল-সিক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া যখন আমি জুতা-মোজা খুলিবার কল্পনা করিতেছিলাম, সেই সময় ঝব্বুর লোক আমাকে অভয় দিয়াছিল।

যাত্রীর মধ্যে অধিকাংশের ইহা প্রথম যাত্রা। আজ আমরা কৈলাস দর্শন করিব, এই জন্য সকলেই এক অপূর্ব্ব ভাবে অভিভূত

হইয়াছিলেন। এই জন্য শীত বা রাস্তার কষ্টের প্রতি কেহই ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। সকলের মনে যেন এক উৎসাহের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল। সময় সময় আমরা পথভ্রষ্ট হইয়াছিলাম। সময় সময় আমাদের শরীর বরফের হাওয়াতে অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। সময় সময় ঝব্বু পদস্খলিত হইয়া আমাদিগকে বিপন্ন করিয়াছিল। এইরূপ নানা অবস্থা ভোগ করিয়া গরলামান্ধাতার গিরিপথ আমরা অতিক্রমণ করিয়াছিলাম।

অতি প্রত্যূষে আজ যে দৃশ্য দর্শন করিলাম, জীবনে আর কখন তাহা দেখিব বলিয়া মনে হয় না। যখন পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন, নক্ষত্রপুঞ্জ আকাশে কিরণজাল বিস্তার করিতেছিল, সে সময় সূর্য্যকিরণ—তুষারমণ্ডিত কৈলাসশিখরে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের রচনা করিয়াছিল। সে রক্তাভবর্ণ——দূরে যেন অগ্নিদাহ উপস্থিত হইয়াছে—অথবা নিশাবসানে ম্লান বিরাট প্রদীপ যেন নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। সূর্য্যকিরণের বৃদ্ধির সহিত এ সৌন্দর্য্যের বিবর্ত্তন হইতে লাগিল। এই অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয় সৌন্দর্য্য বর্ণনার অতীত। ইহাকে বাক্যের আয়ত্ত করিতে যাওয়া বালকত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সূর্য্যের প্রকাশের বৃদ্ধির সহিত এই অদ্ভুত দৃশ্যের কেমন অল্প অল্প পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল! অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে অনভ্যস্ত আমার অশিক্ষিত চক্ষুর্দ্বয় যেন অত্যন্ত অল্পসংখ্যক ও ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ গমনের পর এই অপূর্ব্ব দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইল। রাবণ-হ্রদের সুনীল জলরাশি অকস্মাৎ নয়নগোচর হইল। সম্মুখভাগে এই বিশাল নীলকান্তমণিপ্রভ জল থাকায় এ সৌন্দর্য্য



গুরলামান্ধাতা গিরিপথ।

যেন শতগুণে বিবর্দ্ধিত হইল। এক জন আস্তিক জাপানী এই মনোমোহন দৃশ্য দেখিয়া এক শত আটবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভাব কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর এক জন সুইডেনবাসী অক্লিষ্টকর্ম্মা পরিব্রাজক বলিয়াছিলেন, যদি দৈবযোগে কেহ আমাকে স্থাননির্ব্বাচনের স্বাধীনতা দিয়া এ দেশে আজীবন আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে আমি এই অনির্ব্বচনীয় দেশে স্থাননির্ব্বাচন করিয়া কৈলাস, মানস, গরলামান্ধাতার চির-অভিনব দৃশ্য দেখিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়া পরমসুখে জীবনযাপন করি।

এই প্রাণারাম ঐন্দ্রজালিক দৃশ্য দেখিয়া পুষ্পদন্তের কথা পাঠ করিতে করিতে গলদশ্রুনয়নে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পুষ্পদন্ত যথার্থই কহিয়াছেন, হে ভগবন্!

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধু পাত্রং
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমূর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং,
তদপি তব গুণানামীশ! পারং ন যাতি॥

এই বিশাল কৃষ্ণপর্ব্বত যদি কজ্জল হয়, সপ্তসমুদ্র যদি এই মসীর আধার হয়, সুবিস্তৃতা বসুমতী যদি পত্ররূপে পরিণত হয়—কল্পদ্রুমের প্রধান শাখা যদি লেখনী হয়, আর স্বয়ং ভগবতী বাগ্দেবী যদি অনন্ত-কাল ধরিয়া লিখিতে থাকেন, তাহা হইলেও তিনি, হে ভগবান্, তোমার সৌন্দর্য্যের কণামাত্রও ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়েন না।

আমার ভুটিয়া সহচর বলিলেন, এক জন ইংরাজ রাজপুরুষ এই দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়েন। তাঁহার তন্ময়তা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে শিথিলবসন হইয়াছিলেন।

এ সকল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, অন্যের অনুভবের কথা আলোচনা করিতে করিতে যখন অগ্রসর হইতেছিলাম, সে সময় একটি ঘটনা বড়ই ব্যথিত করিয়াছিল। আমাদের গমনপথে একটি শশক চলিয়া যায়। শশক দেখিয়া এক জন বন্দুকধারী ভুটিয়ার শীকারবৃত্তিটা আর প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারিল না। সে শশকের অনুধাবন করিতে লাগিল। যখন শশক কোনরূপে শরীর গোপন করিতে সমর্থ হইল না, সেই সময় শীকারী গুলী করিয়া নিরীহ শশককে নিহত করে। এই ঘটনায় আমরা তাহাকে যথেষ্ট ভৎ'সনা করি। অন্ততঃ তীর্থযাত্রার সময়টা একটু সংযত হইতে তাহাকে উপদেশ প্রদান করি। বেচারা শীকারী সকলের কাছে ভৎ'সিত হইয়া একটু লজ্জিত হইয়াছিল।

গমনকালে শাখাহীন শৃঙ্গদ্বয়যুক্ত হরিণও আমাদের নয়নগোচর হইয়াছিল। আমাদিগকে দেখিয়া ত্রস্তভাবে তাহাদের পলায়ন—দূরে গমন করিয়া আমাদের দিকে নিরীক্ষণ—তাহাদের নয়নাভিরাম অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এক স্থানে হরিণের একটা শিং কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল। সময় সময় বন্য অশ্বযুথও দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

গরলামান্ধাতা গিরিপথ পরিত্যাগ করিয়া প্রায় ৯।১০ টার সময় রাবণ-হ্রদের তটে আমরা উপস্থিত হই। ইহাতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখা গেল। নানাপ্রকার জলচর পক্ষী আনন্দে ক্রীড়া করি-তেছে। এই নির্জ্জন স্থানে তাহাদের আনন্দে বিঘ্ন করিবার কেহই নাই; সুতরাং অনবচ্ছিন্ন ধারায় তাহারা আনন্দভোগ করিতে'ছ দেখিয়া আমি প্রীত হইলাম। শীতসমাগমের সহিত এই সকল পক্ষী তিব্বত পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে গমন করিয়া থাকে। ইহারা শীতের সমাগম বুঝিতে পারিয়া হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিয়া অপেক্ষাকৃত উষ্ণপ্রদেশে আগমন করিয়া থাকে।

অগ্রহায়ণ মাসে নেপাল তরাইএর অন্তর্গত জনকপুর দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলাম। তথায় বড় বড় পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকায় তিব্বতের নানাপ্রকার বর্ণের ও আকৃতির জলচর পক্ষী দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। তথাকার স্থানীয় লোকদের মুখে শুনিয়াছিলাম, এই সকল দলই প্রতিবৎসর একরূপ সময়ে আগমন করিয়া এ অঞ্চলে শীতযাপন করিয়া থাকে। যাহাদের তিব্বতে যাইবার শক্তি নাই, অথচ তিব্বতীয় পক্ষীর বিষয় আলোচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে, তাঁহারা এ সুযোগ গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন।

কিয়ৎক্ষণ রাবণ-হ্রদের তট দিয়া গমন করিয়া এক স্থানে আমরা বিশ্রাম করি। তথায় স্নান ও ভোজনাদি সমাপন করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করা যায়। কিছুদূর গমনের পর দেখা গেল, ৩।৪ টা কৃষ্ণবর্ণের তাঁবু হ্রদের তটে যেন রাস্তা অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমাদের নেতা ইহা দেখিয়া একটু সন্দিগ্ধচিত্ত হয়েন। তাঁবুর তিব্বতীরা আমাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য কয়জন বৃদ্ধা ও বালককে ভিক্ষার ছলনা করিয়া আমাদের কাছে প্রেরণ করে। ইহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া আমাদের দলপতির সন্দেহ আরও দৃঢ়মূল হয়। এই সন্দেহের জন্য আমাদের দলের ভিতর বেশ একটু চাঞ্চল্যের আবির্ভাব হয়। এখন কোন্ রাস্তা ধরিয়া গমন করা যাইবে, ইহাই হইল ভাবনার বিষয়। হ্রদের তীর ক্ষুদ্র পাহাড়ের মত উঁচু। ওই তীর মানস ও রাবণ-হ্রদের মধ্যে প্রাচীরস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্থির হইল, এই পাহাড়ের উপর দিয়া গমন করা যাউক। যদি আমরা দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হই, তাহা হইলে উপর হইতে আক্রমণের সুবিধা হইবে। আমরা বিশৃঙ্খলভাবে গমন করিতেছিলাম, এখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া গমন



লিপুলেখ পাশের নিকট।

করিতে লাগিলাম। দুই জন বন্দুকধারীকে অগ্রে, এবং মধ্য ও অগ্রভাগে এক জন এক জন স্থাপন করা গেল। স্ত্রীলোক আর আসবাবপত্র মধ্যভাগে রাখিবার ব্যবস্থা করা গেল। এইরূপে আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আমাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও লোকসংখ্যা সন্ধানগ্রহণ মানসে দলের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত ভিক্ষার ছলনা করিয়া দেখিতে লাগিল। আমরা তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সে চলিয়া গেল, আমরাও নীচে তিব্বতী তাঁবু পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গেলাম। বেশ নির্ব্বিঘ্নে পার হওয়া গেল, কোনরূপ বিপদের এখন আর সম্ভাবনা নাই।

নিশ্চিন্ত হইয়া এখন আমি চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলাম। দুই পাশে নীলাভ বিস্তৃত জলরাশি, সম্মুখে ও পশ্চাতে বিমল স্ফটিকের বিরাট পর্ব্বত, উপরে নির্ম্মল, অভ্রহীন সুনীল নভোমণ্ডল,—এ দৃশ্যের তুলনা নাই। গরলা-মান্ধাতা কৈলাস হইতে প্রায় ৩ হাজার ৫ শত ফুট উচ্চ। ২০ মাইলের ভিতর এত বড় উচ্চ পর্ব্বত না থাকায় ইহার প্রাধান্য ও সৌন্দর্য্য বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। নংগা পর্ব্বত ব্যতীত সমস্ত এসিয়ার মধ্যে এরূপ আর দ্বিতীয় পর্ব্বত নাই।

এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক অবস্থা সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। আমাদের শুভাদৃষ্টক্রমে জলঝড়-তুষারপাতের কোনরূপ আশঙ্কা নাই। প্রাচীন কথায় বলে :—

বিনা বাদল হিম বর্ষে
মানসরোবর কোন স্পর্শে।
উড়ত কঙ্কর জীব তরসে,
নরনারায়ণ যায় স্পর্শে।

যে স্থানে বিনা মেঘে তুষারপাত হইয়া থাকে, কঙ্কর সকল উড়াতে জীব ত্রাসযুক্ত হয়, এরূপ প্রদেশে অবস্থিত মানসরোবর, নরনারায়ণ ব্যতীত কে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়? মানসরোবর দর্শন করিলাম বটে, কিন্তু এখনও স্পর্শ ও জলপান করিবার সৌভাগ্যলাভ হয় নাই। অল্প অল্প চড়াই উতরাই এর পর একটা লবণাক্ত জলের খালের ধারে উপস্থিত হওয়া গেল। যাইবার সময় ভুটিয়া সঙ্গীরা এক প্রকার সুগন্ধী তৃণ সংগ্রহ করিতে লাগিল। ইহা মশলারূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মনে করা গেল, এই খালের ধারে রাত্রিবাস করা যাইবে; জল লবণাক্ত হওয়াতে তাহা হইল না, অদূরে রাবণ-হ্রদের তটে অবস্থান করা গেল।

আজ আমরা সকলেই খুব ক্লান্ত হইয়াছিলাম, রন্ধন করিতে আর প্রবৃত্তি হইল না—রন্ধন করিবার ইন্ধনও নাই; সুতরাং রন্ধন কিরূপেই বা করা যাইবে? ছাতু প্রভৃতি সঙ্গের খাবার খাইয়া কোনরূপে রাত্রি কাটান গেল।

মনে করিয়াছিলাম, জলের ধারে শীত একটু কম হইবে, তাহার পরিবর্ত্তে শীতের প্রকোপ বেশ ভোগ করা গেল। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, তাপমান যন্ত্রের পারদ ৩২এর দাগে নামিয়াছে। প্রত্যূষে উঠিয়া যাইবার জন্য সকলকে ডাকাডাকি করিলাম, ক্লান্তি ও শীতের জন্য যেন সকলে শয্যাত্যাগ করিতে চাহিতেছে না; আমি আর বেশী তাড়াতাড়ি করিলাম না; তাঁবুর বাহিরে রাক্ষসতালের তটে একটু পদচারণ করিতে লাগিলাম। তখন কৈলাস শৈলশ্রেণীর উপর সূর্য্যনারায়ণের প্রথম কিরণ পতিত হইয়া যেন তাহাকে ধীরে ধীরে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতেছে অথবা শৈলমালা দ্রবীভূত সুবর্ণের জলে যেন প্রাতঃস্নান করিতেছে।

এতদিনের সঙ্কল্প—পরিশ্রম—উদ্বেগ সাফল্যলাভ করিবে। আজ কৈলাসের দ্বার দারচিনে উপস্থিত হইব, আনন্দের সীমা রহিল না—সম্মুখে কৈলাস, চলিবার অধিকাংশ সময় দৃষ্টি কৈলাসে নিবদ্ধ ছিল। ইহাতে যেন এক প্রকার মত্ততা উপস্থিত হইয়াছিল। ভোগের বিষয় দর্শন, স্পর্শ ও ভাবনাতে যখন মত্ততা উপস্থিত হয়, তখন এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে বিহ্বলতা উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আজ গমনকালে অনেকগুলি সারস-বন্যঘোটক দেখিয়াছিলাম। এইরূপ দেখিতে দেখিতে অপরাহ্নকালে দারচিনে উপস্থিত হইলাম।

সপ্তদশ অধ্যায়

মঙ্গলবার ২৩শে জুলাই ৭ই শ্রাবণ আষাঢ়ী পূর্ণিমা অপরাহ্নকালে দারচিনে উপস্থিত হইলাম। অবস্থান জন্য আমাদের নেতারা যে স্থান নির্ব্বাচন করিলেন, তাহা আমার মনের মত হইল না। স্থানটির চতুর্দ্দিকে কটিদেশ পর্য্যন্ত উচ্চ প্রস্তরখণ্ড সাজাইয়া প্রাচীর দেওয়া হইয়াছে। ব্যবসায়ীরা ইহার মধ্যে মেষ প্রভৃতি রাখিয়া থাকে; তাহাদের মলমূত্রের তীব্র দুর্গন্ধে স্থানটি পরিপূর্ণ। আমাদের দলের লোকরা স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিত হইয়া স্থানটি পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি নিকটে যদি অন্য ভাল স্থান দেখিতে পাই, তাহার অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। নিকটে এ স্থানের রাজকর্ম্মচারীর গৃহ। তথায় যদি ভাল স্থান পাওয়া যায়, সেই আশায় আমি গমন করিতে লাগিলাম। উত্তরাভিমুখে গমনকালে দেখিলাম, আমার দক্ষিণে কৈলাসের তুষার-বিগলিত একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী কুল কুল করিয়া

ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার সঙ্কীর্ণ স্থানে কয়েকখানি পাথর দিয়া গমনাগমনের জন্য রাস্তা করা হইয়াছে। এই পুলটি কৈলাস-পরিক্রমারও রাস্তা। যে সময় আমি এই রাস্তার নিকট উপস্থিত হইলাম, সে সময় দেখিলাম, কয়েক জন ভক্ত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কৈলাস প্রদক্ষিণ করিয়া আগমন করিতেছে। ইহাদের মধ্যে যুবক-যুবতীও দেখিলাম। তাঁহাদের মধ্যে কোনরূপ চাপল্যের লেশমাত্রও দেখিতে পাইলাম না। সকলেই ভক্তিগদ্গদভাবে তন্ময় হইয়া পরিক্রমা করিতেছেন। এইরূপ পরিভ্রমণে ১৫।২০ দিন সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে। বাল্যকালের (প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বের কথা) এইরূপ দণ্ডবৎ প্রণামের দৃশ্য-দর্শনের কথা মনে পড়িয়া গেল। বৈদ্যবাটী নিমাই তীর্থের ঘাটে স্নান করিয়া 'দণ্ড খাটিতে খাটিতে' ভক্তকে তারকেশ্বরে গমন করিতে দেখিয়াছিলাম, সে প্রায় ১২ ক্রোশ বা ২৪ মাইল পথ হইবে। কৈলাসের পরিক্রমা ৩০ মাইল হইবে। রাস্তা বিকট—স্থানে স্থানে উচ্চস্থান হইতে খাড়া নিম্নেও রাস্তা গিয়াছে। সে স্থানে প্রণাম করিয়া নিম্নে অবতরণ করা সামান্য ব্যাপার নহে।

রাজকর্ম্মচারীর গৃহে গমন করিলাম। তাঁহার এক জন কর্ম্মচারী আমার কথা শুনিয়া, চতুর্দ্দিক দেখাইয়া একটা অন্ধকারপ্রায় কক্ষে আমায় থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাহার মধ্যে রৌদ্রের প্রবেশপথ নাই, আকাশ ও বায়ুর প্রবেশ তথায় যেন নিষিদ্ধ; ইচ্ছা করিয়া শরীরকে কারাগারে রাখিতে স্পৃহা হইল না। প্রধান কর্ম্মচারী দ্বিতলের উপর অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার সৌজন্যের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া প্রত্যাগমন করিলাম। কর্ম্মচারী মহাশয় বেশ ভদ্রপ্রকৃতির; যাত্রীদের অভাব-অভিযোগের প্রতি তাঁহার বেশ লক্ষ্য আছে, দেখিলাম।

দ্বারদেশে কয়টি ঘোড়া বাঁধা রহিয়াছে দেখিলাম। ইহার মধ্যে একটি বন্য অশ্ব; অল্পদিন হইল ধরা পড়িয়াছে। তাহার সুগঠিত, পরিপুষ্ট অবয়ব বেশ সুন্দর। বন্য স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য তাহাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখিলাম। মনুষ্যপ্রদত্ত সুখ তাহাকে কোনরূপ আনন্দপ্রদানে সমর্থ হইতেছে না। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির জন্য সে নানাপ্রকার প্রযত্ন করিতেছে। সেই দৃশ্য দেখিয়া, যে স্থানে আমাদের ডেরা পড়িয়াছে, তথায় উপস্থিত হইলাম। তখন আমাদের সঙ্গীদের সমবেত চেষ্টায় স্থানটি দেশ পরিষ্কার হইয়াছে; দুর্গন্ধও যেন অনেকটা কম বলিয়া বোধ হইল।

আজ ভোজনের জন্য খিচুড়ীর বন্দোবস্ত করা গেল। গতকল্য সমস্ত দিন, আর আজও অন্ন উদরগত হয় নাই। অন্নগতপ্রাণ আমরা অন্নের জন্য একটু ব্যাকুলও হইয়াছিলাম। ছাতু খাইয়া দিন কাটাইতে আর প্রবৃত্তি হয় না। উচ্চস্থান বলিয়া চাল-দাল সিদ্ধ করিতে একটু বিলম্ব হইল। রুটী প্রস্তুত করিতে কিন্তু বড় বেশী বিলম্ব হয় না।

বহুদূরদেশ হইতে যাত্রিসকল আগমন করিয়াছেন। অনেকে কৈলাস পরিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। অনেকে আবার আগমন করিতেছেন। "জ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনী" জীবমাত্রকে আনন্দবিহ্বল করিয়া, ভূতভাবন ভগবান্ যে আনন্দস্বরূপ, যেন তাহাই প্রমাণ করিতেছেন! লীলাময় শ্রীভগবানের ইহা যেন লীলানিকেতন। তাই বুঝি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-জাল বিস্তার করিয়া প্রভু আমার তাঁহার প্রিয় নিবাসে ক্রীড়া করিতেছেন। পূর্ণকলাপরিপূর্ণ চন্দ্রমা সুধাধারা বিতরণ করিয়া যেন জগৎকে সুধাসিক্ত করিতেছেন; এই সুধাসিক্ত রজনী তাঁহার প্রিয় বলিয়া কি তিনি সুধাংশুশেখর হইয়াছেন?

তুষারকান্তিধবল ভগবানের এ রূপ যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি যে কোন সম্প্রদায়গত হউন না কেন, তাঁহাকে অভিভূত হইতে হইবে, তাঁহাকে মুগ্ধ হইয়া মস্তক অবনত করিতে হইবে, ভগবানের সত্তা অনুভব করিয়া তাঁহাকে পুলকিত হইতে হইবে।

আশা পূর্ণ হইলে অবসাদ আসিয়া থাকে; সাফল্যজনিত এক-প্রকার মত্ততা উপস্থিত হয়। আমাতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। পূর্ণিমা-রাত্রির এ অদ্ভুত সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইলাম না, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া শয্যায় আশ্রয়গ্রহণ করিলাম। পৃষ্ঠে শয্যাস্পর্শমাত্র নিদ্রাদেবী আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। আমার এ অভ্যাসের কোন-রূপ ব্যতিক্রম হয় নাই। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া নিকটস্থ স্থানে একটু বেড়াইতে লাগিলাম। কারণ, হ্রদের তটে শীত যেন একটু বেশী বোধ হইয়াছিল, অথচ চিরতুষারাবৃত কৈলাসের পাদদেশে ততটা বোধ হয় নাই। উদর পূর্ণ ছিল বলিয়া, বোধ হয়, শীত ততটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

বুধবারে আমরা দারচিনে অবস্থান করি। বৃহস্পতিবার সকাল সকাল ভোজন করিয়া কৈলাস-পরিক্রমায় বাহির হওয়া যাইবে, স্থির হইল। পরিক্রমা পদব্রজেই বিধেয়; এ জন্য এ স্থানে ঝব্বু ও অতিরিক্ত বোঝা রাখিয়া শয্যা—রন্ধনপাত্র আর দুই দিনের উপযোগী আহার্য্যদ্রব্য লইব ঠিক করিলাম। এ সকল দ্রব্য লইয়া যাইবার জন্য এক জন কুলীর দরকার। নেতা মহাশয় ভারবাহী আনিয়া দিলেন; তাহাকে দৈনিক সাড়ে চারি আনা হিসাবে দেওয়া হইবে স্থির হইল। পরিক্রমা করিতে ২ দিন লাগিয়াছিল, ৯ আনা পয়সায় তাহাকে ৩০ মাইল পরিক্রমার মজুরী দিয়াছিলাম।

যখন পরিক্রমার সব বন্দোবস্ত হইতেছিল, তখন আমার ভুটিয়া সঙ্গীরা আমাকে দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া আমাকে দারচিনে অবস্থান করিতে পরামর্শ দেন। এক জন বলিলেন, "প্রথমবারে যখন আমি আসি, সে সময় আমার অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল। আপনি এ স্থানে থাকিয়া যাউন, কৈলাসের যখন দ্বারদেশ দর্শন করিলেন, তখনই আপনার কৈলাস-দর্শন হইয়াছে। আর আপনাকে ক্লেশ করিতে হইবে না—অনেক চড়াই চড়িতে হইবে—অত্যন্ত কষ্ট হইবে। বৃথা এ কষ্ট স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।" প্রায় ১৯ হাজার ফিট উঠিতে হইবে। উচ্চতা বড় সামান্য নহে। এরূপ অবস্থায় হৃদয়ের স্পন্দনরোধ হইতে পারে! কথাটা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। এখন কি করি? মনে একটু সন্দেহ আসিল। দারচিনে কৈলাসের দ্বারে যখন এরূপ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, তখন না জানি, সর্ব্বোচ্চ স্থানে কত কষ্ট হইবে! এইরূপ চিন্তা মনে উদিত হইল। দুইটি বিষয় আমার এ সংশয় ও দৌর্ব্বল্য সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া দিয়া নূতন বল ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছিল। প্রথম, মৃতসঞ্জীবনী একটি শ্লোক, অপর আমার সুহৃদ ভুটিয়া নেতা। ভুটিয়া বন্ধু বলিলেন, "পণ্ডিতজী, আপনি কোন কথায় কর্ণপাত করিবেন না, একটু কষ্ট হইবে বটে, কিন্তু সে কষ্ট সহ্য করিবার সামর্থ্য আপনার প্রচুর পরিমাণে আছে। আপনাকে যাইতেই হইবে।" শ্লোকটি ২।৪ বার আবৃত্তি করিতে করিতে আমার জড়তা দূর হইল, যেন বৈদ্যুতিক শক্তিতে শরীর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সাধারণে আমার প্রিয় মন্ত্রটি গ্রহণ করিবেন আশায় নিম্নে প্রকাশ করিলাম—

একোঽহমসহায়োঽহং ক্ষীণোঽহমপরিচ্ছদঃ।
স্বপ্নেঽপ্যেবংবিধা চিন্তা মৃগেন্দ্রস্য ন জায়তে॥



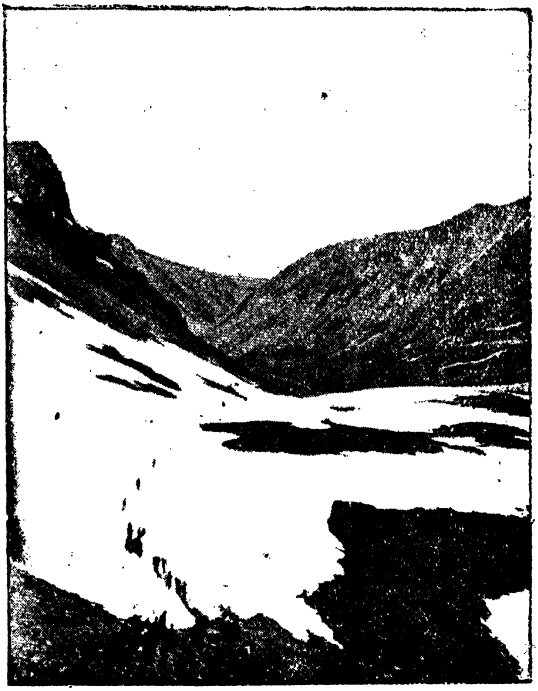
সুন্দর পরিত্যক্ত পাহাড়।

আমি একাকী—আমি অসহায়—আমি দুর্ব্বল, আমি অপরিচ্ছদ, এরূপ চিন্তা স্বপ্নেও মৃগেন্দ্রের আইসে না। যে যুগে ভারতবাসী ভুজ-বলে—বুদ্ধিবলে—চরিত্রবলে পৃথিবী জয় করিতেন, সে যুগের কবির এই কথা।

আমাদের অতি প্রাচীন সাহিত্যে কৈলাস-পর্ব্বত নানা প্রকার বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ ছিল, এরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময় স্থানে স্থানে "বিচ্ছু" গাছ ব্যতীত কোনরূপ বৃক্ষলতার চিহ্নও তথায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি? তাঁহারা কি না দেখিয়াই ইহার বর্ণনা করিয়াছেন? ইহা ত আমার বিশ্বাস হয় না। বোধ হয়, নৈসর্গিক কারণে অবস্থাবিপর্য্যয় হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাস যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, যে স্থান এক সময় শ্যাম বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ ছিল, তাহা তুষারাবৃত হইয়া মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইয়াছে। আমাদের ভারতের দিকে দৃষ্টি দিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, যখন সরস্বতী প্রবাহিতা হইতেন, সে সময় (বর্ত্তমান মরুপ্রদেশ) নানা প্রকার হরিৎ বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ ছিল। এরূপ বর্ণনা ঋগ্বেদে বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহার পর পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থকাররা "মজা" সরস্বতী দেখিয়া তাহাকে "বিনশন" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। মরুভূমির স্থানে স্থানে বর্ত্তমানকালেও প্রাচীনকালের নদীর অবস্থানচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতে ১৭ হাজার ফিট উচ্চ ভূমিতে অতিকায় জন্তুর অস্থির অস্তিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সময় এ সকল জন্তু এ প্রদেশে বাস করিত, সে সময় এ স্থান নানা প্রকার বনস্পতিপূর্ণ থাকা সম্ভব বটে।

কালিদাস তাঁহার অমর কাব্যসমূহে নানা প্রদেশের ও নানা বস্তুর



পাশ হইতে তিব্বতের দিকে নামিতেছে।

বর্ণনা করিয়াছেন। সে সকল পাঠ করিলে মনে হয়, সেরূপ বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত আর কেহ করিতে পারে না।

চিরতুষারাবৃত কৈলাসের কথা কবিকুলতিলক কালিদাস ব্যতীত অন্য কোন ভারতীয় কবি বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। কালিদাসের বর্ণনাপাঠে বোধ হয়, তিনি স্বয়ং কৈলাস দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি কৈলাসের প্রথম দর্শন দিবাভাগে করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালের কৈলাসের দৃশ্যের সহিত তাঁহার বর্ণিত কৈলাসের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত কৈলাসের সহিত কালিদাসের বর্ণনার বেশ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাস, মেঘকে কৈলাসের কাছে লইয়া গিয়া কহিয়াছেন :—

"গত্বা চোর্দ্ধং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ,
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥"

হে বারিদ! তুমি একটু ঊর্দ্ধদিকে গমন করিয়া (বোধ হয়, গুরলামান্ধাতাকে অতিক্রমণ করিবার জন্য কালিদাস মেঘকে ঊর্দ্ধদিক্ দিয়া যাইবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন) কৈলাসের অতিথি হইবে। এই পর্ব্বত অত্যন্ত শুভ্র ও স্বচ্ছ হওয়ায় অমর-অঙ্গনাদিগের দর্পণস্বরূপ হইয়াছে। মহাদেব প্রতিদিন যে অট্টহাস্য করেন, সেই হাস্য সকল পুঞ্জীকৃত হইলে যেরূপ দেখায়, কৈলাস যেন সেইরূপ শোভা পাইতেছে। ঐ নগরাজ কুমুদশুভ্রশিখরশ্রেণী দ্বারা আকাশমণ্ডলে ব্যাপ্ত থাকিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে বিস্তার লাভ করিয়াছেন। দশমুখ রাবণ ভুজ দ্বারা ইঁহাকে উত্তোলন করাতে ইঁহার প্রস্থসন্ধি উচ্ছ্বসিত (ত্রুটিত) হইয়াছে।



তিব্বতী নৃত্য।

এ বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা। ভক্তরা বলিয়া থাকেন যে, যে সময় রাবণ কৈলাসকে উত্তোলন করিয়াছিলেন, সে সময়কার রজ্জুবন্ধনচিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তদল সাগ্রহে সে চিহ্ন দর্শন করিয়া থাকেন; সেই ভগ্ন স্থানে তুষার অবস্থান করিতে না পারাতে কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। শৈব কালিদাস মহাদেবের অট্ট হাস্যের সহিত অনির্ব্বচনীয় কৈলাসের তুলনা করিয়া অদ্ভুতরসের অবতারণা করিয়া নিজের বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ দিয়াছেন।

বৃহস্পতিবার প্রভাতের সহিত কৈলাসপ্রদক্ষিণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। এক পাকের খিচুড়ী এরূপ অবস্থায় বড়ই উপযোগী; তাহাই পাক করিয়া ভোজনান্তে গমন জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল, অতিরিক্ত দ্রব্য সকল দারচিনে রাখিয়া দেওয়া হইল। ঝব্বওয়ালারা আমাদের পরিত্যক্ত শিবিরের রক্ষক নিযুক্ত হইল। আমরা নিশ্চিন্তমনে প্রায় ৯টার সময় যাত্রা করিতে বহির্গত হইলাম। যাত্রাকালে যাত্রীরা সংযত—মৌন—ভগবৎপ্রসঙ্গপরায়ণ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিব্বতী ভক্তরা কেহ বা ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন—কেহ বা "মণিপদ্মে হুং" মন্ত্রপাঠ—কেহ বা সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া গমন করিতেছেন, যাঁহারা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া গমন করিতেছেন, তাঁহাদের স্থূল অঙ্গাবরণের উপর চর্ম্মের আচ্ছাদন থাকায় প্রস্তরঘর্ষণ হইতে বস্ত্র রক্ষিত হইতেছে, দেখিলাম। তাঁহারা কাহারও সহিত কোনরূপ আলাপ না করিয়া যেন চলন্ত প্রস্তরের ন্যায় গমন করিতেছেন। আমি কখন বাম দিকে রাবণ হ্রদের সুনীল জলরাশি, কখন বা মহাদেবের রাশীভূত অট্টহাস্য উপভোগ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলাম। গমনকালে কখন কখন কৈলাসের চূড়া আমাদের চক্ষুর অন্তরাল হইতে লাগিল। এইরূপে আমরা

নানা দেশের নানা সম্প্রদায়ের যাত্রী একত্র হইয়া গমন করিতে লাগিলাম।

আমাদের মধ্যে ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক, ধনি-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, সবল দুর্ব্বল, নানা শ্রেণীর লোক সমবেত হইলেন; সকলেই নিজের অবস্থাগত পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া একভাবে গমন করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পশ্চিমাভিমুখে গমনের পর আমরা উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। এখন দৃশ্যেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইল। এখন বোধ হইল, যেন এক বিরাট পার্ব্বত্য দুর্গের পদতল দিয়া আমরা গমন করিতেছি। সেই দুর্গের স্থানে স্থানে আগ্নেয় অস্ত্র রাখিবার জন্য যেন স্থান সকল নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। প্রস্তর সকল স্তরে স্তরে নিবদ্ধ থাকায় বোধ হইতে লাগিল যেন, মনুষ্যের বাসোপযোগী প্রাসাদ সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল বিস্ময়প্রদ অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে বামদিকে একটু উন্নত ভূমির উপর নন্দিগুম্ফা দেখিলাম। এই গুম্ফা ভুটানের অধিপতি এক সময় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া কোন কোন বিদেশী লোক বিস্মিত হইয়াছেন। বাস্তবিক ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। কাশীতে যেরূপ ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি রাজ্যের নরপতিগণের গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়—সেইরূপ কোটি কোটি বৌদ্ধ নর-নারীর পবিত্র তীর্থস্থলে ভুটানাধিপতি মঠ নির্ম্মাণ করিবেন, ইহা কিছু বিস্ময়কর নহে। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, দারজিলিংএর নিকটবর্ত্তী চুম্বী প্রভৃতি স্থান হইতে বহুসংখ্যক যাত্রী আগমন করিয়া নিজেদের ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। দারচিনে যদি হিন্দু সাধু ময়ূরপঙ্খীবাবা ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিতেন, তাহা যেরূপ বিস্ময়ের

বিষয় হইত না, সেইরূপ ভুটানাধিপতির মঠনির্ম্মাণও বিস্ময়ের বিষয় নহে। বহু যাত্রী উপরে নন্দিগুম্ফা দর্শন করিতে গেলেন। সাধারণ গুম্ফা যেরূপ হইয়া থাকে—ইহাও সেইরূপ। এক সময় উপরে কৈলাস হইতে একখানি বৃহৎ প্রস্তর নিপতিত হইয়া ইহাকে ভয়সঙ্কুল করিয়াছে।

এখন যাত্রীরা উত্তরাভিমুখে নদীর তট দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কৈলাসের দক্ষিণের দৃশ্য যেরূপ উন্মুক্ত প্রান্তর, এ স্থান সেরূপ নহে। উভয়দিকে পর্ব্বত থাকায় যেন যাত্রিগণের হৃদয়ে অদ্ভুতরস সঞ্চারিত হয়। আমরা বহুজন একত্র হইয়া গমন করিয়াছিলাম বলিয়া সে নির্জ্জনতা—সে ভীষণতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই নাই। স্থানে স্থানে কৈলাস হইতে জলধারা পতিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, এক বিশাল রাজভবনের পয়ঃপ্রণালী হইতে বুঝি জলধারা পতিত হইতেছে। এই জলপতন জন্য প্রস্তর সকল বিবর্ণ হইয়াছে। এইরূপ দৃশ্য উপভোগ করিতে করিতে আমরা পূর্ব্বদিকে গমন করিতে লাগিলাম। যে সময় আমরা পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করি, সে সময় একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পার হইতে হইয়াছিল। ইহা পার হইবার কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্ব্বাভিমুখে গমনের সময় এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের রচনা হইয়াছিল।

এতক্ষণ আমরা বেশ পরিষ্কার নির্ম্মল আকাশ উপভোগ করিতে করিতে আসিতেছিলাম, এখন সমস্ত জগৎ যেন ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। এই অন্ধকারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে তুষারপাত হইয়া চতুর্দ্দিক্ শ্বেতবর্ণে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। এখন নানাবর্ণের প্রস্তর সকল তুষারাবৃত হওয়ায় সব একবর্ণ হইয়া গেল। এ দৃশ্য যদি আমরা উপভোগ না করিতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, কৈলাস

পরিক্রমের মধুরতাও বুঝিতে পারিতাম না। কটিদেশ পর্য্যন্ত বরফে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, কৃষ্ণবর্ণ ছত্র শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল, যেন বোধ হইল, ত্র্যম্বকের রাশীকৃত অট্টহাস্যে মগ্ন হইয়া গেলাম। এই অপূর্ব্ব অট্টহাস্য উপভোগ করিবার আমাদের শক্তি নাই, তাই আমরা মনে করিতে লাগিলাম, কতক্ষণে আশ্রয় প্রাপ্ত হইব। বিপন্ন সামুদ্রিক ও মরুযাত্রী আশ্রয়ের জন্য দ্বীপ ও ওয়েশীসের কামনা করিয়া থাকে; আমরাও তখন মনে করিতে লাগিলাম, কতক্ষণে আশ্রয় প্রাপ্ত হইব। তদভিপ্রায়ে দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলাম।

যে গুম্ফার আশ্রয়গ্রহণ করি, তাহার নাম জুন্-টুল-ফুক-গুম্ফা, তিব্বতী এই শব্দের যদি বাঙ্গালা অনুবাদ করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—অলৌকিক গুহা। এক সময় এই স্থানে বিস্ময়াপন্ন অলৌকিক কার্য্য সাধিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার এই নামকরণ হইয়াছে। আমাদের পক্ষেও এই গুহা অপূর্ব্ব অলৌকিক বিষয়ে পরিণত হইয়াছিল। যখন আমরা তুষারাবৃত হইয়া আশ্রয়স্থানলাভের জন্য আকুল হইয়াছিলাম, সে সময় এই গুহা ঐন্দ্রজালিকের সৃষ্টির ন্যায় আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিল।

গুহায় যাইয়া দেখিলাম, আমাদের পূর্ব্বেই অনেক যাত্রী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; আমাদের অগ্রণীরাও অগ্রে গমন করিয়া আমাদের জন্য স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন; আর রাখিয়াছেন প্রজ্বলিত অগ্নি। এ অগ্নি আমাদের হিমজনিত কাতরতাহরণের পক্ষে উপযোগী হইয়াছিল। প্রিয়জনের সঙ্গের ন্যায় এ অগ্নি আমাদের আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। সিক্ত বস্ত্র শুষ্ক করিবার জন্য দীর্ঘ যষ্টির অগ্রভাগে ভিত্তির গাত্রে স্থাপন করিলাম। দেখিলাম, গুহানির্ম্মাণের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া যে মসীপুঞ্জ সঞ্চিত

হইয়াছে, তাহা যেন নির্ব্বিবাদে অবস্থান করিতেছে। ষষ্টি ও বস্ত্রের সংস্পর্শে পুঞ্জীভূত মসী আমাদের হস্ত ও বস্ত্রকে তদ্‌ভাবাপন্ন করিয়া তুলিল। যে গৃহে আমরা অবস্থান করিয়াছিলাম, তাহার নিম্নে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত ছিল, তাহার ধূমনির্গমনের জন্য আমাদের অবস্থান-গৃহের মধ্যস্থলে একটি অবকাশ ছিল, তাহার মধ্য দিয়া ধূমপুঞ্জ বাহির হইতেছিল; সময় সময় আমাদের অবস্থান-স্থানও ধূমপুঞ্জে পরিপূর্ণ হইয়া চক্ষুর্জ্বালা উপস্থিত করিয়াছিল। নানা দেশীয় ও জাতীয় যাত্রীর কলরবে সেই গৃহ মুখর হইয়াছিল।

নিম্নের অগ্নিকুণ্ডে রুটী প্রস্তুত করিয়া ভোজন সম্পন্ন করা হইয়াছিল। এ ভোজনে কোন কষ্ট হয় নাই, বরং আনন্দই হইয়াছিল। লামা মহাশয় গুহার যে কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় গমন করিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হইলাম। ইনি আগ্রহের সহিত ভগবান্ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি এবং অন্যান্য মূর্ত্তি দেখাইলেন। কিছু দক্ষিণা দিয়া তাঁহার প্রসন্নতাও লাভ করিয়াছিলাম।

ভোজনের পর শয়নের পূর্ব্বে প্রয়োজন হেতু নিম্নে গমন করিয়াছিলাম। তথায় উৎকট দুর্গন্ধ বোধ হয়। প্রত্যাগমনকালে সে দুর্গন্ধের স্থান দ্রুতবেগে অতিক্রম করায় বোধ হইল, যেন মৃত্যু আসন্ন; হৃদয় দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল, বাক্‌রোধপ্রায় ও চলচ্ছক্তি-রহিতপ্রায় হইয়া উঠিল। উক্ত প্রদেশে দ্রুতবেগে গমনই ইহার কারণ হইয়াছিল। শয্যা প্রস্তুত ছিল, কোনরূপে তথায় গমন করিয়া বহুক্ষণ পরে সুস্থ হই।

আবার প্রাতঃকাল হইল; আবার গমনের জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। জুন-টুল-ফুক গুম্ফাকে চিরকালের জন্য বিদায় দিয়া নিম্নাভিমুখে কিছু অবতরণ করিতে হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ অবতরণের পর একটি ক্ষুদ্র

সেতু পার হইলাম। ধীরে ধীরে এখন আমরা উপরে চড়িতে লাগিলাম। গতকল্য অপরাহ্ণের সে বিরাট দৃশ্যের এক কণাও দেখিতে পাওয়া গেল না। কার্পাসকণার ন্যায় হিমানীপতনের কোনরূপ চিহ্ন লক্ষিত হইল না। এ যেন সম্পূর্ণ নূতন দৃশ্য। এখন প্রকৃতিদেবী স্নিগ্ধ ও প্রশান্তভাব ধারণ করিয়া আমাদের হৃদয়কে শান্তিরসে পরিপ্লুত করিতে লাগিলেন। গমনকালে রাস্তার নিম্নে ঝব্বুর লোমে নির্ম্মিত কৃষ্ণবর্ণ কয়েকটি শিবির দেখিতে পাইলাম। সেই শিবিরের রক্ষক সারমেয় সকল ভীষণ শব্দ করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল। সেই শব্দ পর্ব্বতমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া অধিকতর ভীষণ হইয়া উঠিল। আমাদের দলপতি মহাশয়, পাছে ইহা দস্যুদের শিবির হয়, ভাবিয়া আমাদিগকে একত্র ও সতর্ক হইয়া গমন করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে শিবিররক্ষক ব্যতীত শিবিরবাসীরা আমাদের প্রতি কোনরূপ দুষ্টভাব প্রকাশ করে নাই।

ধীরে ধীরে আমরা উপরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বৃহৎ বৃহৎ নানাবর্ণে চিত্রিত প্রস্তর সকল আমাদের রাস্তার উভয় পার্শ্বে পতিত ছিল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আমি প্রস্তরখণ্ডের উপর বিশ্রাম করিয়াছিলাম। এতক্ষণ বিশ পঁচিশ হাত যাইয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম; যত উপরে উঠিতেছিলাম, ততই এই বিশ্রামের স্থান স্বল্পব্যবধান হইয়াছিল। শেষে এরূপ হইয়াছিল যে, চার পাঁচ হাত যাইয়াই বসিতে হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে শ্বাসকৃচ্ছ্রতাও অনুভব করিয়াছিলাম।

যখন আমি অবসন্নপ্রায় হইয়াছিলাম, সে সময় এক অপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হয়। বোধ হইল, ভগবান্ প্রমথনাথ আমার সাহায্যের জন্য এক প্রমথ প্রেরণ করিয়াছেন। পরিচয়ে অবগত হইলাম, এই দৃঢ়কায় প্রমথ আর কেহই নহেন, লামার এক জন লামা। তিনি আমার হাত

ধরিয়া টানিয়া চলিতে লাগিলেন। আমি চার পাঁচ পা যাইয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম; তাঁহাকেও আট নয় পা যাইয়া বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। স্থানের প্রভাব তিনিও অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন নাই। এইরূপে গমন করিয়া ডলমা লা গিরিপথে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ইহা সমুদ্র হইতে প্রায় ১৯ হাজার ফিট উচ্চ। তিব্বতী ভক্তরা নানাবর্ণের পতাকা নির্ম্মাণ করিয়া, তাহা রজ্জুতে গ্রথিত করিয়া, এই গিরিপথের বিশাল মস্তকোপরি স্থাপন করিয়াছেন। এ স্থান হইতে কৈলাস ও নিকটবর্ত্তী দৃশ্য বিস্ময়াবহ। কৈলাস তখন একটি স্ফটিকনির্ম্মিত মন্দির বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। আমাদের অনতিদূর হইতেই কৈলাসের গাত্র তুষারাচ্ছাদিত হইয়াছে। আমরা আমাদের গন্তব্য সর্ব্বোচ্চস্থানে উপনীত হইয়াছি। এই স্থানে যাত্রীরা কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিয়া ভজন, সাধন ও বিশ্রাম করিয়া থাকেন, আর সঙ্গের আনীত খাদ্য সকল পরস্পর বিতরণ করিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। এই স্থানে, এক স্থানে ভক্তরা নিজ নিজ কেশ ও দন্ত শরীর হইতে উৎপাদন করিয়া অর্পণ করিয়া থাকেন। আমার একটি দন্ত কৈলাসযাত্রার প্রথম হইতে "চলিত" হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম, তাহাকে এই স্থানে উৎসর্গ করিব, কিন্তু এ স্থানের জলবায়ুর প্রভাবে সে দৃঢ়মূল হয়। এখনও তিনি আমার দন্তশ্রেণীর মধ্যে বিরাজমান আছেন, আমাদের আনীত খাদ্যের কিছু কিছু অংশ সকলকে দিয়াছিলাম; ভুটিয়ারাও তাহাদের চাল-কলাই-ভাজা প্রদান করিয়াছিল; আর দিতে আসিয়াছিল—তাহাদের প্রস্তুত একপ্রকার মদ্য। প্রথমোক্ত দ্রব্য সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম, শেষোক্ত পেয় লামা মহাশয়কে দেওয়াতে তিনি আনন্দিত হইয়া পান করিয়াছিলেন।

এইরূপে এই স্থানে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া অবতরণ করিতে লাগিলাম। গমনপথে তুষারাচ্ছাদিত গৌরীকুণ্ড দর্শন করিলাম। ইহার সমস্ত তুষার তখনও গলিয়া যায় নাই। যে স্থানে গলিয়া গিয়াছে, সে স্থানে নীল জল আর শ্বেত তুষার উভয়ের সম্মিলিত দৃশ্য বেশ নয়নরঞ্জন হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম, গৌরীকুণ্ডের জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিব ; কিন্তু অবতরণ সুবিধাজনক নহে বলিয়া তাহা হইতে বিরত হইয়াছিলাম।

এখন আমরা নামিতে লাগিলাম। নামাটাও খুব নীচেব দিকে হওয়াতে খুব সাবধানতার সহিত অবতরণ করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অবতরণের পর আমরা দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ গমনের পর জণ্ডু ফোক' নামক মঠের নিম্নে জলধারার তটে শক্তু গ্রহণ করিয়া মধ্যাহ্নের ভোজনক্রিয়া সমাপন করি। এখন আমরা পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। আমাদের বামদিকে বরখার প্রান্তর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, বিশাল মানস-সরোবর, আর গরলা-মান্ধাতার অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিলেন, অদ্য এই স্থানেই রাত্রিবাস করা যাউক। যখন আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলাম, সেই সময় এক দল তিব্বতী দারচিন অভিমুখে গমন করিতেছেন, দেখিলাম। তাঁহারা অতি প্রত্যূষে দারচিন পরিত্যাগ করিয়া এক দিনেই কৈলাসপরিক্রমা সম্পূর্ণ করিবেন বলিয়া গমন করিতেছেন। তাঁহাদিগকে যাইতে দেখিয়া আমরা সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলাম ;—আমরাও গমন করিতে আরম্ভ করিলাম। পথে এক স্থান হইতে ভুটিয়া যাত্রীরা কৈলাসের রজঃ সংগ্রহ করিতেছিলেন দেখিয়া আমিও কিছু কৈলাসের রজঃ সংগ্রহ করিলাম। দুই দিনের মধ্যে প্রায় ৩০ মাইল পৃথিবীর

মধ্যে এক অপূর্ব্ব পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দারচিনে আমাদের পরিত্যক্ত আবাসগৃহে পুনরায় উপস্থিত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করি।

অষ্টাদশ অধ্যায়

কৈলাস প্রদক্ষিণ করিয়া দারচিনে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম, বহুসংখ্যক লাদাকদেশীয় যাত্রীতে স্থানটি পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা শিবির সন্নিবেশ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিবার জন্য তাঁহাদের শিবিরে গমন করিয়াছিলাম। এই যাত্রীদিগের মধ্যে লাদাকের রাজাও আগমন করিয়াছেন। ইনি কাশ্মীরাধিপতির এক জন সামন্ত নরপতি, আর সে অঞ্চলের বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগুরু। তাঁহার সহিত প্রায় ২০।৩০ জন অনুচর আগমন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শিবিরে গমন করি। তিনি শিবিরের অভ্যন্তরভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। আমার উপস্থিতির কথা অবগত হইয়া তিনি পূজার গৃহে আগমন করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই ক্ষুদ্র তাঁবুর মধ্যে ভগবান্ বুদ্ধদেবের কয়েকটি মূর্ত্তি রহিয়াছে দেখিলাম। ধূপ সকল প্রজ্বলিত হওয়ায় স্থানটি বেশ সুগন্ধযুক্ত হইয়াছিল। হিন্দীভাষার সাহায্যে তাঁহার সহিত আমার কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি দেখিতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট, চোখ একটু টেরা। কাশ্মীরের মহারাজের সহিত আমার একটু পরিচয় আছে, অবগত হইয়া তিনি আমাকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করেন। লোকটি বেশ ধার্ম্মিক। আমার অবস্থানকালে

তাঁহার নিকট তাঁহার বহু ভক্ত আগমন করিয়া ঔষধ ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন। আগমনকালে তিনি আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে লাদাকের শুষ্ক ফল খোবাণী প্রদান করিয়াছিলেন।

কাশ্মীর-মহারাজের এক জন বৌদ্ধ কর্ম্মচারীর সহিত আমি পরিচিত হই। তাঁহার সহিত কয়েক জন ব্যবসায়ীও আসিয়াছিলেন। এই ব্যবসায়ীদের এক জনের নিকট হইতে আমি পট্টুর কটি থান ক্রয় করিয়াছিলাম; শুনিলাম, উহা তাঁহার গৃহেই প্রস্তুত হইয়াছে। কৈলাসের চিহ্নস্বরূপ এই বস্ত্র আমার কাছে বিশেষভাবে রক্ষিত হইয়াছে। দেখিলাম, এই যাত্রীদিগের মধ্যে সকলেই সহৃদয়।

ইঁহাদিগের নিকট হইতে আমি আমার বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিলাম। প্রাতঃকালে ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন—আমাদিগকে আজ এ স্থানে বাধ্য হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। আমার সঙ্গীটি শিরঃপীড়ায় ও জ্বরে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়ে এবং প্রত্যাগমনবিষয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়। লাদাকের রাজার নিকট হইতে কিছু ঔষধ আনিয়া তাহাকে দিয়াছিলাম, আর আশ্বাস দিয়াছিলাম, "তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না, আমার নিকট প্রচুর অর্থ আছে, প্রয়োজন হইলে মানুষের কাঁধে তুলিয়া তোমাকে লইয়া যাইব।" ভগবৎকৃপায় অনতিকালের মধ্যে সে আরোগ্যলাভ করে। এ স্থানের জ্বরের একটু বৈশিষ্ট্য আছে; জ্বরের সময় শরীরের তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, আর খুব শীঘ্র বিজ্বর হয়।

মনে করিয়াছিলাম, এ স্থান হইতে তীর্থপুরী গমন করিব। দারচিন হইতে ইহা বেশী দূর নহে। আমাদের দলের কেহ তীর্থপুরী গমন করিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা আমাকে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ

করিতে হইল। এ স্থানে মহাদেবের সহিত ভস্মাসুরের ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। অবশেষে ভস্মাসুর যুদ্ধে পরাজয় ও পঞ্চত্ব লাভ করেন। ভস্মাসুরের শরীরের অবশেষ চূণের পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে। যাত্রীরা সেই চূণ বা ভস্ম ভক্তির সহিত সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এক জন ভক্ত আমাকে কিছু ভস্ম প্রসাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

পরম পবিত্র অনির্ব্বচনীয় কৈলাস পরিদর্শন—পরিক্রমণ আর ইহার পাদদেশে পঞ্চরাত্রি অতিবাহিত করিলাম। এ স্থানের অপূর্ব্ব জল বায়ু, আকাশমণ্ডল ও অলৌকিক দৃশ্যের তুলনা নাই। অনন্তকাল হইতে অসংখ্য লোক এ স্থানে আগমন করিয়া আপনাদিগকে কৃত-কৃতার্থ বিবেচনা করিয়াছেন। কোটি কোটি লোক এই স্থানে আগমন করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হৃদয়মধ্যে পোষণ করিয়া থাকেন। কোটি কোটি লোক অবিকৃতচিত্তে এই দুর্গম ভয়াল পথের অতুলনীয় ক্লেশ সহ্য করিয়া ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এখন প্রত্যা-গমনের জন্য আমরা প্রস্তুত হইলাম। ইচ্ছা ছিল, আরও কিছু দিন এ স্থানে অবস্থান করিয়া এ প্রদেশের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উপভোগ করি; কিন্তু ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। একটা কথা আছে—"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং", আমি পরবশ, দলের অধীন; সুতরাং দলের মতানু-সারে আমাকে কার্য্য করিতে হইল। দলের অধিকাংশের মত, শীঘ্র শীঘ্র দেশে প্রত্যাগমন করা। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হৃদয়ে এরূপ আশা পোষণ করেন যে, পুনরায় তাঁহারা কৈলাস-দর্শন করিবেন। তাঁহারা কৈলাসের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থান করেন। আমার ভাগ্যে পুনরায় যে কৈলাস-দর্শন হইবে, তাহা স্বপ্নের অতীত। তবে ভগবানের ইচ্ছা হইলে জগতে অসম্ভব কিছুই নাই, এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম।

২৮শে জুলাই রবিবার ভোজনের পর আমরা দারচিন পরিত্যাগ করি। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের বিষয় ঝব্বুরাও অবগত হইয়া যেন আনন্দে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমরাও যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, মনে করিতে লাগিলাম, গৃহের তত নিকটতর হইতেছি। অপরাহ্ন-কালে আমরা বর্খার প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করি। মনে করিলে আমরা আরও খানিকটা অগ্রসর হইতে পারিতাম, কিন্তু নেতা মহাশয় এই স্থানেই অবস্থান করিবার স্থান-নির্ব্বাচন করেন। অনতি-কালমধ্যে আমাদের তাঁবু তোলা হইল, রন্ধনেরও উদ্যোগ হইতে লাগিল। কেহ কেহ এ স্থানের জম্বু নামক সুগন্ধী তৃণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইহা রন্ধনের মশলারূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; মাংসপ্রিয় ব্যক্তিরা ইহা সাগ্রহে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আকাশমণ্ডল বেশ পরিষ্কার ছিল, জলঝড়জনিত কোনরূপ বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। সায়ংকালে কৈলাসের বিশ্ববিমোহন অপূর্ব্ব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ক্রমে কৈলাসের শিরোপরি প্রতিভাত সূর্য্যের শেষ কিরণ অন্ধকারে লীন হইয়া গেল। কিরণের হ্রাসের সহিত কৈলাসের বর্ণেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে আমরাও যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলাম।

বর্খার প্রান্তরের নাম আমাদের ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত। সেনানী জোরাবর সিং-পরিচালিত অল্পসংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বহুসংখ্যক তিব্বতী সৈন্যের উপর অনন্য-সাধারণ বিজয়লাভ করায় তিনি তিব্বতীদের নৈতিকবল ও বাহুবল পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন। যে স্থান এক দিন তিব্বতী সেনার মৃতদেহে পরিপূর্ণ ছিল—যে স্থান এক দিন আহত সৈনিকের আর্ত্তস্বরে

প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, যে স্থান এক দিন ভারতীয় সৈন্যের বিজয়দর্পে, আর পলায়নপর বিভীষিকাগ্রস্ত তিব্বতী সেনার পদশব্দে ধ্বনিত হইয়াছিল, আজ সে স্থান শান্তরসে পরিপূর্ণ। আমরা নিরুদ্বেগে বর্খার যুদ্ধক্ষেত্রে রাত্রিযাপন করিলাম।

পরদিবস প্রাতঃকালে আবার আমরা গমন করিতে লাগিলাম, মধ্যাহ্নের পর মানস সরোবরের তটে যু গুম্ফার পাদদেশে কতিপয় উষ্ণপ্রস্রবণের নিকটে উপনীত হইয়া আমরা রাত্রিবাস করিয়াছিলাম। যু গুম্ফা পিরামিডের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর থাকায়—এই স্থান হইতে মানসের, কৈলাসের এবং নিকটবর্ত্তী স্থানের দৃশ্য উপভোগ্য। এক সময় মানস-সরোবরের সহিত রাবণহ্রদ একটি স্রোতের দ্বারা সংযুক্ত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে সেই প্রণালী না থাকিলেও সেই প্রণালীর চিহ্ন বেশ বুঝিতে পারা যায়। অনেক দিন আমি স্নান করি নাই, শরীরের লোমে এক প্রকার কীট জন্মিয়াছিল, তাহাতে অস্বস্তি বোধ হইত। আজ গরম জলে স্নান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। এই স্থানে কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে; কয়েকটি অত্যন্ত উষ্ণ। যেটির জলে আমরা স্নান করি, তাহা অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ থাকায় আর আচ্ছাদনযুক্ত হওয়ায় আনন্দে স্নান করিয়াছিলাম। উষ্ণ প্রস্রবণগুলির সম্মিলিত জল একটি ধারারূপে প্রবাহিত হইতেছে। তাহাতে বহুসংখ্যক বালহংস আনন্দের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। মানস-সরোবর ও রাক্ষসতালে এই সকল বালহংস প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ এ স্থানে রাজহংসের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের দেশে যাহাকে রাজহংস বলে, সেইরূপ হংস এ প্রদেশের কোথাও পাই নাই।

সন্ধ্যার পর আমি মানসের তটে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান



রামিং ও রাওয়াং।

করিয়াছিলাম। অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আবৃত। দিবাভাগে যে সৌন্দর্য্যের সুষমা লইয়া মানস আপন মনে লীলা করিয়াছিলেন, এখন সে সৌন্দর্য্য হইতে স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্য অনুভূত হইতে লাগিল। উপরের পরিষ্কার সুনীল আকাশমণ্ডলের সহিত মিলিত হইয়া মানস যেন অপূর্ব্ব ক্রীড়া করিতেছেন। নক্ষত্রভূষিত অম্বর মানসকে যেন কৃষ্ণাম্বরে সজ্জিত করিয়া জ্যোতির্ম্ময় ভূষণ দিয়া জড়িত করিয়াছেন। কবি ইহা কল্পনার চক্ষুতে দেখিলেন—প্রস্ফুটিত কমনীয় কনক-কমল মৃদুমন্দ পবন-হিল্লোলে কম্পিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে যেন আত্মগোপন করিতেছেন। সুখস্পর্শ সমীরণ-স্পর্শে মানসের বিশালবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ সকল আবির্ভূত হইয়া এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের রচনা করিতেছিল। এ সঙ্গীতের তুলনা নাই। যেন প্রাণের সখাকে এই সুমধুর সঙ্গীত শুনাইবার জন্য অন্ধকারে সকলের অজ্ঞাতসারে তরঙ্গ সকল আলাপ করিতেছে। এই অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিকের দেশে সকলই অদ্ভুত। নিশীথ-নিস্তব্ধতা ঐন্দ্রজালিকের হস্তের যেন সম্মোহন দণ্ড! দর্শককে এই সম্মোহনদণ্ডপ্রভাবে অভিভূত করিয়া, ঐন্দ্রজালিকপ্রবর কল্পনাকে কুণ্ঠিত করিয়া, এরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য রচনা করিয়া আপন মনে স্বচ্ছন্দচিত্তে ক্রীড়া করিতেছেন। আমার বামদিকে যু গুম্ফার পাহাড় যেন কালপুরুষের মত অবস্থান করিয়া কামরূপ মানস-সরের মধুর লীলা সম্ভোগ করিতেছেন। সকল সৌন্দর্য্যের আধার ব্রহ্মার মানস সৃষ্টি, দেবতাদিগের লীলানিকেতনে মানুষের অধিকক্ষণ অবস্থিতি বোধ হয় তাঁহাদের ঈপ্সিত নহে। তাই বুঝি তাঁহারা আমাকে অভিভূত করিয়া আমার অনিচ্ছায় আমাকে আমার শয্যার উপর স্থাপন করিয়াছিলেন।

প্রাতঃকালে আবার আমরা গমনে প্রবৃত্ত হইলাম। মানসের তটে

যখন উপস্থিত হইলাম, তখন মানস কৃষ্ণাম্বর পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে নীলাম্বর পরিধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ম্লান চন্দ্রের কিরণজাল সরোবর-বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে, সূর্য্যের প্রথম রশ্মি, চন্দ্রালোককে দূর করিয়া স্বীয় আধিপত্যস্থাপনে প্রযত্ন করিতেছে। উষার এই অলৌকিক দৃশ্য—মান্ধাতা ও কৈলাসের সুবর্ণ-জলে প্রাতঃস্নান—এই মিলিত দৃশ্য এ প্রদেশকে অনির্ব্বচনীয় শোভার আধার করিয়া তুলিয়াছিল। সূর্য্যকিরণের উজ্জ্বলতার সহিত মানসও ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন শোভাসম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। মানস যদি বিশাল জলরাশিসহ এ স্থানে অবস্থান না করিতেন, তাহা হইলে গরলা-মান্ধাতা বা কৈলাস অলৌকিক বিস্ময়কর শোভার আধার হইতে কখনই সমর্থ হইতেন না। আর উত্তরে ও দক্ষিণে স্বচ্ছ স্ফটিক-পর্ব্বতদ্বয় যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানসও এই কমনীয় কান্তি ধারণ করিতে সমর্থ হইতেন কি না, তাহা কল্পনা করিতে পারা যায় না। মধ্যস্থলে অপূর্ব্ব জলরাশি সূর্য্য-কিরণ ও নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জলধরের প্রতিবিম্বসহ মিলিত হইয়া প্রতিক্ষণে অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যেন স্ত্রীসুলভ চপলতা প্রকাশ করিতেছিলেন; আর উভয় দিক হইতে পর্ব্বতদ্বয় কৌতূহলপরবশ হইয়া—মানসের ক্রীড়ায় বিমুগ্ধ হইয়া—অচল হইয়া—একদৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন! মানসের এই লোকোত্তর সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধির পক্ষে রজোহীন বিমল আকাশমণ্ডল আর এ প্রদেশের দৃষ্টিবিভ্রমকারী বায়ুমণ্ডলও কম সহায়তা করে নাই। পৃথিবীর এই উচ্চতম প্রদেশে অদ্ভুত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যস্থলে ব্রহ্মার মানসসৃষ্টি অনন্তকাল মানবমনকে বিস্ময়াপন্ন করিবে। আস্তিক ও নাস্তিক উভয়েই ইহা দর্শন করিয়া অদ্ভুত রসে আপ্লুত হইবেন। ভগবানের এই মানস-রচনা দেখিবার জন্য, বিশ্বপাতার

সত্তা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অনন্তকাল ধরিয়া জনপ্রবাহ ইহার তটে আগমন করিয়াছেন। কত মহদাত্মা ইহার তটে উপবেশন করিয়া— দণ্ডায়মান হইয়া—শয়ন করিয়া চকিত-হৃদয়ে—ধ্যান-স্তিমিতনেত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ আমরা যে পথ অবলম্বন করিয়া গমনে প্রবৃত্ত হইলাম, জানি না, কত শত পবিত্র-হৃদয় ব্যক্তি কত দূরপ্রদেশ হইতে, অচিন্তনীয় কত ক্লেশ স্বীকার করিয়া সেই পথ দিয়া গমন করিয়াছেন! আজ এই পবিত্র পথের অনুসরণ করিয়া পবিত্র হইলাম; জন্ম সার্থক হইল বিবেচনা করিতে লাগিলাম।

মানসের পরিধি প্রায় ৫০ মাইল হইবে, দেখিতে বৃত্তাকার। ইহার অতি দূরের তট বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তগণ মানসের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া ইহার পরিক্রমা করিয়া থাকেন। ইহার তটে অনেকগুলি মঠ আছে; তথায় সাধুসন্ন্যাসী লামারা অবস্থান করিয়া সাধন-ভজন করিয়া থাকেন। এই উচ্চ প্রদেশ সাধনের পক্ষে বড় উপযোগী বলিয়া বোধ হইল। শরীর নিশ্চল হইলে মনের চঞ্চলতা দূর হয়। এ দেশের প্রাকৃতিক অবস্থান শরীরকে নিশ্চল করিবার পক্ষে বড়ই উপযোগী। অল্পশ্রমেই শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়ে। প্রকৃতিদেবী যেন ইঙ্গিত করিতেছেন, চঞ্চল হইও না, স্থির হইয়া থাক! ধ্যানপরায়ণ হও! স্বীয় অপূর্ব্ব শক্তির সহিত পরিচিত হও! এ প্রদেশে অল্পপ্রয়াসে মন যেরূপ স্থিরতা লাভ করে, পৃথিবীর অপর কোন স্থানে সেরূপ হয় কি না, তাহা জানি না। মননশীল ব্যক্তির পক্ষে এ স্থান বড়ই উপযোগী। মনঃসংযমে অভ্যস্ত হইবার পক্ষেও ইহা অনুকূল। যে পর্য্যন্ত না মন একাগ্র হয়, অচঞ্চল হয়, এক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হয়, সে পর্য্যন্ত জাতিগত হিসাবেই বলুন, আর



বাক্তিং বা বাওয়াং।

ব্যক্তিগত হিসাবেই বলুন, সে জাতি বা ব্যক্তি বাধাবিঘ্ন দূর করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

মানসের জলের মত সুস্বাদু জল—স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল জল—কীটাণুবর্জ্জিত পবিত্র জল জগতে দুর্ল্লভ। ৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি যে জল আনিয়াছিলাম, আজও তাহা স্ফটিক-নির্ম্মল—কীটাণুবিহীন হইয়া রহিয়াছে! মানস হইতে যে সময় আমি জল সংগ্রহ করি, সে সময় তরঙ্গ হইতেছিল, সেই তরঙ্গের সহিত শৈবাল-কণিকা জলের সহিত আসিয়াছিল। তাহা আসিলেও জলের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয় নাই।

মানসের জলের অনতিদূরে তট দিয়া পরিক্রমার পথ। এই রাস্তা দিয়া আমাদিগকে দক্ষিণের প্রায় শেষ সীমায় গমন করিতে হইয়াছিল। গমনকালে মানসের মনোমোহন দৃশ্য, রক্তচঞ্চু কলহংসের ক্রীড়া, দীর্ঘপথ অতিক্রমণ-জনিত কোনরূপ ক্লেশ অনুভব করিতে দেয় নাই, ইহার পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ পাড়ের স্থানে স্থানে কয়টি গুহা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। জলঝড়ের সময় আশ্রয়হীন যাত্রী ইহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কখন পদব্রজে, কখন বৃষভে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলাম। এই অপূর্ব্ব যাত্রা সুখের হইলেও সূর্য্যের প্রখরকিরণ দেহকে তাপিত করিয়াছিল। আমাদের নিম্নভূমিতে আমরা যে সূর্য্যকিরণ ভোগ করিয়া থাকি, তাহা ধূলিকণা-পরিপূর্ণ আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া আপতিত হওয়ায় তাহার তীক্ষ্ণতা আর তাহার রোগ দূর করিবার শক্তি অনেকটা মন্দীভূত হইয়া যায়। এ উচ্চ ভূমিতে তাহার কোনরূপ আশঙ্কা না থাকায় বিশুদ্ধ সূর্য্য-কিরণ সম্ভোগ করা যায়। আমরা মলিন দেশের লোক এরূপ বিশুদ্ধ কিরণ সেবনে

অভ্যস্ত নহি বলিয়া তাপিত হইয়াছিলাম। বিশুদ্ধ বায়ু আর সূর্য্যের বিশুদ্ধ কিরণ সেবন করায় বোধ হয়, এ দেশের লোক দীর্ঘায়ু হয়। সাধারণ তিব্বতীদিগকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহারা স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি।

প্রায় ১০টার সময় আমরা গোসল গুম্ফার পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। এই গোসল গুম্ফার মঠে অবস্থান করিয়া স্বেন হেডিন মানস, কৈলাস ও মান্ধাতার অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়াছিলেন—তন্ময় হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন, এ দেশে বন্দি-জীবন যাপন করিতে হইলে, অবস্থানের জন্য এই রমণীয় স্থান তিনি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন! স্থানটি উন্নত পাড়ের উপর অবস্থিত বলিয়া এ স্থানের রমণীয় দৃশ্য অতি সুন্দররূপে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মানসের পবিত্র জলে অবগাহন করিলাম। সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিতে হয়, ইহা আমাদের চিরন্তন প্রথা। যখন সঙ্কল্প করি, তখন দারাপুত্র, আত্মীয়-স্বজন, সখাসখী, কাহারও কথা মনে আসিল না, ভগবান্ ভারতের কল্যাণ করুন, এইরূপ প্রার্থনা করিয়া স্নান করিয়াছিলাম। স্নানের পর কিছু মিশ্রী আর ৩।৪ গেলাস সাক্ষাৎ অমৃতস্বরূপ জল পান করিয়াছিলাম। এই পবিত্র জল পান করাতে আমার সমস্ত শরীরে এক অননুভূতপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত হইল—এত দিনের পথক্লেশজনিত অবসাদ যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। শরীর যেন অপূর্ব্ব বলে বলীয়ান্ হইল। সে দিন আমি কিঞ্চিৎ মিশ্রীখণ্ড আর মানসের ৩।৪ গেলাস জল ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করি নাই। অন্নগ্রহণ না করাতে কোনরূপ অবসাদ বোধ হয় নাই। পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বপ্রধান উপাদেয় পেয়, স্যাম্পেন নামক মদ্যের সহিত তুলনা

করিয়া, স্বেন হেডিন, মানসের জল স্যাম্পেন অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা প্রাচীবাসী, আমাদের নিকট এ তুলনা বড়ই বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। মানস-সরোবর আমাদের নিকট পবিত্র। আর এই প্রদেশ হইতে শতদ্রু ব্রহ্মপুত্র-সিন্ধু ও গঙ্গা প্রভৃতি পরম পবিত্র নদনদী উৎপন্ন হইয়া ভারতাভিমুখে গমন করিয়াছেন। হিন্দুর দৃষ্টিতে এ প্রদেশ অত্যন্ত পবিত্র এবং ভক্তিভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মানসের সবই বিচিত্র। শীতকালে এক দিনেই মানসের নীলবর্ণের জলরাশি শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়া শোভা পাইয়া থাকে। আবার এক দিনেই শ্বেত নীলে পরিণত হয়। শীতকালে তুষার এরূপ কঠিন হয় যে, পশু সকল তাহার উপর গমনাগমন করিয়া থাকে। মানস-শোভা হংসাদি জলচর পক্ষিসকল শীত-সমাগম বুঝিতে পারিয়া ভারতে গমন করিয়া শীতঋতু অতিবাহিত করিয়া থাকে।

এই শান্ত মধুর প্রকৃতির মানস-সরোবর যখন বাতাহত হয়েন, যখন ক্ষুব্ধ হয়েন, তখন উত্তাল তরঙ্গমালা উত্থিত হইয়া যেন পার্শ্বস্থ প্রদেশ সকল গ্রাস করিবার জন্য দ্রুতবেগে তটাভিমুখে গমন করিয়া থাকে। মৃদুমন্দ পবনহিল্লোলে যে নয়নাভিরাম তরঙ্গ সকল শ্রুতি-সুখকর সঙ্গীতে শ্রোতার হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহারা এমন ভয়াল রূপ ধরে যে, সে সময় হৃদয় বিভীষিকাগ্রস্ত করিয়া দেয়।

গোসল গুম্ফা পরিদর্শন এবং কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। গমনপথে এক স্থানে কতিপয় লাসাবাসী যাত্রী মানসের জলে শক্তু সিক্ত করিয়া যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছে। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে, মানসের জল লইয়া যাওয়া বড়ই অসুবিধাজনক। কাচপাত্র এ দেশে সুলভ নহে—

ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়ও যথেষ্ট আছে। অন্য ধাতুময় পাত্রেরও নষ্ট হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা। এরূপ অবস্থায় ছাতু সহযোগে জল লইয়া যাওয়াই প্রশস্ত। বুদ্ধিমান্ তিব্বতবাসী এই অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়া সুদূর প্রদেশে, গৃহে আত্মীয়-স্বজনকে মানসের প্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন।

তরঙ্গতাড়িত মানসের মৎস্য সকল তীরে নিক্ষিপ্ত হইলে যাত্রীরা যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া থাকেন। মানসের শুষ্ক মৎস্যের ধূম বালকদের রোগের পক্ষে হিতকর। আমাদের দলের এক জন ভুটিয়া একটি মৎস্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মানসের তট পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আর একবার মানসের জলে আচমন করিয়া লইলাম। রাবণ-হ্রদ যেমন ক্রূরপ্রকৃতির, ইহার আকৃতিও তেমনই বিষম, ইহা সেইরূপই দুরবগাহ। ভুটিয়াদের মধ্যে এরূপ সংস্কার আছে যে, প্রথমে রাবণ-হ্রদে স্নানাদি করিয়া পরে মানসে স্নান করা উচিত। ইহার বিপরীত কার্য্য করা তাঁহারা পুণ্যাহর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন।

অপরাহ্ণকালে আমরা মানসের তট পরিত্যাগ করিয়া উন্নত পাড়ের উপর আরোহণ করিলাম, এই স্থান হইতে মানস ও কৈলাসকে অন্তরে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

আমরা যে সময় মানসের পাহাড়ের উপর উপস্থিত হই, সে সময় এক দল অশ্বারোহীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ইহারা সংখ্যায় ১০।১২ জন ছিল। ইহাদিগকে আমরা ডাকাইত বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম; ইহাদের সকলেই অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। আমাদের দলের বন্দুকধারী ২ জন অগ্রে ছিল, সম্ভবতঃ আমাদিগকে অস্ত্রধারী দেখিয়া আমাদিগকে তাহারা আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই। যাহা

হউক, ইহাতে আমাদের দলের ভিতর বেশ একটা আতঙ্ক আসিয়াছিল। যখন তাহারা আমাদের প্রতি কোনরূপ কুমতলব না দেখাইয়া ধীরে ধীরে তাহাদের গন্তব্য স্থানের অভিমুখে প্রস্থান করিল, তখন আমরাও শঙ্কাহীন হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

পাহাড়ের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপ থাকায় হাঁটিয়া যাঁহারা যাইতেছিলেন, তাঁহাদিগের পক্ষে রাস্তা বড় ক্লেশকর হইয়াছিল। আজিকার দীর্ঘপথ আমাদের সকলের পক্ষেই ক্লেশকর হইয়াছিল; সকলেই শ্রান্ত হইয়াছিলেন—বিশ্রামের জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী দল অবস্থানের জন্য গরলামান্ধাতার পদতলে স্থান-নির্ব্বাচন করেন। রাত্রি প্রায় ৮টার সময় শ্রান্ত হইয়া অন্ধকারে অবস্থান-স্থানে উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখিলাম, তাঁবু খাটান হয় নাই—বিছানা পাতিয়া কেহ শয়ন করিয়াছে, কেহ বা শয়নের উপক্রম করিতেছে। আমিও বিছানা পাতিয়া শয়ন করিলাম। সঙ্গে রুচিকর খাদ্য না থাকায় খাইবার ইচ্ছাও ছিল না। আমাদের দলের প্রায় সকলেই আগমন করিয়াছেন, আমার সঙ্গীটি আর দুই এক জন স্ত্রী যাত্রী উপস্থিত হয়েন নাই। তাঁহাদের জন্য আমরা ভাবিত হইলাম, কিন্তু তাঁহাদের অনুসন্ধানের জন্য কাহাকে পাঠান যায়? এক জন লোক একটু দূরে গিয়া কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করিয়া প্রত্যাগমন করিল, কোন সন্ধান পাইল না। তাঁহাদের সঙ্গে যথেষ্ট শীতবস্ত্র না থাকায় একটু বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। শীতার্ত্ত হইয়া রাত্রি ১টার সময় আমার যুবক সঙ্গীটি উপস্থিত হয়। আজ যেরূপ শীত ভোগ করিয়াছিলাম, সেরূপ শীত কখন ভোগ করি নাই। আজ জুতা পরিয়া শয়ন করিয়াছিলাম; যাহা কিছু গরম কাপড় ছিল, সমস্তই গায়ে দিয়াছিলাম। তাহার

উপর সকলের শরীর ঢাকা দিয়া তাঁবুর কাপড় বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এ সকল উপায়েও শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় নাই। দুই একবার পালের উপর হাত দিতে হইয়াছিল, সে সময় এরূপ শীত বোধ হইয়াছিল, যেন হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে। শীত যেন মেরুপ্রদেশের শীত। কিন্তু এরূপ দুঃসহ শীত ভোগ করিলেও শরীর অসুস্থ হয় নাই।

লাদাক পর্ব্বতশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত গরলামান্ধাতা। আমাদের দেশের পুরাকালের ভৌগোলিকরা এই সকল পর্ব্বতমালার সাধারণ নাম হিমালয় প্রদান করিয়াছেন। ইংরাজরা এই সকল পর্ব্বত ও পর্ব্বতমালার ইচ্ছানুরূপ নামকরণ করিয়াছেন। কৈলাসশ্রেণীতে কৈলাস পর্ব্বত সর্ব্বোচ্চ। ইহার নামানুসারে এই শ্রেণীর নামকরণ হইয়াছে। লাদাক-শ্রেণীতে তাহার বিপরীত লক্ষিত হয়। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধার নংগা পর্ব্বত ব্যতীত এমন মহিমান্বিত পর্ব্বত এসিয়ার মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই। অনির্ব্বচনীয় পার্ব্বত্য শোভার আধার তুঙ্গ পর্ব্বতশিখর ভারতে যত আছে, তত আর পৃথিবীর কোথাও নাই, ইহারা যেন সকলের উপর অখণ্ড প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে।

অখণ্ড প্রভুত্ব বিস্তার করিলেও ইহাদের নামকরণ কিন্তু বিদেশীর দ্বারা সাধিত হইতেছে। পরাধীন দেশে নামবিভ্রাটটা একটু বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে। বিদেশী জিহ্বায় ভাল উচ্চারণ না হওয়াই তাহার প্রধান কারণ। যবন (গ্রীক) হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ-প্রদত্ত নদ-নদী গ্রাম-নগরের নাম উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশের বিষয়, "সাহেব লোক" কিছু অনুশীলন করিলেই তাঁহাদের প্রদত্ত নাম আমরা সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া থাকি।

পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের নাম একটা বিদেশী নাম। য়ুরোপের অন্যান্য দেশের পণ্ডিতরা এরূপ অত্যাচারের ঘোর প্রতিবাদ করিলেও ইংরাজ ইহার লোভ সংবরণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। আমরাও দাসের দল, পাঠ্য পুস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া কথোপকথনে বিদেশি-প্রদত্ত নাম উল্লেখ করিয়া উগ্র দাসত্বের পরিচয় প্রদান করি। কেহ যদি কহেন, উহার নাম গৌরীশঙ্কর, তখন য়ুরোপীয়রা ও তাঁহাদের সেবকের দল বলেন, উহা অনামা—উহার কোন নাম নাই। গৌরীশঙ্কর বল,—ধবলগিরি বল, উহার আশপাশের শৃঙ্গের নাম। সুতরাং তোমাদিগকে বিদেশী নামই বহন করিতে হইবে! জুলুম মন্দ নহে।

এই নাম-প্রসঙ্গে আর একটা হাস্যোদ্দীপক কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মণ্টগোমারী নামক একজন ভদ্র অভিজ্ঞ য়ুরোপীয় কেরাকোরম পর্ব্বত-শ্রেণীকে K আর ইহার শৃঙ্গকে K1, K2 এইরূপ ভাবে নাম দেন। ইহা নিতান্ত মন্দ নহে। টার্নার প্রভৃতি এ রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের নামের আদ্য অক্ষর দিয়া নামকরণ করেন। যেমন T45, T57, ইত্যাদি। অন্য য়ুরোপীয় সেই শৃঙ্গকেই নিজের নামের আদ্য অক্ষর দিয়া বিষম বিভ্রাট আনয়ন করেন। য়ুরোপীয়রা যাহাদের নাম নাই মনে করেন, সেই সকল শৃঙ্গের উচ্চতাই তাহাদের নাম হইতে পারে। যেমন ২০ হাজারী, ২২ হাজারী, এ প্রস্তাব নিতান্ত মন্দ হহে।

প্রাতঃকালে গরলা-মান্ধাতা পরিত্যাগ করিয়া মধ্যাহ্নে একটি জলধারার তটে অবস্থান করি। ১লা আগষ্ট মধ্যাহ্নকালে আমাদের ভুটিয়ানেতার পরিচিত এক তিব্বতী গৃহস্থের গৃহে বহুদিনের পর দধিঘোল তৃপ্তির সহিত পান করিয়াছিলাম। আমাদের গমনপথে

মটর শুঁটির ক্ষেত্র হইতে মটর সংগ্রহ করা হয়, কাঁচা মটর আর চাল ভাজা বড়ই মুখরোচক হইয়াছিল! গৃহে যাইবার জন্য ঝব্বুরা উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, আমরাও তাহাদের অপেক্ষা কম ব্যগ্র ছিলাম না।

ঊনবিংশ অধ্যায়

এ সময়ের একটা কথা কহিতে ভুলিয়া গিয়াছি। কথাটা এই যে, মানস-সরোবর আমার চর্ম্মচক্ষুর নিকট হইতে দূরতর হইলেও আমার কল্পনার নয়নে সর্ব্বদা প্রতিভাত হইয়াছিল। মানস ও রাবণহ্রদের মধ্যবর্ত্তী পাহাড়ের (পাড়ের) উপর হইতে যখন প্রথম দর্শন করিয়াছিলাম—কৈলাস পরিক্রমার সময় যখন কৈলাস হইতে এ অঞ্চলের মানস-বিমোহন অলৌকিক দৃশ্য নয়নগোচর হইয়াছিল—তাহার পর যু-গুম্ফার নিকট রজনীমুখে ভীতিপ্রদ নিস্তব্ধতার মধ্যে তারকাকরোজ্জ্বল, তরঙ্গমণ্ডিত, কনক-কমলশোভিত মৃদুমন্দ মধুর পবনবাহিত মানসমোহন মানস আমার মানসনয়নে যখন পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত নানাজাতীয় জলচর-পক্ষিপরিশোভিত মানসের তট দিয়া যখন দীর্ঘ পথ অতিক্রমণ করিয়াছিলাম, সেই সময়ের বিকসিত সৌন্দর্য্য, এই সকল মিলিত অনুভব, যখন বৃষভারূঢ় হইয়া গমন করিতেছিলাম, তখন যুগপৎ আমার মানসনয়নে প্রতিভাত হইতেছিল।

আবার কখন অদ্ভুত চরিত্র লামাদের কথা মনে হইতে লাগিল। একজন মৌনী লামার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অনেকে এই

অতিবৃদ্ধ লামাকে ভারতীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাকে আমার দেশের কল্যাণকথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ইঙ্গিত করিয়া উত্তর প্রদান করেন। সে উত্তর আমার নিকট প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইয়াছিল। প্রথমতঃ তিনি হস্ত উত্তোলিত করিয়া অঙ্গুলিপঞ্চক বিস্তার করিলেন, অনন্তর পঞ্চ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ একত্র করিয়া পদ্মাকারে পরিণত করিলেন, তদনন্তর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সঙ্গবিবর্জ্জিত সাধু মহাশয় আমাকে গমন করিতে ইঙ্গিত করেন। এই প্রহেলিকার অর্থ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে নানা প্রকার করিতে পারেন। কিন্তু সাধু মহোদয়ের ঈপ্সিত অর্থ কি, তাহা ঘোর অন্ধকারে আবৃত। সে সময় আমি যাহা বুঝিয়াছিলাম, তাহা বিবৃত করিলাম। তাহা গ্রহণ বা পরিত্যাগ পাঠক-পাঠিকাগণ ইচ্ছা অনুসারে করিতে পারেন। তিনি অঙ্গুলি বিস্তার করিয়া যেন দেখাইলেন, আমরা বহুধা বিভক্ত ভারতবাসী একতাবিহীন—বা নায়কবিহীন, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া দুর্ব্বল। যখন এই জাতি এক নায়ক কর্তৃক পরিচালিত হয়, বা সাধারণ স্বার্থসাধন জন্য নিয়ন্ত্রিত হয়, সে সময় চিরদিনের প্রবাদবাক্য যে "পাঁচ আঙ্গুল সমান নয়," ইহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া অন্নগ্রহণাদি সময়ে একত্র হইয়া থাকে, একত্র হইলে—প্রণয়সূত্রে গ্রথিত হইলে—বৈষম্য বিদূরিত হইলে—অথবা বিপন্ন হইলে সেই পঞ্চধা বিভক্ত অঙ্গুলি একত্র হইয়া—মুষ্টিবদ্ধ হইয়া নিজেকে রক্ষা বা আক্রমণ করিয়া নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া থাকে। নিজের কথা সকলের প্রিয় বোধ হইয়া থাকে। আমার এই কল্পিত অর্থ সে সময় আমার অপ্রিয় বোধ হয় নাই। এইরূপ নানা প্রকার ভাবনায় আমি ভাবিত হইয়া পরমানন্দে তাকলাকোট অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

তাকলাকোট অভিমুখে যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই প্রস্তরকঙ্করপরিপূর্ণ কান্তারের পরিবর্তে সলিলসিক্ত সরস শস্যশ্যামল ক্ষেত্র সকল দেখিতে দেখিতে অপরাহ্নকালে ভুটিয়াবাজারে উপস্থিত হইলাম। সকলে স্বীয় স্বীয় আত্মীয়স্বজন কর্তৃক অভ্যর্থিত হইল। যাত্রীরা যাত্রার কথা—সুখ-দুঃখের কথা ব্যক্ত করিয়া ভারমুক্ত হইল। আমি আত্মীয়স্বজন ও দেশবাসীকে আমার কথা কহিতে না পারাতে কি যেন অসম্পূর্ণতা বোধ করিতে লাগিলাম।

প্রত্যাগমনকালে তাকলাকোটে পাঁচ ছয় দিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল। এই সময় আমার পুত্র শ্রীমান্ জগন্নাথের নিকট হইতে একখানি পত্র পাই। তাহাতে লিখিত ছিল, পত্র পাঠমাত্র যেন আমি বাড়ীতে আসি। বাড়ীর সকলেই ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাশায়ী, আর আমার ছোট কন্যাটি মুমূর্ষু। পত্র পাঠ করিয়া মনে মনে একটু হাসিলাম। যদি কোন স্থানে বিশ্রাম না করিয়া প্রতিদিন গমন করি, তাহা হইলেও ১৬।১৭ দিনের কমে বাড়ীতে পৌছিতে পারিব না। এই সময়ের মধ্যে আরোগ্যলাভ বা ধ্রুবগতি এই উভয় বিষয়ে আমি কিছুই করিতে সমর্থ হইব না, সুতরাং বাড়ীর চিন্তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের উপর সমস্ত অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হই। এখানে বলিয়া রাখি, গৃহে যাইয়া সকলকেই স্বাস্থ্যসম্পন্ন, আর মুমূর্ষু কন্যা, যাহাকে ডাক্তার দেখিয়া আসন্নকালের কথা কহিয়াছিলেন—আত্মীয়স্বজনরা ক্রন্দনরোল শুনিয়া সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, সেই রাত্রি হইতে তাহার জননীর কাতর প্রার্থনায় আরোগ্যলাভ করিতে থাকে।

যে কয় দিন তাকলাকোটে ছিলাম, লামা সাধু সন্ন্যাসীদর্শন ব্যতীত সে দেশের বাণিজ্যের বিষয়ও কিছু কিছু অনুসন্ধান করিতাম।

সে দেশে ভেড়ার লোম প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কলের সাহায্যে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিলে প্রচুর লাভ হইতে পারে। জলের শক্তি বৃথা নষ্ট হইতেছে, তাহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা যাইতে পারে। তিব্বতীদের আলস্য আর আমাদের উদ্যম ও অধ্যবসায়ের অভাব বলিয়া এই দুর্দ্দশা।

এক দিন আমার এক বন্ধু ভুটিয়ার দোকানে বসিয়া আছি, এমন সময় এক জন তিব্বতী স্বর্ণরেণু বিক্রয় করিতে আগমন করে। দেখিয়া বোধ হইল, অতি উত্তম স্বর্ণ। তাহাদের মুখে শুনিলাম, কৈলাস অঞ্চলে সোনার খনি আছে। সেই স্থান হইতে ইহারা গুপ্তভাবে স্বর্ণ আনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। একবার মনে হইয়াছিল, নমুনাস্বরূপ কিছু সোনা কিনি। কিন্তু নানারূপ আশঙ্কা করিয়া তাহা হইতে বিরত হইয়াছিলাম। তিব্বত নানা প্রকার খনিজপদার্থে পরিপূর্ণ। চেষ্টা করিলে খনিবিদ্যাবিৎ ভারতবাসী নানা প্রকার বহুমূল্য খনিজপদার্থের সন্ধান পাইতে পারেন। আমাদের জম্বুদ্বীপ (শ্যাম প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধরা আমাদের এ সকল দেশকে জম্বুদ্বীপ বলিয়া থাকেন। আমরাও সঙ্কল্পকালে জম্বুদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি) সম্বন্ধে য়ুরোপীয়দিগের জ্ঞান চিরকালই অগাধ। তাঁহাদের এক জন লিখিয়াছেন, (মারকোপোলি) এক পিপীলিকা সুবর্ণ উত্তোলন করিয়া থাকে। যাউক্ সে সব কথা। এক দিন বাঙ্গালী তিব্বতকে ধর্ম্ম দিয়াছেন, বর্ত্তমানকালে আর্থিক উন্নতিকল্পে ইঁহারা সাহায্য করিলে উভয়েই লাভবান্ হইবেন।

ঝব্ব্ সংগ্রহে বিলম্ব হওয়াতে তাকলাকোট ছাড়িতে বিলম্ব হইয়াছিল। ৭ই আগষ্ট সকাল সকাল ভোজন করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করি। পদব্রজে কর্ণালী পার হইলাম। আমাদের গমনপথে

স্থানে স্থানে পানচাক্কী দেখিতে পাওয়া গেল, গ্রামবাসীরা যবাদি চূর্ণ করাইতেছে। কোথাও বা তিব্বতী নারীরা বস্ত্র প্রক্ষালন করিতেছে; কোথাও বা ভারবাহী ঝব্বু ও মেষ সকল দলে দলে নদী পার হইতেছে; ইহা দেখিতে দেখিতে আমরা অপর পারে নদীর উচ্চতটের উপর আরোহণ করিলাম। লিপুলেখ পথ শীঘ্র শীঘ্র পার হইবার জন্য আমরা একটু ব্যস্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু ঝব্বুগুলা রাস্তার সমীপবর্ত্তী তাহাদের গৃহে গমন করিয়া বিলম্ব করিতে লাগিল। আমরা নিকটবর্ত্তী শস্যক্ষেত্র আর তাহাতে আগাছার প্রস্ফুটিত নয়নরঞ্জন পুষ্প দেখিয়া, আর মটর-ক্ষেত হইতে কড়াইশুটি সংগ্রহ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিয়াছিলাম।

আসিবার সময় যে সকল জলপূর্ণ পার্ব্বত্য নদী দেখিয়াছিলাম, এ সময় সেগুলিতে অধিক জল ছিল না, ঝব্বু চড়িয়াই অনায়াসে পার হইয়াছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে পালার নিকটবর্ত্তী হওয়া গেল। এই স্থানে কাশ্মীরী সেনানী বস্তিরাম, তিব্বতী সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পর্য্যুদস্ত হইয়াছিলেন—তিব্বতীরা তাঁহার যাহা না করিতে পারিয়াছিলেন, তুষারপাত তাঁহাকে তদপেক্ষা অধিকতর বিপন্ন করিয়াছিল। ভারতীয় সৈন্যের দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিল না। সেই সকল হৃদয়বিদারককাহিনী স্মরণ করিয়া পালার প্রান্তর পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলাম।

পালায় কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিয়া আবার অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এক্ষণে ধীরে ধীরে লিপুলেখ পথের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। রাস্তায় কতিপয় ভুটিয়া ব্যবসায়ী তাকলাকোটে গমন করিতেছে দেখিলাম। আর দেখিলাম, এক জন খঞ্জ কতকগুলি ভারবাহী মেষ লইয়া লিপুলেখ হইতে অবতরণ করিতেছে।

ভগবানের কৃপা হইলে, আর উত্তম থাকিলে পঙ্গুও হিমালয়ের ন্যায় অত্যুচ্চ পর্ব্বত অবলীলাক্রমে অতিক্রমণ করিয়া থাকে।

চড়াইএর কঠিন স্থানে ঝব্ব, পরিত্যাগ করিয়া হাঁটিয়া উঠিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে গমন করিয়া লিপুলেখ লা তে (লা তিব্বতী শব্দ—অর্থ গিরিপথ) উপস্থিত হইয়াছিলাম। মধ্যাহ্নকাল অতিক্রমণ করিয়া এই স্থানে পৌছিয়াছিলাম। মনে মনে ভয় হইয়াছিল, পাছে তুষারপাতে বিপন্ন হই। সৌভাগ্যক্রমে হিমানীপাতের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নাই। চতুর্দ্দিক নির্ম্মল ছিল, সূর্য্যদেব কুজ্ঝটিকাজাল দূর করিয়া দেওয়াতে অতিদূরের দৃশ্য স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। সাধুমহাত্মার দেশ—লামার রাজ্য—গৌড়বাদীর ধর্ম্ম-প্রচারক্ষেত্র—নগ্নপ্রকৃতির লীলা নিকেতন তিব্বত একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। নয়ন যেন সে দিক হইতে ফিরিতে চাহে না—অস্থির মন যেন কৈলাস-মানসের দেশে সুস্থির হইয়া অবস্থান করিতে চাহে। এরূপ অবস্থায় কিয়ৎক্ষণ তথায় অতিবাহিত করিয়া অনিচ্ছায় ভারতের দিকে নামিতে লাগিলাম। বহু দূর বরফের উপর দিয়া গমন করিতে হইয়াছিল। দুই ধারে জীববাসের অযোগ্য—অনন্তকাল হইতে বজ্রাঘাতে বিশীর্ণ তুঙ্গ শৃঙ্গ সকল দেখিতে দেখিতে নামিতে লাগিলাম। আগমনকালে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প দেখিয়াছিলাম, এখন গমনপথের অধিকাংশ স্থল রক্তপীতাদি বর্ণের পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হওয়ায় অত্যন্ত রমণীয় হইয়াছিল।

যাঁহারা পর্ব্বত দেখেন নাই, তাঁহাদিগকে পর্ব্বত কিরূপ, তাহা বুঝান বড়ই কঠিন। কুম্ভীরের পৃষ্ঠের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। ইহার কাঁটা বা গাঁট যেমন পিঠের উপর ক্রমে ক্রমে উঁচু হইয়াছে, পর্ব্বতও সেইরূপ। পর্ব্বত সকল শ্রেণীবদ্ধ ; ইহার মধ্যেও

শৃঙ্খলা আছে। যাঁহারা এ বিষয় অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা অবগত আছেন। উচ্চ শৃঙ্গ হইতে উঠিয়া দেখিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। পর্ব্বতের বৃদ্ধি আছে। উচ্চ হিমালয়ের বৃদ্ধি হইতেছে কি না, তাহা প্রমাণিত হয় নাই, কিন্তু নিম্ন হিমালয়ে শৈবালিক পর্ব্বতশ্রেণী যে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ভারতের সমতল ভূমি হইতে ধূলি বায়ুযোগে নীত হইয়া হিমালয়ের বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকে। এরূপ ভাবে বৃদ্ধি অপেক্ষা হিমালয়ের ক্ষয় বড় কম হয় না। বর্ষাকালে হিমালয়ের অঙ্গ ধৌত করিয়া প্রচুর পরিমাণে মৃত্তিকামিশ্রিত আবিল জল সমতল ভূমিতে নীত হইয়া থাকে। তাহাও আমরা বর্ষাকালে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ভূকম্পে উন্নতি ও অবনতি সাধিত হয়। যাঁহারা এ সকল বিষয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আলোচনা করিবেন, তাঁহারা ইহার অনুসন্ধান করিবেন। আমি তীর্থযাত্রী—অবৈজ্ঞানিক, ইহা আমার আলোচনার বিষয় নহে।

জীবজন্তুবনস্পতিবিহীন মৃতপ্রায় হিমালয় হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়া সজীব হিমালয়ের প্রান্তভাগে সন্ধ্যার প্রাক্কালে উপস্থিত হই। এ স্থানের নাম কালাপানি। আগমনকালে যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলাম, তাহা হইতে ইহা প্রায় এক মাইল উত্তরে। এ স্থানে রায় সাহেব গোবরিয়া পণ্ডিতের একখানি দ্বিতল বাংলা আছে। সেই বাংলায় আমরা রাত্রিযাপন করি। অনেক দিন এরূপ গৃহে অবস্থান করি নাই; মনে হইল, যেন দেশের নিকটবর্ত্তী হইতেছি।

ভোজনবিপর্য্যয় ও পরিশ্রম জন্য আজ আমার পেটের পীড়া দেখা দিল। আম ও রক্তমিশ্রিত পেটের পীড়া হইয়াছিল। আমার

যাত্রার সময় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন কবিরাজ মহাশয় কতকগুলি ঔষধ দিয়াছিলেন, সে ঔষধ অনেক রোগীকে বিতরণ করিয়াছিলাম। পেটের পীড়ার প্রথম অবস্থায় "সিদ্ধ প্রাণেশ্বর" বটিকা সেবন করিয়া আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যে রোগমুক্ত হইয়াছিলাম। পর্ব্বতযাত্রীর নিকট পেটের পীড়ার ঔষধ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। গত বৈশাখ মাসে প্রায় ৪ শত মাইল হিমালয়ে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছিলাম। এই ভ্রমণকালে আমি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হই। আমার সহযাত্রীরা আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও আমার নিজের দোষের জন্য প্রায় ৪ মাস রোগভোগ করিয়াছিলাম। রোগের প্রথম অবস্থায় যদি রোগ দূর করিবার প্রতিবিধান করিতাম, তাহা হইলে, বোধ হয়, দীর্ঘকাল কষ্ট পাইতে হইত না।

গোবরিয়া পণ্ডিতের বাসায় সুখে রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতঃকালে পুনরায় আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। আমরা কখন দেবদারু-বনের ভিতর দিয়া, কখন বা পীতপুষ্পশোভিত সর্ষপক্ষেত্রের শোভা দেখিতে দেখিতে, কখন বা প্রস্ফুটিত গোলাপ-বনের মধ্য দিয়া উচ্ছলিত কালীর কূলের উপর দিয়া গমন করিতে লাগিলাম। আজ চড়াই উৎরাই খুব কমই ছিল, রাস্তা অনেকটা সমতল। সমতল ভূমির উপর দিয়া যাওয়াতে আমাদের গমন-ক্লেশটা অনেকটা কম হইয়াছিল। বনভূমির প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ণ-কালে সুপরিচিত গারবাংএ পুনরায় উপস্থিত হইলাম।

বিংশ অধ্যায়

গারবাংএর জনসাধারণ আমার যেন পরম আত্মীয়ে পরিণত হইয়াছিলেন। আমাকে প্রত্যাগত দেখিয়া তাঁহারা যথেষ্ট প্রীতি-প্রকাশ করেন। আর প্রীতিপ্রকাশ করেন, পোষ্ট ও স্কুলমাষ্টার লক্ষ্মীধর পণ্ডিতজী ও স্কুলের ছাত্ররা। তাঁহাদের সৌজন্য আমার মানসপটে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে।—রুমাদেবীর আগ্রহে আর কুলী-সংগ্রহে বিলম্বের জন্য বাধ্য হইয়া এই স্থানে এক দিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল। এই স্থানের ভারবাহীরা কোনরূপে সসাচৌদাসের নীচে যাইতে রাজী হয় না। তাহাদের যুক্তি—নিম্নের দেশ বড় গরম; তথায় যাইলে অসুখে পড়িবে। অগত্যা তাহাদের কথায় আমাকে বাধ্য হইয়া সম্মত হইতে হয়। বলা বাহুল্য, কুলী সংগ্রহ রুমাদেবী করিয়াছিলেন বলিয়া এত শীঘ্র সংগ্রহ হইয়াছিল।

অবস্থানের, দিনের অনেক সময় স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় ও ছাত্রদের মধ্যে কাটাইয়াছিলাম। পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে শুনিলাম, কালীর উপর ভুটিয়াদের প্রস্তুত পুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; আমাকে নিরাপানির অত্যন্ত দুর্গম রাস্তা দিয়া গমন করিতে হইবে। কেমন করিয়া যে আমি তাহা অতিক্রমণ করিব, সে বিষয়ে তিনি একটু চিন্তিতও হইয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তা দেখিয়া আমিও একটু অবসন্ন হইয়াছিলাম। কি করা যায়, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে" আর রাস্তা নাই। ইহা যেন ক্ষুরধারা হইতেও ভীষণ।

প্রাতঃকাল হইল; কুলী আসিল; আমিও গমনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার সুখের ও দুঃখের সাক্ষী গারবাংকে চিরকালের

জন্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। গমনের পূর্ব্বে একবার স্কুলে গেলাম; শিক্ষক ও ছাত্র সকলের নিকট বিদায় লইলাম। কৈলাসে গমনসময় পুনরায় দেখা হইবে, এই জন্য সে সময় তাঁহারা হাসিয়া বিদায় দিয়াছিলেন, এ সময় অনেকে ম্লানমুখে আমাকে সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। রুমাদেবী তাঁহার কতিপয় সঙ্গিনীসহ আমাদের অনুগমন করিলেন। তিনি গারবাংএর সীমা পরিত্যাগ করিয়া বুধির উপরিভাগ পর্ব্বতের মস্তক পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। গমনকালে নানাপ্রকার বন্য ফল তুলিয়া তাঁহারা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। সে সময় তাহা অতীব সুমধুর বোধ হইয়াছিল। তাঁহাদের সহিত বিদায়কালের দৃশ্য আমার কাছে চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। 'অনেক সময় গৃহ হইতে অনেক দূর প্রদেশে গমন করিয়াছি; আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, সখাসখী কাতরভাবে বিদায় দিয়াছেন। এ বিদায় সে বিদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। বিদায়কালে অশ্রুজলে দেবীর গণ্ডদেশ সিক্ত হইয়াছিল, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়াছিল, আর তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিত দৃষ্টি আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। অতি কষ্টে তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অবতরণ করিবার পূর্ব্বে একবার চারিদিক দেখিয়া লইলাম। নেপালের দিকে চিরতুষারাবৃত তুঙ্গশৃঙ্গ পর্ব্বত সকলও দেখিয়া লইলাম। আমাদের অবতরণের সহিত আমাদের কল্যাণকামনা করিয়া সঙ্গিগণ সহ দেবী মঙ্গলগীত গান করিয়াছিলেন। যখন ভুটিয়াদের আত্মীয়স্বজন দূরদেশে গমন করেন, সেই সময় ভুটিয়া রমণীরা এই স্থানে বিতত শিলার উপর উপবেশন করিয়া প্রিয়জনের কল্যাণকামনা করিয়া গান গাহিয়া থাকেন। ভগবৎকৃপায় এই দূর প্রদেশেও আমরা দেবীর আত্মীয়তালাভে বঞ্চিত হই নাই।

বুধি, আমাদের পদতলে অবস্থিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন গ্রামের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছিল। আগমনকালে যখন পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছিলাম, তখন অনেক ক্লেশে শরীর হইতে "কাল ঘাম" বাহির করিয়া উপরে উঠিয়াছিলাম। এখন অবলীলাক্রমে ও অল্প সময়ে নীচে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখনও রুমাদেবী পর্ব্বতমস্তকে ক্ষুদ্র বিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। বুধি পরিত্যাগ করিয়া যখন পর্ব্বতের অপর দিকে গমন করিয়াছিলাম, যখন আমরা তাঁহাদের চক্ষুর অগোচর হইলাম, তখন তাঁহারা গমন করিয়াছিলেন। এই মহীয়সী মহিলার মহিমান্বিত মধুর চরিত্র আলোচনা করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

ভুটিয়ারা স্বাবলম্বী, ব্যবসায়ী ও উদ্যমশীল। ইঁহারা প্রাণের প্রতি মমতা না রাখিয়া অভীষ্টসাধনে তৎপর। তিব্বতের ভৌগোলিক জ্ঞানবিস্তারপক্ষে ইঁহারা যেরূপ অধ্যবসায়, ক্লেশ সহিষ্ণুতা ও বিপদে ধীরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তিব্বতের ভৌগোলিক ইতিহাসে বিস্ময়ের সহিত পঠিত হইবে। কিষণসিং, নেমসিং, রামসিং, লালসিং প্রভৃতির নাম চিরকাল ভক্তিসহকারে পূজিত হইবে। ইঁহারা সময় সময় দস্যুকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়াছেন, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছে, তথাপিও কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। তাঁহারা লামা সাজিয়া ধর্ম্মচক্রের ভিতর গোপনে যন্ত্র রাখিয়া গমনকালে প্রত্যেক পদবিক্ষেপ হস্তস্থিত মালায় গণিয়া মাইলের হিসাব করিয়াছিলেন। অবকাশ পাইলে ভারতবাসী এরূপ কঠোর কার্য্য করিয়া জগৎকে বিমুগ্ধ করিতে পারেন। ভুটিয়াদের এই সকল অবদানপরম্পরা আলোচনা করিয়া ও নানাপ্রকার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অপরাহ্নকালে মালপার ডাকহরকরাদের কুটীরে উপস্থিত হই।

গারবাংএ অবস্থানকালে ডাকহরকরাদের সহিত পরিচিত

হইয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে এ স্থানে যে ব্যক্তি ছিল, সে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। গমনকালে যে গুহায় রাত্রিবাস করিয়াছিলাম, সেই গুহায় আর এক রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

রজনীপ্রভাতের সহিত গমন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। আজ নিরপানির দুর্গম রাস্তা অতিক্রমণ করিতে হইবে। পাঠক! রাস্তার নামেই এ রাস্তায় জলের অভাব সূচিত হইয়া থাকে। মালপা পরিত্যাগের কিয়ৎক্ষণ পরে আমি পথিভ্রষ্ট হইয়াছিলাম। আসিবার সময় পথে জঙ্গল ছিল না; বর্ষার আগমনের সহিত ক্ষুদ্র তৃণগুল্ম দীর্ঘাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জঙ্গলের জন্য রাস্তা চিনিয়া গমন করা দুরূহ ব্যাপার। আমার কুলী একটু আগে চলিয়া গিয়াছে, রাস্তায় জনমানব নাই—সবই নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ। আমি রাস্তা ছাড়িয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাস্তা হারাইয়া ফেলি। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক গমন করিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। যদি হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পড়িতাম, তাহা হইলে প্রাণরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিত। এইরূপে বিপন্ন হইয়া কোন্ দিকে যাইব চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময় ডাকহরকরার ঘণ্টার শব্দ আমার কর্ণগোচর হয়। অনেক চীৎকার করিয়া তাহাকে আমার অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। তাহার কৃপায় কুমার্গ পরিত্যাগ করিয়া সুমার্গে আগমন করিয়াছিলাম। তাহাকে কিছু কৃতজ্ঞতার চিহ্ন দিয়া ত্বরিতগতিতে গমন করিয়া কুলীদের সহিত মিলিত হই। স্থানে স্থানে ভুটিয়ারা এই দুর্গম রাস্তার অত্যন্ত দুর্গম স্থান সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। এই সংস্কৃত রাস্তাতেও অতি সন্তর্পণে পাহাড়ের গাত্রে হস্ত রাখিয়া গমন করিতে হইয়াছিল। সময় সময় ঘাস ধরিয়া দীর্ঘ যষ্টির ও কুলীদের সাহায্যে নামিতে বা উঠিতে হইয়াছিল। পর্ব্বতের গাত্রে দেড় দুই হাত বিস্তৃত রাস্তা দিয়া

গমন করিতে হইয়াছিল। এই সঙ্কীর্ণ রাস্তায় বর্ষায় বড় বড় তৃণ জন্মে; গমনপথে ইহাও বাধা প্রদান করিয়াছিল। এই স্থান হইতে পতন হইলে বহু সহস্র ফুট নিম্নে প্রবাহিতা প্রমত্তা কালীতে পড়িতে হইত। উপর হইতে যদি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড পতিত হয়, তাহা হইলে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। এই সুদীর্ঘ পথে কয়েক জন নেপালী কৈলাসযাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল মাত্র। অপেক্ষাকৃত একটু প্রশস্ত স্থানে দাঁড়াইয়া আমরা কথোপকথন করিয়াছিলাম। দেবতা-ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে কোনরূপে এই দুর্গম রাস্তা অতিক্রমণ করিয়া সায়ংকালের পূর্ব্বে সামখেলায় উপস্থিত হই।

গমনকালে এই স্থানে এক রাত্রি কাটাইয়াছিলাম। প্রধানের সঙ্গেও পরিচয় হইয়াছিল। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া আনন্দের সহিত পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। পরদিবস চৌদাস-সসাতে উপস্থিত হওয়া গেল। গারবাংএর কুলী এই স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া চলিয়া গেল। এ স্থানে নূতন কুলী বন্দোবস্ত করা গেল। সে রাস্তার মধ্যে পদ্দ নামক গ্রামে গিয়া আর অগ্রসর হইতে চাহে নাই। অগত্যা এই গ্রামে থাকিতে হইয়াছিল। এই দিনেই যাহাতে গমন করিতে পারা যায়, তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কুলী পাওয়া যায় নাই। পরদিবস কোনরূপে কুলী সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হওয়া গেল। যখন ধবলীগঙ্গার পথে উপস্থিত হওয়া গেল, সে সময় একজন কুলী কহিল, আমরা আর অগ্রসর হইব না। ইহাই খেলার সীমানা, মস্তকের উপর খেলা দেখিতে পাওয়া গেল। ইহা এক মাইলেরও বেশী দূর হইবে। কুলীদের ইচ্ছা, এইরূপ চাপ দিয়া কিছু বেশী পয়সা আদায় করা। জবরদস্তী করিয়া আদায়ের আমি ঘোর বিরোধী; উহাদিগের মধ্যে এক জনকে কিছু মিশ্রী দিয়া সদয়

ব্যবহারে বশীভূত করিয়া লইলাম। আমার বুকের পকেটে নোট গোল করিয়া রাখিয়াছিলাম। অপরকে কহিলাম, ইহা রিভলভার; যদি বেশী বদমাইসী কর, তাহা হইলে তোমাকে গুলী করিয়া পদাঘাতে ধৌলীতে ফেলিয়া দিব। এই ধমকের ফল ফলিল। নিরীহ গো-বেচারীর মত সে মোট লইয়া উপরে পৌঁছাইয়া দিল।

খেলাতে আসকোটের এক জন ভদ্রলোকের বাস ছিল। তাঁহার বাসায় অবস্থান করিলাম। তিনি পরদিনের জন্য অন্য কুলী বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলেন। তিনি এক দিন খেলাতে থাকিবার জন্য অনুরোধ করেন, তাঁহার অনুরোধ পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইলাম। খেলার ঘৃত এ অঞ্চলের মধ্যে প্রসিদ্ধ; রাস্তার খরচের জন্য উহা কিছু সংগ্রহ করা গেল।

খেলা হইতে ধারচুলার রাস্তা নিতান্ত মন্দ নহে; কিন্তু দুই স্থানে পাহাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে রাস্তা অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল হইয়াছিল। প্রথম স্থানে গিয়া দেখি, রাস্তা ভাঙ্গিয়া গভীর গর্ত্তে পরিণত হইয়াছে। কোন্ দিক্ দিয়া যে যাইব, যখন তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলাম না, সেই সময় এক জন ভুটিয়া আগমন করিয়া পথিপ্রদর্শক হইয়াছিল। গাছের মূল ধরিয়া উপরে উঠিয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়া পুরাতন রাস্তায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, আবার কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখি, অনেকটা ধস ভাঙ্গিয়া রাস্তা লোপ হইয়াছে, আর কাদা-পাথর সর্ব্বদাই উপর হইতে পড়িয়া রাস্তা ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে।

মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই ধারচুলার পণ্ডিত লোকমণিজীর গৃহে উপস্থিত হই। পণ্ডিতজীর সাদর সম্ভাষণে ও আনন্দে আপ্যায়িত হইলাম। আম্র, কদলী প্রভৃতি ফল ও নানা প্রকার ভোজ্যদ্রব্যে ভোজন সম্পন্ন করিলাম। পরদিবস প্রাতঃকালে আসিবার সময় উষ্ণ দুগ্ধে

কদলী, চিনি ও ময়দা গুলিয়া প্রাতরাশের বন্দোবস্ত করা হয়। বহু দিন এরূপ খাদ্যের আস্বাদ গ্রহণ করি নাই, তাই বড়ই উপাদেয় বোধ হইয়াছিল। পণ্ডিতজী হিমালয়ের নানা প্রকার ঔষধি সংগ্রহ করিয়া থাকেন। আমাকে তিনি কিয়ৎপরিমাণে বিশুদ্ধ শিলাজতু দিয়াছিলেন। আমার নিকট কতকটা পুরাতন তেঁতুল ছিল. এ প্রদেশে তেঁতুল দুষ্প্রাপ্য, তাহা তিনি কৃপা করিয়া গ্রহণ করিয়া আমাকে আনন্দিত করিয়াছিলেন।

ধারচুলা হইতে বালবাকোটে গমন করি। তথাকার প্রধান মহাশয় যত্নের সহিত রাখিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে পরদিবস প্রাতঃকালে আসকোট অভিমুখে গমন করি। আবার গৌরী নদীর সুন্দর সেতু পার হইলাম। বর্ষার জন্য গৌরী প্রচুর পরিমাণে জল লইয়া কালীকে পরিপুষ্ট করিতেছে। গৃহের জলনির্গমনের জন্য পয়ঃপ্রণালী না থাকিলে জল বসিয়া যেমন বাড়ীর ক্ষতি হইয়া থাকে, পর্ব্বতের অবস্থাও সেইরূপ হইত; জল বসিয়া পর্ব্বতের মূল শিথিল হইত; তাহা হইতে ইহাকে সুরক্ষিত করিবার জন্য সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রী প্রকৃতি দেবী জলনির্গমের জন্য এই সকল নদীর সৃষ্টি করিয়াছেন। যেন এক বিন্দুও জল হিমালয়ে থাকিতে না পায়। যাহা হইতে নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাকে সুরক্ষিত করিবার জন্য এই সকল নদীর সৃষ্টি হইয়াছে।

গৌরীর তট হইতে আসকোট প্রায় ২ মাইল চড়াই পার হইয়া যাইতে হয়। মধ্যাহ্নকালের সূর্য্যের উত্তাপে ক্লান্ত হইয়া এই কড়া চড়াই বড়ই ক্লেশপ্রদ হইয়াছিল। যতই উঠি—যতই পর্ব্বতের বাঁক ঘুরিয়া গমন করি, ততই যেন আসকোট দূরতর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে রাজওয়াড় সাহেবের প্রাসাদ নয়নগোচর হইল।

রাস্তার অপর পারে একটা ক্ষুদ্র পর্ব্বতের মস্তকোপরি ইহা অবস্থিত। ইহা দেখিতে দেখিতে কিয়ৎক্ষণ অবতরণের পর আসকোটে উপস্থিত হইলাম। প্রথমবারে যখন আসকোটে প্রবেশ করি, তখন যেন এক প্রকার বিভীষিকা, আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। আসকোট যেন আমাকে ইহা শীঘ্র পরিত্যাগ করিবার ইঙ্গিত করিতেছিল। এক্ষণে গ্রামে প্রবেশকালে বোধ হইল, ইহা আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছে।

আসকোটে উপস্থিত হইয়া পোষ্ট আফিসে আশ্রয় লইলাম। ব্রাহ্মণ যুবক পোষ্টমাষ্টার আমাকে অকস্মাৎ দেখিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন; আর আমার আগমনবার্ত্তা কুমার নগেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের কাছে প্রেরণ করিলেন। মাষ্টার, আজ তাঁহার আতিথ্য-গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিলেন। ইত্যবসরে কুমার বাহাদুরের নিকট হইতে এক জন থালায় করিয়া আম্র, কদলী প্রভৃতি ফল লইয়া উপস্থিত হইল। আমি তাঁহার কাছারীর সুন্দর ঘরে থাকিবার জন্য আহূত হইলাম। উপস্থিত অন্ন পরিত্যাগ করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে; বিশেষতঃ আমার মত পথিকের পক্ষে কোনরূপেই নহে। কৈলাসদর্শনজন্য এ বৎসর যেরূপ আমার জীবনের স্মরণীয় বৎসর, সেইরূপ এই সুদীর্ঘ জীবনে কোন বৎসর আম্রভোগে বঞ্চিত হই নাই, এ জন্যও এ বৎসর আমার অনেক দিন মনে থাকিবে। যাঁহারা আমাকে প্রতিবৎসর আম পাঠাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের কথা স্মরণ করিতে করিতে আম্রের সার্থকতা সম্পাদন করা গেল। আজ আমার সঙ্গীর মহানুভাবুকতার ও বৈরাগ্যের যথার্থ পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাহা পাঠককে না জানাইলে আমি গুণগ্রহণ-শক্তিরহিত বলিয়া বিবেচিত হইব। তিনি

বলিলেন, "আমি আম খাই না, আমাকে দিবেন না।" কথা কয়টি আমার কাছে বড়ই মধুর বোধ হইয়াছিল। কয়টি মাষ্টারকে দিয়া অবশিষ্ট আম আমারই ভোগে আসিয়াছিল। আমগুলি দেখিয়া বোধ হইল, অতি যত্নের সহিত সুরক্ষিত হইয়াছিল। আসকোটে আসিয়া বোধ হইল, যেন দেশেই আসিয়াছি।

ভোজনের পর কুমার সাহেবের লোক আমাকে তাঁহার কাছারী-ঘরে লইয়া গেল। আসন বিস্তার করিয়া সুখাসনে উপবিষ্ট হইলাম। আমার গমনের পর কলেরার প্রকোপ কিরূপ বাড়িয়াছিল, সেই সকল দুঃখপূর্ণ কাহিনী কুমার সাহেবের লোক বিবৃত করিতে লাগিল।

আমার বাসগৃহ হইতে এ স্থানের দৃশ্য চির-অভিনব। এই মধুর দৃশ্য যেন মানুষের শোক, তাপ, ক্লান্তি দূর করিয়া দেয়, অন্ততঃ আমার পক্ষে তাহা হইয়াছিল। নিম্নে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র—নেপালের সুন্দর বন্য শোভা। কালীর গভীর গর্জ্জন ক্ষীণরবে পরিণত হইয়া সঙ্গীতের ন্যায় কর্ণগোচর হইতেছিল। কুমার নগেন্দ্রনাথ, কুমার খড়্গসিং (ইনি সরকারী কার্য্যে অনেকবার তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন), অন্যান্য রাজকুমার সহ আমার কাছে আগমন করিয়া আমাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। আমি কৈলাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছি, হিন্দুর কাছে, বিশেষতঃ প্রাচীন প্রথানুযায়ী হিন্দুর কাছে আমি শ্রদ্ধার বস্তু হইয়াছিলাম। এই প্রথা প্রাচীন প্রথার ভগ্নাংশ কি না, তাহা জানি না। যাভাতে রেলে গমনকালে এক জন মক্কা-প্রত্যাগত যাত্রীর অভ্যর্থনা দেখিয়াছিলাম। তাঁহাকে আলিঙ্গন—তাঁহার শরীরস্পর্শ—এমন কি, তাঁহার বস্ত্র স্পর্শ করিবার জন্য জনগণের ব্যাকুলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বালকরা ক্রীড়াকন্দুক

গ্রহণ জন্য যেরূপ আগ্রহ দেখায়, সমবেত জনমণ্ডলীর আগ্রহ তাহা অপেক্ষা কম ছিল না।

আমার এই অবস্থানের প্রথম রাত্রিতে নর্ত্তকীর নৃত্য ও সঙ্গীত হইয়াছিল; পর-রাত্রিতে এ দেশবাসীর চক্রাকারে দলবদ্ধ হইয়া নৃত্য ও গীত আমার বড়ই মধুর লাগিয়াছিল। দিবাভাগে জঙ্গলের আদিম নিবাসী আনীত হইয়াছিল। ইহারা মনুষ্যসমাজে বড় বেশী আইসে না; নিভৃত বনে অবস্থান করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে এরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, তাহারা এক সময় এ প্রদেশের রাজা ছিল, এ জন্য তাহারা কাহারও কাছে মস্তক অবনত করে না। নিজেদের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বনমধ্যে অবস্থান করিয়া থাকে।

সহস্র সহস্র ব্যক্তি—নিষেধ সত্ত্বেও ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া এই ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়াছে, কৈ, তাহাতে ত এক মুহূর্ত্তের জন্য কোনরূপ চিত্তবিকার হয় নাই। আমার সংবর্দ্ধনার জন্য এই রাজসিক ব্যাপারে আমি মুগ্ধ হইলাম। অকস্মাৎ আমার কি মূল্য বৃদ্ধি পাইল, তাহা ভাবিয়াই আমি আকুল হইয়াছিলাম। এ সম্মান দরিদ্র ব্রাহ্মণের ধাতে সহে নাই। এই সম্মান হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আমি ব্যস্ত হইলাম; তাঁহারাও রাখিবার জন্য আগ্রহ করিতে লাগিলেন। নিম্নগামী জলের গতি কেহ যেমন রোধ করিতে পারে না, আমারও অবতরণ সেইরূপ অবরুদ্ধ হয় নাই।

কথায় কথায় তাঁহাদের মুখে এক জন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী এ স্থানে অনেক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন শুনিলাম। তিনি কোন কোন রাজকুমারকে ইংরাজী ও সঙ্গীতবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে হারমোনিয়ম আনাইয়া তাহাও বাজাইতে শিখাইয়াছিলেন। সেই বাঙ্গালী সাধুর কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম।

আসকোট পরিত্যাগের পর বাড়ী আসিয়া মনে হইয়াছিল, আর ২।১ দিন তথায় থাকিলে মন্দ হইত না। এ জ্ঞানটা অনেক দেরীতে হইয়াছিল বলিয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম।

আগমনকালে কুমার সাহেব আমাকে তাঁহাদের কয়েকখানি ফটোগ্রাফ, একখানি তিব্বতের সুন্দর আসন আর কিছু খাবার রাস্তায় খাইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এ স্থানে একটি মধুর কথা কহিতে ভুলিয়া গিয়াছি। কুমার সাহেবের একটি বালিকা কন্যা আমাকে এত ভালবাসিয়াছিল, আমার এত অনুগত হইয়াছিল যে, তাহাকে "কলিকাতা যানুছ?" অর্থাৎ কলিকাতায় যাইবে প্রশ্ন করিলে সে সহাস্যবদনে "যাইব" বলিয়া উত্তর দিত। এই সকল মায়ার বন্ধন ছেদন করিয়া আমি আসকোট পরিত্যাগ করিলাম।

একবিংশ অধ্যায়

আসকোটে দুই রাত্রি অবস্থান করাতে শারীরিক ক্লান্তিও অনেকটা দূর হইয়াছিল। কুমার সাহেবের যত্নে টনকপুর পর্য্যন্ত কুলী যাইবে বন্দোবস্ত হইয়াছিল। রাস্তায় কুলী বদলান বড়ই বিরক্তিকর ব্যাপার; সুতরাং এখন নিরুদ্বেগে গমন করিব ভাবিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। প্রাতঃকালে কুলী উপস্থিত হইল; কিন্তু বৃষ্টির জন্য গমনে একটু বিলম্ব হইল। যখন দেখিলাম, বৃষ্টির বিরামের কোন সম্ভাবনা নাই, তখন অগত্যা আর বিলম্ব না করিয়া সকলের নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা করা গেল।

কিয়ৎক্ষণ গমনের পর মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাহার সহিত বায়ুর বেগ থাকায় সোনায় সোহাগা সংযোগের ন্যায় হইয়াছিল। দীর্ঘ যষ্টির সহায়তায় পিচ্ছিল পন্থা হইতে দেহযষ্টির পতনভয় বিদূরিত হইয়াছিল। আলমোড়া হইতে যে রাস্তা দিয়া আসিয়াছিলাম, সে রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে পাহাড় ঘুরিয়া অপর দিকে গমন করিলাম। রাস্তার মোড় হইতে দূরে আসকোট দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল—যে গৃহে আরামে অবস্থান করিয়াছিলাম, সেই বিন্দুসম গৃহকে সোৎসুক নয়নে শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম। পর্ব্বতের অপর পারে উপস্থিত হইলাম। এ দিকে বৃষ্টির নামগন্ধও নাই, সুতরাং কুলীগণসহ নিরুদ্বেগে গমন করিতে লাগিলাম। ১২।১৩ মাইল পথ অতিক্রমণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে কাঙ্গালীছিমা নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হওয়া গেল। উচ্চ হিমালয় পরিত্যাগ করিয়া এখন আমরা নিম্ন হিমালয়ে আগমন করিয়াছি; রাস্তা অনেকটা সুগম আর পথিকও অবিরল নহে। কৃষিকার্য্যও বেশ হইতেছে দেখিতে পাওয়া গেল। এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে দেখিতে সিক্তবস্ত্রে একখানি দোকানঘরে আশ্রয় লইয়াছিলাম। আসকোটে সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়াছিলাম, এ কথা দোকানী কুলীর মুখে অবগত হইয়া যথেষ্ট যত্নের সহিত থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কিছু তরি-তরকারীও সংগ্রহ করিয়া দিল। এই ক্ষুদ্র শান্তিপ্রদ গ্রামে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া অতি প্রত্যূষে পিথোরাগড় অভিমুখে গমন করা গেল।

গমনকালে ফলের বাগান, শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, জনপূর্ণ গ্রাম সকল নয়নগোচর হইতে লাগিল। এই উর্ব্বর প্রদেশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। উদ্‌বৃত্ত শস্য ভুটিয়ারা ক্রয় করিয়া নিজেদের দেশে লইয়া যায়। চড়াই

উৎরাই বড় বেশী অনুভূত হয় নাই। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই পিথোরাগড়ে উপস্থিত হওয়া গেল।

পিথোরাগড়ে বেশ ভাল স্থানেই ছিলাম। কুলীরা এ বিষয়ে আসকোটে উপদিষ্ট হইয়াছিল। এ জন্য থাকিবার কথা আমাকে কিছুই ভাবিতে হয় নাই। এ স্থানে ডাক-টেলিগ্রাফ আফিস, হাঁসপাতাল, মিশনারীদের প্রচারকেন্দ্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতার সকল অঙ্গই আছে। এক সময় এ স্থান ইংরাজ সরকারের সেনানিবাস ছিল; তাহাদের পরিত্যক্ত গৃহ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। আদালত ও স্কুল থাকায় স্থানের মহিমা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পিথোরাগড়ে আসিয়া বোধ হইল যেন ইংরাজশাসিত ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছি। অনেক দিনের পরে রজককে বস্ত্র প্রক্ষালন করিতে দেখিলাম। বাজারে লোক সকল ক্রয়-বিক্রয়-নিরত, আর স্থানে স্থানে সংবাদপত্র পাঠে নিবিষ্টচিত্ত দেখিলাম। অনেক দিন এ চিত্র না দেখিতে পাইয়া ইহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এ স্থানে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে টেলিগ্রাফ আফিসে যাইয়া ঘড়ীটি মিলাইয়া লইলাম—ঘড়ী বিশ্বস্তভাবে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছিল, বড় বেশী তফাৎ হয় নাই দেখিয়া প্রীত হইলাম।

বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া স্নানের জন্য একটু দূরে যাইতে হইয়াছিল। এ স্থানে জলের কষ্ট আছে বলিয়া বোধ হইল। মৃত্তিকা হইতে স্থানে স্থানে জল উদ্গত হইতেছে, তাহাকে চৌবাচ্চা করিয়া উপরে আচ্ছাদন ও চতুর্দ্দিক গাঁথিয়া বেশ সুরক্ষিত করা হইয়াছে। স্নানে আমাদের অবগাহন করিয়া স্নান করা অভ্যাস; সুতরাং ঘটী করিয়া তত সুবিধা হইল না।

ভোজনাদির পর পিথোরাগড় একবার ভাল করিয়া দেখিয়া

রহিলাম। ইহা সমুদ্র হইতে প্রায় ৫ হাজার ফুট উচ্চ। এ স্থান কালীর ঝোলাঘাট হইতে প্রায় ১৪ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। পেন্‌সেন্‌প্রাপ্ত গুর্খা সৈন্য এ স্থানে বাস করিয়া থাকে। আজকাল এ স্থানের জল-বায়ু মন্দ নহে, এ জন্য কয়জন পেন্‌সেন্‌প্রাপ্ত গোরা অবস্থান করিয়া থাকেন। অল্প ব্যয়ে সুখস্বচ্ছন্দতার সহিত থাকিবার অনুকূল যে কোন স্থান হউক না কেন, ইঁহারা তথায় থাকিতে পশ্চাৎপদ হয়েন না। রাস্তায় দু-একজন গোরার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আলাপে ও মুখশ্রী দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহারা স্বাস্থ্য ও শান্তি উভয়ই ভোগ করিতেছেন।

এই স্থানে মিশনারী মহাশয়দের কর্ম্মকেন্দ্রকে জমকাল দেখিলাম। সুদূর আমেরিকা হইতে ইঁহারা এই স্থানে আসিয়া কার্য্যক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়াছেন। শিক্ষা প্রদান ও চিকিৎসাকার্য্য মনুষ্যহৃদয় জয় করিবার অমোঘ পন্থা—এই দুই পথ অবলম্বন করিয়া ইঁহারা আমাদের দেশ-বাসীর হৃদয় অধিকারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কুষ্ঠাশ্রম চিকিৎসালয় আর বিদ্যালয় ইঁহাদের উদ্যমের ফল। এই তিন পবিত্র স্থানে আমাদের দেশবাসী যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক জন কর্ম্মী খৃষ্ট-প্রচারক কহিয়াছিলেন, বালকের প্রথম কতিপয় বৎসর যদি আমার আয়ত্তের ভিতর হয়, তাহা হইলে তাহাকে চিরকালের জন্য আমার প্রভাব বহন করিতে হইবে। কথা খুব ঠিক। আমরা যখন আমা-দের নিজের দিকে দেখি, তখন আনন্দে উৎফুল্ল হই। অতি পুরা-কালে আমাদের যাযাবর পূর্ব্বপুরুষরা দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিয়া আরোগ্যশালা আর শিক্ষামন্দির স্থাপন করিয়া আর্য্য-সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিলেন। কাম্বোজের শিলালেখ এখনও এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শত-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উদ্যমের অবতার

আমাদের কাশ্যপ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্রের প্রবর পুরুষরা আমাদের ভারতীয় সভ্যতা প্রচার করিয়াছিলেন। সে কথা স্মরণ করিলে হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকদের সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়াও অনেকে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। আমরা যদি আমাদের সমধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি সমতা অবলম্বন না করি, তাহা হইলে দলে দলে আমাদের অবনত শ্রেণীর হিন্দু অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বলপূর্ব্বক আমাদের কাছে সম্মান আদায় করিবে, এখনও তাহারা তাহা করিতেছে।

আসকোটের কুমার সাহেব এ স্থানের স্কুলের এক জন শিক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কহিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় এ প্রদেশের ইতিহাসের উপাদান শিলালেখাদি অনেক সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আমি উৎসুক হইয়াছিলাম—তিনি সে সময় পিথোরাগড়ে না থাকায় তাঁহার সাক্ষাৎলাভ হয় নাই।

পিথোরাগড় ভ্রমণকালে আমার সেই দেশের সঙ্গী বলিলেন, "শাস্ত্রী মহাশয়, ঐ যে পাহাড় দেখিতেছেন, এক জন ইংরাজ সেনানীর কার্য্যের সহিত ইহার একটু ক্ষুদ্র ইতিহাস জড়িত আছে। ঐ পাহাড়ের নাম 'ড্রিল পাহাড়।' যে সময় এখানে কেণ্টনমেণ্ট ছিল, সেই সময় কোন সৈনিকপুরুষকে দণ্ড দিতে হইলে সেনানী মহাশয় তাহাকে দ্রুতবেগে ঐ পাহাড়ে উঠিবার আদেশ প্রদান করিতেন—সেনাপতি বাংলার বারান্দা হইতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে এই দৃশ্য দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন।" ইহার দেশী নাম কোলেশ্বর, শ্বেতাঙ্গমহলে ইহা ড্রিল পাহাড় নামে পরিচিত। আমার যুবক বন্ধু ইহা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আপনাদের দেশে কি এরূপ কিছু আছে?" প্রশ্নে আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিলাম; কিন্তু তৎক্ষণাৎ

আত্মসংবরণ করিয়া কহিয়াছিলাম, "এত সামান্য কথা, আমাদের কলিকাতার যিনি স্থাপয়িতা, তাঁ'র নাম ছিল যব চার্ণক, তিনি যখন খাইতে বসিতেন, তখন আমাদের দেশী লোককে প্রহার করা হইত, সেই প্রহৃত ব্যক্তির ক্রন্দনরোলের মধুর শব্দ শুনিতে শুনিতে তিনি ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন।" আমার নবীন যুবক বন্ধু মনে করিয়াছিলেন, আমি পরাজিত হইব; কিন্তু আমার উত্তর শুনিয়া তিনি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "এই জন্য বুঝি কলিকাতার ধনবান্‌রা নির্ম্মম?" এইরূপ রহস্যালাপ করিয়া আমরা ডেরায় উপস্থিত হইলাম।

আবার অতি প্রত্যূষে চলিতে আরম্ভ করা গেল। আজ প্রায় ১৬।১৭ মাইল হাঁটিয়া গুরণা হইয়া চিরাতে রাত্রিবাস করা গিয়াছিল। আসিবার সময় এক স্থানের দৃশ্য একটু অদ্ভুত গোছের ছিল, পাহাড় যেন একটা অতি উচ্চ প্রাচীরের মস্তক; তাহার উপর দিয়া রাস্তা, নিম্নের সমতল ভূমি, বৃক্ষমণ্ডিত গ্রাম, আর শস্য-শ্যামল নয়নরঞ্জন ক্ষেত্র সকল অতি মধুর বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

চিরা হইতে লোহাঘাট ৯।১০ মাইল হইবে। মনে করিয়াছিলাম, লোহাঘাটে অবস্থান না করিয়া বরাবর মায়াবট্ বা মায়াবতীতে গমন করিব। দুই কারণে তাহা হয় নাই। বৃষ্টিতে সব ভিজিয়া যাওয়াতে আর অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, একজন বাঙ্গালী সাধু এ স্থানে অবস্থান করিয়া একটি পাঠশালা খুলিয়াছেন; কয়জন শিক্ষিত ব্যক্তি লইয়া তিনি অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।

এক সময় এ স্থান বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, আসিবার সময় তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছিলাম। এ স্থানের নামকরণ সম্বন্ধে একটু অদ্ভুত কথা মিশ্রিত আছে। চন্দরাজাদের সময় কতকগুলি ব্রাহ্মণ কোন অপরাধে দণ্ডিত হইয়া এই স্থানে শৃঙ্খলিত হইয়া কারারুদ্ধ

হয়েন। এক সময় নিকটবর্ত্তী নদীতে তাঁহারা স্নান করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন। কোন অলৌকিক শক্তিতে তাঁহাদের সেই লৌহশৃঙ্খল গলিয়া যায় আর সেই সুযোগে ব্রাহ্মণরা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। সেই সময় হইতে নদী লোহাবাতী আর গ্রাম লোহাঘাট নামে পরিচিত হইয়াছে।

আমাদের কুলী প্রথমে আমাকে স্কুলে লইয়া যায়। কিন্তু তথায় কেহ না থাকায় যে স্থানে বাঙ্গালী সাধু অবস্থান করেন, তথায় লইয়া গেল। সাধু মহাশয় কৈলাসপ্রত্যাগত শুনিয়া আর ভিজিয়া ভিজিয়া ক্লান্ত হইয়াছি দেখিয়া আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এরূপ স্থানে অকস্মাৎ স্বদেশীয় সমাগমে তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন আর আমরা যেন বহু শত বৎসর পর দেশবাসীর সহিত মিলিত হইয়া, বাঙ্গালা কথা শুনিয়া কৃতকৃতার্থ হই। সিক্তবস্ত্র শুষ্ক করিবার জন্য মেলাইয়া দিলাম, শয়নের জন্য স্থান অধিকার করিলাম; কিন্তু সন্ন্যাসীর অসংস্কৃত আশ্রমে, স্থানে স্থানে জল পড়াতে আমাদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়াছিল। অনতিকালমধ্যে বৃষ্টি বন্ধ হওয়াতে আমরাও নিরুদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম।

সন্ন্যাসী মহাশয় রামকৃষ্ণ মিশনের এক জন কর্ম্মী পুরুষ; এই স্থানে বিদ্যালয় খুলিয়া জনগণমধ্যে বিদ্যাপ্রচার আর শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা প্রচার করিতেছেন। স্থানীয় লোকরা ইঁহাদের উপর বেশ ভক্তিসম্পন্ন দেখিলাম। আমাদের সায়ংগৃহের নিম্নে একটি মন্দির রহিয়াছে। দেখিলাম, সন্ধ্যাকালে স্থানীয় দর্শকরা আগমন করিয়া এ স্থানের জনতা বৃদ্ধি করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে স্থানটি বেশ নির্জ্জন হইল। ভোজনান্তে সন্ন্যাসী মহাশয়ের সহিত কিছু আলাপ করিয়া সুখশয্যায় শয়ন করিলাম।

মায়াবতী বাঙ্গালীর গৌরবের ক্ষেত্র; আর স্বামী বিবেকানন্দজীর কীর্ত্তি। ইহার এত নিকটে আসিয়া দেখিয়া না যাওয়া কোনরূপে উচিত নহে। ইহা দেখিতে গেলে কয় মাইল ঘুরিয়া যাইতে হইবে; আর এক দিন সময় বেশী যাইবে। বহু পথ, আর বহু দিন ত অতিক্রমণ করিয়াছি; এই অল্প পথ আর অল্প সময় কাটাইতে দ্বিধা বোধ করিলাম না।

প্রাতঃকালে সন্ন্যাসী মহাশয় আমাদের কুলীকে মায়াবতীর রাস্তার বিষয় বলিয়া আর এক জন লোককে সেই রাস্তাটা দেখাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে বিদায় লইয়া মায়াবতী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম—নিযুক্ত লোক নদী পার হইয়া রাস্তা দেখাইয়া বিদায় লইল। আমরা ধীরে ধীরে জঙ্গলের ভিতর দিয়া প্রায় ৯।১০টার সময় মায়াবতীতে উপস্থিত হইলাম। মায়ফট্ বা মায়পট্ এ স্থানের প্রাচীন নাম, মায়াবতী ইহার সুসংস্কৃত সংস্কৃত নাম। এই বহুবিস্তৃত সম্পত্তি পূর্ব্বে এক জন ইংরাজের ছিল—তিনি এই নির্জ্জন স্থানে আপেল প্রভৃতি ফলের বাগান করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীদের হাতে আসিয়া ইহা তপোবনে পরিণত হইয়াছে। লোকালয় হইতে দূরে, আর বনের মধ্যে হওয়াতে কোলাহলক্লিষ্ট লোকের পক্ষে স্থানটি বেশ আরামপ্রদ, আর সাধনভজনের পক্ষেও অনুকূল হইয়াছে।

কুলীসহ আমি অসংস্কৃত-দেহ—দীর্ঘ যষ্টিধারী-আজানুলম্বিত আবরণে আচ্ছাদিত, বৃহৎ-উষ্ণীষধারী আমি কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। নামধাম, কোথা হইতে আগমন করিতেছি—কি উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছি, সঙ্গে কাহারও অনুরোধপত্র আছে কি না, ইত্যাদি কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া এক জন তাপস

আসিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আমার পরিচ্ছদে বা রূপে কোনরূপ বঙ্গীয় ভাব প্রকাশ পায় নাই, প্রান্তিকভাববহির্ভূত সর্ব্বজনে সমদৃষ্টিসম্পন্ন তাপসদের কাছে সাদর সম্ভাষণ পাইব, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে।

হৃদয়ে সাত্ত্বিক ভাব আনয়নের পক্ষে স্থানের প্রভাবও যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আগে বঙ্গবাসীর পবিত্র গৃহ অতিথি-অভ্যাগতে আত্মীয়-স্বজনের কলরবে মুখর হইত, এখন সে গৃহ শ্মশান-তুল্য হইয়াছে। না আছে দুগ্ধ-দধি, না আছে দধিমন্থন-শব্দ, না আছে গর্ভধারিণী জননীর পূজা। আছে-অপরিষ্কার-অবিচ্ছন্নতা, কলহ-বিবাদ, অভাব-অভিযোগ, রোগ-শোক, আর হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা। এ অবস্থায় হৃদয় কিরূপে বিশালতাকে প্রাপ্ত হইবে? এক সাধুর কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ হইতেছে। তিনি আমাদের বাড়ীতে ভোজন করিতেন আর গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়া ভজন করিতেন। এইরূপে তাঁহার বহু মাস অতীত হয়। গমনকালে তিনি একটি পুঁটলী আনিয়া সাক্ষাৎদেবতা মাতৃদেবীর নিকট রাখিয়া দেন—প্রত্যাগমন-কালে গ্রহণ করিবেন কহিয়া চলিয়া যায়েন। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইল, সাধুর দেখা নাই। অনেকে মনে করিলেন, সাধু দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ৬ বৎসর পরে সাধু আগমন করিলেন, আমার মা তাঁহার পুঁটলী তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন—যেরূপ ভাবে বাঁধা ছিল, ঠিক সেইরূপ ভাবেই তাহা ছিল। তাহার কোনরূপ ব্যত্যয় নাই। তাহার ভিতর সাধুর কতকগুলি মোহর ছিল; কোন ভক্ত খরচ করিবার জন্য দিয়াছিলেন। সাধু আমার মাতৃদেবীর ব্যবহারে প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদস্বরূপ কিছু দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। যাক সে সব কথা।

এখন আমরা সামান্য বিষয়ের জন্য কেন কুপথগামী হইতেছি? সে দৃঢ়তা নাই কেন? গৃহ পবিত্র হইলে পবিত্র ভাব আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমাদের এখন অশন, বসন প্রভৃতি সকল বিষয়েই অপবিত্রতা আসিয়াছে। তাহার ফলে আমরা অপবিত্র হইয়াছি, প্রপীড়িত হইতেছি, লাঞ্ছিত হইতেছি।

সন্ন্যাসী মহাশয়দের সহিত পরিচিত হইলাম, আমার 'শিবাজী', 'জালিয়াৎ ক্লাইব' প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত তাঁহাদের কেহ কেহ পরিচিত আছেন, অবগত হইলাম। আমার জন্মভূমি দক্ষিণেশ্বরে, আর আমি বাল্যকালে পরমহংসদেবের হস্ত হইতে মাখন-মিশ্রী প্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম, শুনিয়া তাঁহারা আমাকে একটু বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন।

আমার অবস্থান জন্য তাঁহারা একটি দ্বিতল কক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। কুলীরাও তাঁহাদের অতিথিসেবা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। একটু রাস্তা ঘুরিয়া আসায় তাহাদের মধ্যে যে অসন্তোষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। তাহারাও সানন্দে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিল। স্নানাদি নিত্যক্রিয়ার পর রসনাসুখকর নানা-প্রকার ব্যঞ্জনে তৃপ্তির সহিত ভোজন করা গিয়াছিল। সন্ন্যাসীর আশ্রমে—তপোবনে "নানা প্রকার ব্যঞ্জনের" নামে যেন কেহ শিহরিয়া না উঠেন, আমার কাছে সে সময় বেগুনভাজা আর পাঁপর বিলাসের সামগ্রী হইয়াছিল। গৃহপরিত্যাগের পর এরূপ ভোগের বিষয় এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সুস্বাদু বার্ত্তাকু ইঁহাদের তপোবনজাত। "পাঁপর কি এ স্থানের?" জিজ্ঞাসা করায় অবগত হইয়াছিলাম, মহীশূর ব্যাঙ্গালোর হইতে কোন ভক্ত ইহা প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ কথা শুনিয়া তখন কহিয়াছিলাম, "আপনাদের

ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে গমন করিয়া ইহা ভোজন করিব।" প্রভু আমার শুভাশুভ কোন কামনা অপূর্ণ রাখেন নাই; এ কামনাও পরে পূর্ণ করিয়াছিলেন। গত বৎসর মোপলা বিদ্রোহে হিন্দুরা কিরূপ ভাবে পীড়িত হইয়াছিল, তাহা দেখিবার জন্য মালাবার প্রদেশে গমন করিয়াছিলাম। প্রত্যাগমনকালে কিছু সময়ের জন্য ব্যাঙ্গালোরে অবস্থান করিয়াছিলাম। সে স্থানেও অকস্মাৎ রামকৃষ্ণ মিশনের সুন্দর আশ্রমে গমন করিয়াছিলাম। মায়াবতীর পরিচিত এক সাধু সে সময় তথায় অবস্থান করিতেছিলেন—তিনি আমাকে কৃপা করিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন আর সাধু মহাশয়দের সাধু ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমার পরিচিত সাধু মহাশয় বলেন, "আপনার বিষয় আমার আর কিছু মনে নাই; কিন্তু যখন জলবৃষ্টির বাধা না মানিয়া বেদান্তবাক্য পাঠ করিতে করিতে বীরদর্পে যাত্রা করেন, সে দৃশ্য আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে।" যাউক এ সকল অবান্তর কথা।

ভোজনের পর একটু বিশ্রাম করিয়া লইলাম। অনন্তর আশ্রমের পুস্তকালয়—কার্য্যালয় প্রভৃতি দেখিয়া প্রীত হইলাম। সন্ন্যাসীরা এ প্রদেশের লোককে নানাপ্রকার কার্য্য শিখাইয়া বেশ কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। অপরাহ্নকালে তপোবন পরিদর্শন করিলাম। যে গৃহে বিশিষ্ট অতিথি আসিয়া অবস্থান করেন, তাহাও দেখিলাম। এক সময় বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই স্থানে কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি যে রাস্তায় ভ্রমণ করিতেন, আশ্রমবাসীরা তাহার 'জগদীশমার্গ' নামকরণ করিয়াছেন।

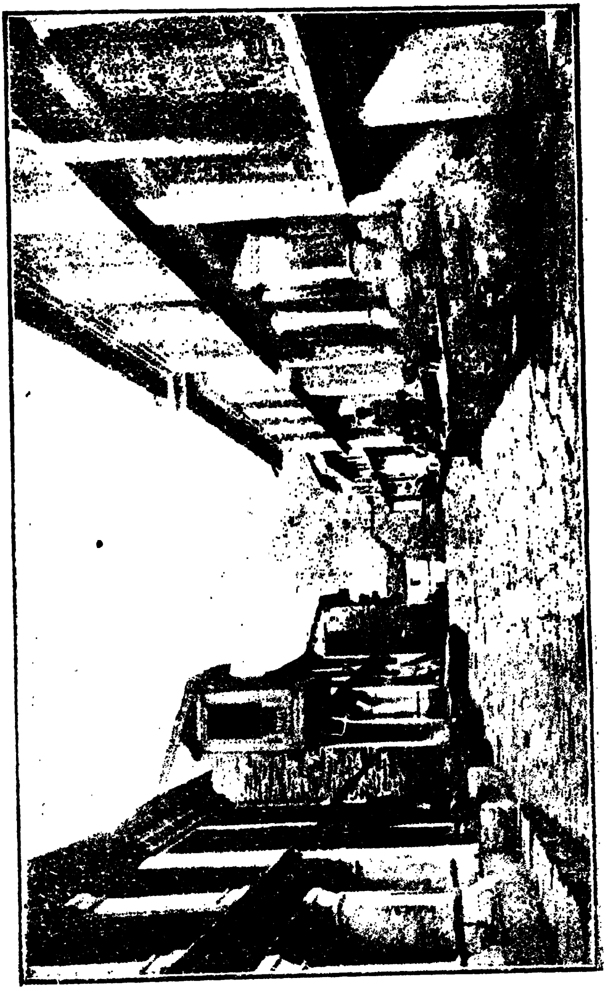
আশ্রম, বনের মধ্যে অবস্থিত। এ স্থানে হিংস্র পশুর উৎপাত আছে কি না, জিজ্ঞাসা করি নাই, কিন্তু রাত্রিকালে হরিণের উৎপাত আছে, তাহা তাহাদের চীৎকারে অবগত হইয়াছিলাম। তাহাদের

স্বরে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল; আর তাহাদের স্বর শুনিতে শুনিতে নিদ্রিতও হইয়াছিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে যেন রজনীর অবসান হইল—আমার প্রাত্যহিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া গমনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। আশ্রমবাসীরা দুই এক দিন থাকিয়া ক্লান্তি দূর করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের সাধুসুলভ সুজনতায় মুগ্ধ হইয়া কহিলাম, "ক্লান্তি মোটেই হয় নাই।" বলিয়া নম্রভাবে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

একটা কথা কহিতে ভুলিয়া গিয়াছি। এ রাস্তায় জোঁকের অত্যন্ত উপদ্রব—বৃষ্টির সহিত রক্তবীজের মত শত শত, সহস্র সহস্র জলোকা গলিত পত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জোঁকের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাধুরা পায়ে 'তেল-নুণ' মাখিতে উপদেশ দেন, আর খানিকটা নুণ সঙ্গে দেন। গমনকালে জোঁক বড় প্রতিবন্ধক হইয়াছিল, দুই চার পা গিয়া দেখি, ২।৪টা জোঁক আক্রমণ করিয়াছে, তাহাদের মুখে নুণ দিয়া ছুরি দিয়া চাঁচিয়া ফেলিয়া দিতে হইয়াছিল।

তাপসদিগের নিকট বিদায় লইয়া অনেক দূর গমন করিয়া তাঁহাদের তপোবনের সীমা অতিক্রম করিলাম। এখন আমরা অপেক্ষাকৃত জনপূর্ণ রাস্তায় উপস্থিত হইয়া চম্পাবত অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। রাস্তায় স্থানে স্থানে প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ প্রস্তর সকল দেখিতে পাইয়াছিলাম, এই সকল দেখিতে দেখিতে প্রায় ১০।১১টার সময় চম্পাবত বাজারে উপস্থিত হইলাম।

চম্পাবত এক সময় সোমবংশীয় চন্দ রাজাদের রাজধানী ছিল। কালীর তট হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত ভূভাগ তাঁহাদের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমানে কালী কামায়ুন পরগণা ইহার তসিল বা মহকুমা।



চম্পাবত।

কালী নদীর তটে অবস্থিত বলিয়া ইহা কালী কামায়ুন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কামায়ুন শব্দ কূর্ম্মাচল শব্দের অপভ্রংশ। ভগবান্ বিষ্ণু এ স্থানে কূর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কোন অতীত যুগে যখন এ প্রদেশের অধিকাংশ স্থল সাগরগর্ভে নিমগ্ন ছিল, সেই সময় এই স্থানে কূর্ম্মাবতার হইয়াছিল। বাজারের নিকট কয়টি সুন্দর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি ইহার অতীত কালের সমৃদ্ধির কথা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। সমুদ্র হইতে সাড়ে ৫ হাজার ফুট উচ্চ হইলেও স্থানটি স্বাস্থ্যপ্রদ নহে। এই জন্য এ স্থান হইতে ক্যাণ্টনমেণ্ট বা গোরাবারিক লোহাঘাটে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল। তখন নেপাল হইতে আক্রমণভয় ছিল। অনেক দিন সে ভয় তিরোভূত হইয়াছে, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেনানিবাসও উঠিয়া গিয়াছে। এ প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে লাল লঙ্কা, হলুদ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র টনকপুরে ঐ সকল দ্রব্যাদি নীত হইয়া থাকে। এক সময় এ প্রদেশে অনেকগুলি চার বাগান ছিল; সেগুলি লাভজনক না হওয়াতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহার স্থলে আলু প্রভৃতির চাষ হয়। এ স্থানে কুলী-সংগ্রহের একটা আড্ডা আছে; আমার সহিত কুলী থাকায় তাহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই।

পরদিবস অতি প্রত্যূষে কূর্ম্মরূপী ভগবান্‌কে স্মরণ ও প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ১৪।১৫ মাইল দূরে দেউড়িয়া গমন করিতে হইবে। বনজঙ্গলের ভিতর দিয়া রাস্তা, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীও পার হইতে হইয়াছিল। অপরাহ্ণকালে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া একটা বৃহৎ চালাঘরে কুলীরা আশ্রয় লইল। আমিও সেই গৃহের একপাশে স্থান নির্ব্বাচন করিলাম। রন্ধনের জন্য চাল, দাল, আলু প্রভৃতি

সংগ্রহ করিলাম, সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এই আসে, এই আসে, করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল, আমার সঙ্গী আসিল না দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। রাস্তায় গিয়া অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করিলাম; কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। কুলীদের এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রন্ধনকার্য্যে আমি নিযুক্ত হইলাম। মনে করিলাম, সঙ্গী আমার শ্রান্ত ও বুভুক্ষু হইয়া আসিবে, প্রস্তুত অন্ন পাইয়া পরিতৃপ্ত হইবে। খিচুড়ি রান্না হইয়া গেল; তথাপি তাহার কোন সংবাদ পাইলাম না। অগত্যা আমি ভোজনে বসিয়া গেলাম। আমার সায়ংগৃহের কাছে কয়টা গোঁড়ালেবু সংগ্রহ করিয়াছিলাম। সে সময় ইহার অম্লরস ও গন্ধ বড মধুর বোধ হইয়াছিল। সঙ্গীর জন্য তাহার কয় খণ্ড রাখিয়া দিলাম। আমার ভোজন হইয়া গেল, তবুও তাহার দেখা নাই। চিন্তিত হইলাম, একবার মনে করিলাম, আগে চলিয়া গিয়াছে, আবার মনে করিলাম, বনের মধ্যে পথ ভুলিয়া যদি বিপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঘোর অন্ধকার, কোথায় বনের ভিতর লোক পাঠাই, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। আলো লইয়া লোক ফিরিয়া আসিল, কোন সংবাদ পাইল না। রাস্তায় জনমানবের সাড়াশব্দ নাই; সুতরাং কাহারও মুখে কোন খবর পাইবারও সম্ভাবনা নাই। এ যাত্রায় হিমালয়ে আজ শেষ রাত্রিবাস। উদ্বিগ্ন হইয়া শয্যায় শয়ন করিলাম। শ্রান্ত শরীর, সমস্ত ভুলিয়া গিয়া নিদ্রিত হইলাম।

আবার সকাল হইল, সঙ্গীর অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলাম এবং কোন সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত হইলাম। এক জন কহিল, এক জন লোক আগে চলিয়া গিয়াছে। এই সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া আমি টনকপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। খিচুড়ি, লেবু ভাল করিয়া

রাখিয়া দিয়া আর দোকানীকে আমার সঙ্গী আসিলে তাহাকে টনকপুরে যাইবার জন্য কহিয়া দিলাম।

আমার সঙ্গীকে বার বার কহিয়াছিলাম, সঙ্গ ছাড়িও না, বিপন্ন হইবে। বনজঙ্গলের রাস্তা, কোনরূপ বিপদ ঘটিলে একত্র থাকিলে তাহা দূর করিবার উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে। বহুবার কহিলেও এ কথায় কর্ণপাত না করার ফল, সে হিমালয় পরিত্যাগের শেষদিনে প্রাপ্ত হয়।

আজ হিমালয়ের প্রায় সমস্ত রাস্তা নামিতে হইয়াছিল। অতি দ্রুতবেগে নামিয়া নিম্নের বনভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। এ জঙ্গল আসামে পরশুরাম কুণ্ডের পথে যে গভীর জঙ্গল দেখিয়াছিলাম, তাহার তুলনায় কিছুই নহে। নামিবার পূর্ব্বে হিমালয় হইতে সমতলভূমির দৃশ্য অতি সুন্দর দেখাইয়াছিল, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নদ নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হইতেছে, বর্ষার সময়ও সমতলভূমির স্রোতস্বতী ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, পাহাড়ে যে নদী ভীষণ তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া ভীমবেগে প্রবাহিত হইতেছিল—সমতলভূমিতে বাধাপ্রাপ্ত না হওয়ায় সে ভৈরবী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া যেন বৈষ্ণবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মাটীর সহিত মিলিত হইয়া গমন করিতেছে।

আমাদের ভারতের বৃক্ষসম্পদ নানাপ্রকার এবং অতুলনীয়। আমাদের শাল, সেগুণ, তুণ, খদির, চির, দেবদারু, হালদু (গৃহের অভ্যন্তরের কার্য্যে এই কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইলে বহুদিন স্থায়ী হয়), ধাউরি (সালের ন্যায়), শিশু প্রভৃতি নানাশ্রেণীর বৃক্ষ আমাদের দেশের জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিলাতে ওক বৃক্ষের বড় কদর, আমাদের সেগুণের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না। ওকের সকল গুণ এক দোষে নষ্ট হইয়াছে। ওক-কাষ্ঠে লোহার

পেরেক ব্যবহার করিলে তাহাতে কালক্রমে মরিচা পড়িয়া থাকে; আমাদের সেগুণে সেরূপ হয় না। নানাজাতীয় বৃক্ষের ছায়া সম্ভোগ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বৃক্ষের উপরিভাগে সুবৃহৎ মধুচক্র স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

এক জন ভয় দেখাইয়াছিলেন, যদি পাহাড়ে বৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে নদী পার হওয়া সময়-সাপেক্ষ আর বিপৎ-সঙ্কুল। ভগবানের কৃপায় সেরূপ কোন বিপদে নিপতিত হই নাই।

একটি নদী পার হইবার সময় এক বিপুলবপু ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎলাভ হইয়াছিল; আমার যে কুলী অগ্রে ছিল, সে দেখিয়াছিল; ব্যাঘ্র দেখিয়া পশ্চাদাগমন করিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া দেয়। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্যাঘ্র চলিয়া গেলে আমরা অগ্রসর হইলাম। তাহার বিরাট পদচিহ্ন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। ভুটিয়াদের মধ্যে এরূপ প্রবাদ আছে যে, যে ব্যক্তি মানস-সরোবর দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাকে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ বা আক্রমণ করে না। মানসদর্শী ভুটিয়ারা কখন ব্যাঘ্রমুখে পতিত হয় নাই, এ কথা তাঁহারা সগর্বে কহিয়া থাকেন। আমিও মানসের মহিমায় ব্যাঘ্র-কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম কি না, তাহা অবগত নহি। এইরূপে ১৫।১৬ মাইল রাস্তা অতিক্রমণ করিয়া প্রায় ১২টার সময় টনকপুরে উপস্থিত হই।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

টনকপুরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে দূর হইতে এঞ্জিনের ধূম ও টেলিগ্রাফ তারের স্তম্ভ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, মনে হইল, পরিশ্রমের অবসান হইল—আত্মীয়বন্ধু-বান্ধব-স্বজনসহ মিলিত হইবার সম্ভাবনা হইল। ষ্টেশনে না যাইয়া প্রথমে বাজারে গেলাম, বাজারের দোকান সকল বন্ধ রহিয়াছে দেখিয়া মনে হইল, যেন কোন শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়াছে। ষ্টেশন-রাস্তার দোকান কতক কতক খোলা রহিয়াছে। একটা দোকানে কিছু ভোজন করিয়া লইলাম, আর কুলীদেরও ভোজন করাইলাম। তাহারা আমাকে খুব যত্নে আনিয়াছে—অবকাশ পাইলেই আমার শারীরিক সেবাও করিয়াছে। দোকানদারকে আমার সঙ্গীর জন্য লুচী ভাজিয়া রাখিতে কহিয়া আমি ষ্টেশনে গমন করিলাম।

শীতকালে টনকপুর জনপূর্ণ ও শোভাসম্পন্ন হয়। পাহাড় হইতে ভুটিয়া, নেপালী, পাহাড়ী প্রভৃতি তিব্বত হইতে ভেড়ার লোম, সোহাগা, ঘি, লঙ্কা, হলুদ, খদির, মধু প্রভৃতি আনয়ন করিয়া থাকে। নিম্নভূমি পিলিভিত, কানপুর প্রভৃতি স্থান হইতে ব্যবসায়ীরা বিলাতী ও দেশী বস্ত্র, গুড় প্রভৃতি আনয়ন করিয়া কেনাবেচা করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের ইহা খাস মহল, ইহার উন্নতিকল্পে সরকার দৃষ্টি দিয়া থাকেন। বর্ষাকাল এ অঞ্চলের পক্ষে বড় খারাপ কাল; ম্যালেরিয়া সে সময় অখণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিয়া থাকে। শীঘ্র শীঘ্র টনকপুর পরিত্যাগের জন্য উদ্বিগ্ন হইলাম। আসিয়াই ষ্টেশনে কুলী পাঠাইয়া খোঁজ লইলাম, আমার সঙ্গী আসিয়াছে কি না। যখন সে প্রত্যাগমন

করিয়া কহিল, আইসে নাই, তখন উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইল, অগত্যা কিছু সময় এ স্থানে অবস্থান করিতে হইবে।

ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া বেঞ্চে উপবেশন করিলাম। আমার মলিন বেশ, রুক্ষ কেশ, দীর্ঘ যষ্টি দেখিয়া এক জন উচ্চ রেলকর্ম্মচারী আমার প্রতি ঔৎসুক্য সহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, আমিও তাঁহার হস্তস্থিত সংবাদপত্রের দিকে লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলাম। জল কাছে আইসে না, তৃষিত ব্যক্তিই জলের নিকটবর্ত্তী হয়, ইহাই সনাতন নিয়ম। আমিই প্রথমে কথা তুলিলাম। তিনি তিব্বত হইতে আমার আগমনকথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া করমর্দ্দন করিলেন। আমার মলিন বেশ, তাঁহার সৌজন্যলাভে অন্তরায় হইল না। তিনি সংবাদপত্রখানি প্রদান করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিলেন। যখন সেই য়ুরোপীয়ের সহিত আলাপ করিতেছিলাম, সে সময় ষ্টেশনের দূরপ্রান্তে আমার সঙ্গী আসিতেছে দেখিলাম। আমি অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, আমার সঙ্গী কাদা মাখিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিতেছে। এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কারণ জিজ্ঞাসায় অবগত হইলাম, আসিতে আসিতে গত রাত্রিতে রাস্তায় সন্ধ্যা উপস্থিত হয়, তাহার পর ঘোর অন্ধকারে অগ্রসর হইতে অসমর্থ হইলে চলিবার সময় পড়িয়া গিয়া এই দশা উপস্থিত হইয়াছে। রাত্রিতে হরিণ প্রভৃতি আসিয়া দেখা দিয়াছিল, কিন্তু কোনরূপ অনিষ্ট করে নাই। প্রাতঃকালে যে স্থানে আমি অবস্থান করিয়াছিলাম, তথায় আমার সঙ্গী আসিয়া আমার অনুসন্ধান করিয়া দোকানীর মুখে সমস্ত কথা অবগত হয়। যে খিচুড়ী ও লেবু রাখিয়া আসিয়াছিলাম, আমার সঙ্গী তাহা উপভোগ করিয়াছে শুনিয়া আমি আনন্দিত হইলাম।

ট্রেণ ছাড়িবার আর বেশী বিলম্ব নাই ; সঙ্গীকে দোকানে ভোজন করিতে পাঠাইয়া দিলাম। জিনিষপত্র গাড়ীতে উঠাইয়া হিমালয়ের দিকে চাহিয়া মনে মনে ভগবান্‌কে অসংখ্য প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম।

সঙ্গীটি শেষ মুহূর্ত্তে আসিয়া উপস্থিত হইল, ষ্টেশন-মাষ্টার যদি ট্রেণ ছাড়িতে একটু বিলম্ব না করিতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, সঙ্গীটিকে ষ্টেশনে পড়িয়া থাকিতে হইত। এই তাড়াতাড়িতে সঙ্গীর পাত্রাবরণ ষ্টেশনের তারের বেড়ায় পড়িয়া রহিল। গাড়ী হইতে ষ্টেশন-মাষ্টারকে বহু ধন্যবাদ দিলাম, তিনি এ ভদ্রতা না দেখাইলে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। আমার যাত্রা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। যখন ধন্যবাদ দিতে আরম্ভ করিয়াছি, তখন 'মাসিক বসুমতীতে' এই কৈলাসযাত্রা প্রকাশের জন্য আমাদের প্রীতিভাজন শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র ; তাঁহার আগ্রহ উৎসাহ না হইলে ইহা আমার মনের ও নোটবুকের ভিতর বোধ হয় বন্ধ হইয়া থাকিত। আলমোড়ার অস্তিরাম সা, ধারচুলার পণ্ডিত লোকমণিজী লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের সদ্ব্যবহারে আমি মুগ্ধ আছি ; শ্রীভগবানের অনুকম্পা তাঁহারা ভোগ করুন। ইহাতে যে সকল চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, সেরিং ও স্বেনহিডেনের গ্রন্থ হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছি, এ জন্য তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। হিমালয়নিবাসী যে সকল বন্ধু আমাকে নানাপ্রকারে সহায়তা প্রদান করিয়াছেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাদের উপর করুণা বিতরণ করুন। শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু "মানস ও কৈলাসে"র সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

কৈলাস-যাত্রার সূচনা কলিকাতার হিন্দী দৈনিক কলিকাতা

সমাচারে কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল, এ জন্য ইহার কর্ত্তৃপক্ষ আমার ধন্যবাদভাজন। সর্ব্বশেষে এক বিরল পুরুষকে আশীর্ব্বাদ করি, তাঁহার সহানুভূতি, তাঁহার উৎসাহ, তাঁহার পরামর্শ না পাইলে কৈলাসযাত্রা কতদূর সম্ভবপর হইত, তাহা জানি না। কবি যথার্থ কহিয়াছেন :—

বিরলা জানন্তি গুণান্ বিরলাঃ কুর্ব্বন্তি নির্ধনে স্নেহম্।
বিরলাঃ পরকার্য্যরতাঃ পরদুঃখেনাপি দুঃখিতা বিরলাঃ॥

রেলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা হয় নাই। টনকপুরে গাড়ী চড়িয়া শ্রীরামপুর আসিয়া নামিয়াছিলাম। অবশ্য গাড়ী হইতে অন্য গাড়ীতে উঠিবার জন্য নামিতে হইয়াছিল। প্রতাপগড় হইতে আমার সঙ্গী প্রয়াগে যায়; যাইবার আগে খেলার সুন্দর ঘৃত যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহার কিছু আর যে কাঠের আধারে তাহা ছিল, তাহাও তাহাকে দিয়াছিলাম।

প্রায় সাড়ে তিন মাস সময়, আর পাঁচ শত টাকার ভিতরে আমার কৈলাসযাত্রা পূর্ণ হইয়াছিল।

শ্রীরামপুর ষ্টেশনে নামিয়া যখন আমি আমার রিষিড়ার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হই, তখন শ্রীভগবানের কাছে ইহাই প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে, আমাকে শক্তি দিবেন, যেন আমি অকাতরে প্রিয়জন-অভাবদুঃখ বহন করিতে সমর্থ হই। শ্রীভগবানের কৃপায় সেরূপ কোন দুঃখ ভোগ করিতে হয় নাই; সানন্দে সকলের সহিত মিলিত হইয়াছিলাম।

আমার আগমনের সহিত আমার স্নেহভাজন শ্রীমান্ হরিপ্রসাদ রায় সর্ব্বপ্রথম আমার গৃহে আগমন করিয়া আমাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। ইহা লিখিবার সহিত তাঁহার দুঃখপ্রদ মৃত্যুর কথাও

মনে হয়। এক্ষণে তিনি পরলোকগত, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে চিরশান্তি প্রদান করুন।

অবশেষে যে সকল সাধু মহাত্মা ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে এই কঠোর যাত্রা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিয়া আর পাঠকপাঠিকা সকলের শুভ কামনা করিয়া ইহা সমাপ্ত করিলাম। শুভমস্তু।

সম্পূর্ণ।